নবজীবনের পথে

মনোরঞ্জন হাজরা

পূরবী পাবলিশার্স
১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন. কলিকাতা।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

নোঙরহীন নৌকা

পলিমাটির ফসল

মহানগরে দাবানল

দুষ্কৃত

উদয়গড়

এই সভ্যতা

অদ্ভুত

প্রচ্ছদপট শিল্পী—নরেন মল্লিক

প্রথম সংস্করণ

আশ্বিন ১৩৫৩

দাম—চার টাকা

গিরীন চক্রবর্তী

প্রকাশক—পূরবী পাবলিশার্স

১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীফণীভূষণ হাজরা।

গুপ্তপ্রেশ : ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ

তোমাকে—

নবজীবনের পথে

সবে মাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে।

পশ্চিমপাড়া গ্রামের একান্তে একখানি মাটির বাড়ীতে দাওয়ার একদিকে মৃৎপ্রদীপ জ্বলিতেছিল। বাড়ীর অধিকারিণী এক তরুণী, নাম কুসুম। পল্লীগ্রামের মেয়ে, সাধারণ চেহারা, সাধারণ রূপ, অত্যন্ত সাধাসিধা জীবনযাত্রা। সে বসিয়াছিল একটা খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া আর তারই একান্ত আপনজনের মত অদূরে একটা আসনে বসিয়াছিল এক তরুণ, নাম বিজয়। বেশ হাড়েমাসে চেহারা। দেখিলেই মনে হয় পরিশ্রমী। বসিয়া বসিয়া দু'জনে গল্প হইতেছিল। দু-জনেই বয়সে নবীন। তাই কথা বলিতে গিয়া কেহই কথা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। অবশ্য বিজয় সারাদিন মাঠে লাঙল ঠেলিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেজন্ত হৃদয়াবেগের মূল্য তার কাছে যতখানিই হোক্ না কেন, তার শারীরিক অবস্থাটা তাকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল। সে প্রশ্ন করিল, কিন্তু কি জন্যে তুমি মাঠে খবর পাঠিয়ে আমাকে ডাক্‌লে তা'তো বল্‌লে না?

কি জন্য কুসুম বিজয়কে ডাকিয়াছে তা' হয়ত অন্তর দিয়া সে বুঝিতে পারে কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। তবু সে কহিল, আমায় গঙ্গাচান্ ক'রতে নে যাবে?

এইজন্যে ডেকেছিলে, বিজয় হাসিয়া কহিল, কিন্তু তারপর গাঁয়ে এসে ফুতে পারবে?

—কেন?

—পরপুরুষের সঙ্গে মেয়েছেলে কোথাও গেলে গাঁয়ের লোক তাকে কি চোখে দেখে তা' কি তুমি জানো না কুসুম ?'

—জানি, কিন্তু যার কেউ নেই সে কি ক'রবে ?

সে কোথাও যাবে না, বলিয়া বিজয় উঠিয়া পড়িল। কুসুমও উঠিয়া পড়িয়া মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া কহিল, কিন্তু যার কেউ নেই সে তো মানুষ !

মানুষের কাছে মানুষের সে দাবী টিঁক্‌লো কই, বলিয়া বিজয় হাসিয়া উঠিল। কুসুম কহিল, তবু এই সমাজকে মেনে চল্‌তে হবে আমাদের ?

না মান্‌লে উপায় কি, বিজয় কহিল, মাঝামাঝি পথ তো আর নেই।

হুঁ, কুসুম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু বিজয় তাকে বলিবার কোন সুযোগ না দিয়াই বলিয়া উঠিল, আমি চলি কুসুম।

—একটু দাঁড়াও। আমি যাব তোমার সঙ্গে।

—কোথায় ?

—তোমাদের বাড়ীতে।

—আমাদের বাড়ীতে ?

—হ্যাঁ জ্যাঠাইয়ের কাছে।

জ্যাঠাই অর্থে বিজয়ের মা। মায়ের কাছে কুসুম কেন যাইবে তা' বিজয় ভাবিয়া পাইল না। তা'ছাড়া যদিই বা কোন প্রয়োজন থাকে তা' হইলে সে তো দিনের বেলাতেই গেলে পারে—এমন সন্ধ্যাবেলা যাইবার দরকার কি ? এখন গেলে আবার তো রাখিয়া যাইতে হইবে। তাই সে বলিয়া উঠিল, মায়ের সঙ্গে কি দরকার ?

তা' তোমাকে বল্‌ব কেন, বলিয়া কুসুম ঘরের দরজায় শিকল তুলিয়া দি

বিজয় কহিল, গঙ্গাচানের ব্যাপার নাকি ?

কুসুম কহিল, না, না, চলো।

চল'তো চল। বিজয় আর কোন কথা বলিল না। কারণ সে জানে, বলিলেও কুসুম শুনিবে না। তবে সে শুধু বলিল, তুমি গেলে তোমাদের আড্ডার লোকেরা আস্‌বে কি ক'রে ?

—আড্ডার লোকেরা মানে ?

এই যারা হরিনাম ক'রতে আসে আর কি, মুখ ভ্যাঙ্‌চাইয়া বিজয় কহিল।

—কিন্তু অমন মুখ বেঁকিয়ে তুমি তাদের সম্বন্ধে কথা বল্‌ছ কেন ?

—মেয়েমানুষের কানের কাছে হরিনাম না ক'রলে যাদের হরিনামই হয় না তাদের সম্বন্ধে আমি এম্‌নি ক'রেই কথা বলি।

কথাটা শুনিয়া কুসুম যেন কেমন একটু রাগিয়া গেল। দাওয়া হইতে নামিয়া সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। হরিসভার সাম্‌নেই তার বাড়ী। হরিসভার কোন আটচালা নাই। তাই বর্ষাবাদলে হরিনাম করিতে গেলে সকলে কুসুমের দাওয়ায় আসিয়া বসে এবং এইভাবে বসিতে বসিতে আজকাল কুসুমের বাড়ীটাই হরিনামের আড্ডা হইয়া উঠিয়াছে। এই আড্ডাটাকে সেজন্য অনেকেই সন্দেহ করে। এবং বিজয়ের মনেও যে সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহের রেখাপাত হয় নাই তা' নয়। তার মুখ বেঁকাইয়া কথা বলাই তার প্রমাণ। কিন্তু কেন সে অমন করিবে ?

এ 'কেন'-র উত্তর পাওয়া কুসুমের পক্ষে সম্ভব নয়। যাহা হউক তার কি মনে হইল সে গেল না। বিজয় দরজার দিকে পা বাড়াইয়া কহিল, যাবে যে ?

না, আমি যাব না, বলিয়া কুসুম দাওয়ার উপরে উঠিয়া পড়িল। বিজয় কহিল, হঠাৎ মত বদ্‌লে গেল যে ?

—আড্ডার লোকেরা আস্‌বে।

—তা-ই !

—হ্যাঁ।

তা' ভাল, বলিয়া বিজয় চলিয়া গেল। কুসুম সেইখানে সেই দাওয়ার উপরে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

জগতে সবাই কুসুমকে সন্দেহ করে। কিন্তু কেন? চোখের সুমুখে ভাসিয়া উঠিল তার নিজ জীবনের এক দুঃখপূর্ণ চিত্র। ছেলেবেলায় খেলা ঘরের মধুময় দিনে সে যাকে স্বামীরূপে কল্পনা করিয়াছিল তাকে সে স্বামীরূপে পায় নাই। যার সহিত তার বাপ-মা বিবাহ দিল তার সহিতও সে ঘর করিবার সুযোগ পাইল না। স্বামী তার বিবাহের পরই কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। তারপর বাপের ভিটায় থাকিতে থাকিতে একদিন তার মা মারা গেল, কিছুদিন পরে গেল বাপ। সে শুধু পড়িয়া রহিল নিজের জীবনপাত্র দুঃখের সুরায় ভরিয়া তুলিতে। বাপের সামান্য কিছুও জমি-জায়গা ছিল না। তাই উদরান্নের সংস্থান করিতে হয় তাকে পরের বাড়ীতে ধান ভানিয়া, মুড়ি ভাজিয়া। এমনি করিয়াই তার দিন কাটিতেছিল। পিত্রালয়ে থাকিতে থাকিতে তার খেলাঘরের কামনার ধনকে কাছে পাইল, তাকে নিয়া কত জল্পনা-কল্পনা করিল, কত স্বর্গ সুখের আশায় আশান্বিত হইয়া উঠিল। কিন্তু ইতিমধ্যে আসিয়া পড়িল এই হরিনামের দল। খেলাঘরের স্বামী, ঐ লোকটা, ঐ বিজয় সরিয়া গেল দূরে। আজও যেন সে সেই ইঙ্গিতই করিয়া গেল! হায় ভগবান! এইজন্যই কি সে বিজয়কে সন্ধ্যার পূর্ব্বে মাঠ হইতে ডাকিয়া আনিয়াছিল!

বাহিরে কারা যেন ডাকিল। বোধ হয় হরিনামের দল আসিয়া পড়িয়াছে। কুসুম তাদের উদ্দেশ্যে পা বাড়াইল।

অন্যান্য দিনের চেয়ে বাড়ী পৌঁছাইতে সেদিন বিজয়ের একটু দেরী হইয়াছে। বাড়ী পৌঁছাইয়া হাত-পা ধুইয়া দাওয়ার উঠিয়া তামাক খাইবে

উদ্দেশ্যে হুঁকা কলিকা সংগ্রহ করিতে গেল। রান্নাঘর হইতে মা প্রশ্ন করিল, এত দেরী হল কেন রে?

বিজয় বাঁশের চোঙা হইতে তামাক বাহির করিতে করিতে বউয়ের উদ্দেশ্যে হাঁকিল, কোথা গেলি রে?

বউ বনমালা ঘরের ভিতর হইতে আসিয়া ক[illegible]

তামাকটা ধরিয়ে নিয়ে আয়, বলিয়া বিজয় বনমালার হাতে কলকাটা দিল। মা আবার প্রশ্ন করিল, এত দেরী করলি কেন রে?

কুসুমের ওখানে গেছলুম গো, বিজয় উত্তর দিল।

মা কহিল, হঠাৎ? বিজয় বলিল, এমনিই [illegible]লুম আর কি।

বনমালা কলিকা নিয়া রান্নাঘরে যাইতেছিল। বিজয় কুসুমের ওখানে গিয়াছিল শুনিয়া সে থমকিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া পড়িল।

মা কহিল, কি বললে কুসুম? বলছিল গঙ্গাস্তানে যাবার কথা।

—তুই কি বললি?

—আমি বললুম, আমার সঙ্গে গেলে তুমি আর গাঁয়ে ঢুকতে পারবে না।

হুঁ, উনি ঐ কথাই বলেছেন, মুখ ভ্যাঙচাইয়া চাপা কণ্ঠস্বরে বলিয়া বনমালা রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

বিজয় মনে মনে হাসিল। বনমালা সন্দেহ করে কুসুমের সহিত তার প্রণয় আছে ভাবিয়া এবং সে প্রণয়ের জন্যই বিজয় নানা ছলে তার ওখানে যায়।

মা বলিল, আহা তুই ওকথা বলতে গেলি কেন? আমি তো নে যেতে পারতুম!

—হ্যাঁ তুমিও যেমন! কে আবার ওসব ঝঞ্ঝাট পোহাতে যায় বাপু!

—না না ঝঞ্ঝাট আর কি। কবে মরে টরে যাব, যাই একদিন গঙ্গাস্তান ক'রে আসি।

—[illegible] তো যাওনা একদিন। আমি তো আর বারণ করি নি।

—হ্যাঁ আমি যাব কুসুমকে ব'লে রাখিস কথাটা।

—আচ্ছা।

বনমালা কলিকায় কাঠের আংরা ভরিয়া নিয়া আসিয়া রাগতভাবে কলিকাটা বিজয়ের সামনে বসাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। বিজয় বুঝিল কুসুমের ওখানে যা [illegible] ঘটিয়াছে। যাহা হউক কলিকাটা হুঁকার মাথায় চাপাইয়া [illegible] টান দিতে শুরু করিল।

সহসা [illegible] দল লোক একেবারে তাদের উঠানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিজয় বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিল, কারাগো—

উত্তর দিল শ্রীপতি, আ[illegible]—

শ্রীপতি এ-পাড়ার মধ্যে [illegible] ব্রাহ্মণ। কাজেই সকলে তাকে খাতির করে। বিজয় হুঁকা ফেলিয়া আসন সংগ্রহ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া কহিল, আসুন ঠাকুরমশাই।

তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হইতে কেরোসিনের ডিবাটা আনিয়া তালপাতার আসন বিছাইয়া দিয়া বিজয় শ্রীপতির দিকে চাহিয়া কি যেন বলিতে গেল। কিন্তু শ্রীপতি কহিল, তোকে অতশত বন্দোবস্ত করতে হবে না। আমরা এখন বসব না। আমাদের যেতে হবে।

—তবে কি জন্যে এলেন?

—আসার উদ্দেশ্য অবিশ্যি ভাল। আমরা এসিচি চাঁদার জন্য। গাঁতো উজোড় হয়ে গেল কলেরায়, এখন অষ্টম প্রহর কীর্ত্তন যদি না দেয়া হয় তো [illegible] যাবে—

—তা তো বটেই। তা কবে হচ্ছে?

—এই সামনের পুন্ন মেতেই।

—তাহ'লে আজ হ'লগে তৃতীয়া। আর বারোদিন মোটে সময়।

—বারোদিনের দিন তো হচ্ছেরে বাপু। আর এগারোটা দিন।

—হ্যাঁ তা বটে। তা এখন কদ্দুর যাবেন?

...তেই তারা সব সম্ভ্রমভরে চুপ করিয়া গেল। কুসুম আসিয়া ...ন পাতিয়া দিল।

শ্রীপ... পুরোহিত। শুধু পুরোহিত নয়, গ্রাম সম্পর্কে লোকটা আবার তা... । কুসুমের বাবা শ্রীপতিকে খুড়া বলিত। সেজন্য কুসুম ও শ্রীপতির স... ছে নাত্‌নী ঠাকুরদা সম্পর্ক।

শ্রীপতি দলব... কহিল, নাতনিকে একটা কথা বলতে এলুম।

দাওয়ার একদিকে কেরোসিনের ডিবা জ্বলিতেছিল। কুসুমের ঘরে জ্বলিতেছিল প্রদীপ। ...ম দরজার কাছে দাঁড়াইয়া কহিল, কি কথা ঠাকুরদা'?

শ্রীপতি মাথা চুলকাই... অষ্টমপ্রহর কীর্ত্তনের কথা পাড়িল। কুসুম কহিল, এতো খুব ভাল...

—কিন্তু ঝামেলাটা সবি যাবে তোমার ... দিয়ে ভাই।

—তা' হোক্ তা'তে আমি খুব রাজী।

শ্রীপতি কহিল, রাজী তো হ'চ্ছ কিন্তু ব্যাপা... বে দেখেচো নাত্‌নী? তোমার বাড়ীতেই ভাঁড়ার হবে, তোমার উঠো... রান্না হবে, তোমার ...াতেই লোক খাবে, তোমার ঘরেই লোকজনের ... জায়গা ক'রতে এ... এসবে তোমার কোন আপত্তি নেই তো?

—...পত্তি কিসের ঠাকুরদা', কুসুম কহিল, এই যে রোজ ... উজোড় কেত্তন হয়, আমি কখনো আপত্তি করিচি?

—তা' করনি বটে তবে অষ্টমপ্রহর কীর্ত্তনের অনেক ঝঞ্ঝাট ... যে যাবে।

—তা' হোক্ গে'।

—...ত এবার যেন আশ্বস্ত হইয়া কহিল, যাক্ একটা বড় সমস্যা মিটে ...এখন চাঁদাটা তুলে ফেল্‌তে পারলে হয়।

...র দরজার কাছে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল আপত্তি করার ...সে কোনদিন তার বাড়ীতে ভিড় করিবার জন্য কিছুই বলে নাই

বরং লোকেই উপরপড়া হইয়া তাকে অনেক কিছু উপদেশ দিয়াছে, সন্দেহ করিয়াছে। এমন কি তার কাছে যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় মানুষ, সেও তাকে সন্দেহ করিয়াছে। তবু কুসুম কোনদিনই কোন আপত্তি করে নাই। কিন্তু আজ সন্ধ্যার সময় বিজয়ের সহিত তার যে কথা কাটাকাটি হইয়া গেল, তারপর সুস্থমনে কথাটা ভাবিয়া দেখিয়া তাঁর উচিত ছিল হরিনামের দলের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিবার পন্থা খোঁজা। কিন্তু মানুষের অভিমান এত বিশ্রী জিনিস যে তা' ঠিক মানুষকে উল্টা পথই দেখাইয়া দেয়। সন্ধ্যার ঘটনা ঘটিয়া যাওয়া অবধি কুসুম যেন এই রকম একটা [illegible] অনুষ্ঠানের কথাই ভাবিতেছিল। শ্রীপতির প্রস্তাবে এখন সে সেই রকম অনুষ্ঠানেরই সন্ধান পাইয়াছে। তাই জিদের মাথায় সে হইল সব চেয়ে বেশি খুশি।

হরিনামের দল তার এই খুশি ভাবটুকু লক্ষ্য করিয়া আরও খুশি হইল। শ্রীপতির চাঁদার কথা তাদের কানেই গেল না। শ্রীপতি কহিল, ওরে পঞ্চু তোদের দলবলকে যে একটু খাটতে হবে রে।

খাটব, পঞ্চু কহিল [illegible]

বিষ্ণু কহিল, [illegible] খাটুনীর ভাবনা কি ঠাকুরদা'—আমাদের যাত্রা দলটাকেই লাগিয়ে দোব কাজে।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, শ্রীপতি কহিল, তোদের একটা যাত্রাদলও আছে বটে। [illegible] হবে। [illegible] ভাবনা শুধু চাঁদার কি বলিস?

[illegible] বৌক, পঞ্চু কহিল, তবে এবার তো আর চাঁদার ভাবনা [illegible]

—কেন?

—এবার তো আমাদের দক্ষিণ পাড়ার লোকেরা [illegible] রাজনকে [illegible]ছে। বারো আনার নীচে জোন্ নেই।

—হ্যাঁ, তা যা বলেছিস।

[illegible]জেই কেন উঠবেনে এবার চাঁদা, বলিয়া [illegible] কলের মুখের [illegible] [illegible]ল। কিন্তু পরক্ষণেই একটা প্রতিবাদ [illegible]

তাহ'লে আর কি আমাদেরই সব ক'রতে হবে, বলিয়া বিজয় সকলের মুখের দিকে একবার তাকাইয়া নিল। পঞ্চু কহিল, তুমি তো বাবা কিছুই কর'বে না।

বিজয় হাসিয়া কহিল, কেন ?

কেন কি, পঞ্চু বলিয়া উঠিল, আমরা আর জানি না। আলেকালে তো তুমি এপথ মাড়াও।

তোমাদের মত রোজ আমার সময় কোথা ভাই, বিজয় কহিল, ভগবানের কৃপায় তোমাদের খেটে খেতে হয় না। যাত্রার দল, হরিনামের আখড়া নিয়ে তোমরা বেশ সময় কাটাতে পারো কিন্তু আমাকে পরের জমিতে মুনীষ খেটে খেতে হয়। পরের ওপর আমার ভাতভিক্ষে, কাজেই কখন আমি আসি বল ?

উঁহু তা নয়, পঞ্চু এবার কহিল, তুমি তো ইদিকে আসনা কুসুমের ওপর রাগ ক'রে ভাই !

বোকার মত বিজয় জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল কথাটা তাকে কে বলিয়াছে কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই নিজেকে সাম্‌লাইয়া নিয়া সে ভাবিয়া দেখিল, থাটা কুসুম তাকে না বলিলে আর কেহ বলিতে পারে না, কাজেই কথাটা

[illegible]না তুলিয়া কহিল, তাই নাকি ?

[illegible]া।

[illegible] হাসিল। কিন্তু সেই হাসির অন্তরালে তার মুখমণ্ডলের আসল ছবি [illegible] দ কেহ দেখিতে পাইত তা' হইলে সে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিত যে বিজয়ে[illegible] হাসিটুকু কতখানি বেদনার। কুসুম নিজের কথা অপরকে বলে [illegible] ও তার লজ্জাবোধ হয়! কিন্তু কেন ?

[illegible] ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া ব্যাপারটাকে হাল্‌কা করিয়া [illegible] সে [illegible] 'ঞ্চুদা' ঠিকই বল্‌ছে। তুমি তো আমারই ওপর [illegible]

কিন্তু তোমার ওপর রাগ কর'তে যাব কেন আমি বল্‌তে পারো কুসুম, বলিয়া বিজয় একবার তার মুখের দিকে আর একবার আর সকলের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। তারপর সকলকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া নিজেই বলিয়া উঠিল, আমার কথা তো আমি বলিচি, আমার সময়ের একান্ত অভাব।

কুসুম কহিল, কিন্তু আরও পাঁচজায়গায় তো যাও—

—বল কোথায় যাই ?

—কেন ঘনশ্যাম জ্যাঠার ওখানে।

বিজয় হাসিয়া কহিল, কিন্তু ঘনশ্যাম জ্যাঠার ওখানে কেন যাই তা'তো সবাই জানে কুসুম। জ্যাঠা আমাকে কাজ যোগাড় ক'রে দেয়, নানারকম সাহায্য করে—কাজেই সেখানে না গেলে আমার চলে না।

শ্রীপতি এতক্ষণ ইহাদের তর্ক-বিতর্ক শুনিতেছিল। এবার বলিয়া উঠিল. থাক্ বাপু, তোরা এখন কেউ উঠ্‌বি না গান ক'রবি ?

পঞ্চু কহিল, উঠ্‌লেই হয়।

বিজয় কহিল, সকলের চাঁদাটা ফেলে দিলে হ'ত না ঠাকুরমশাই ?

শ্রীপতি কহিল, গত বছরের তো লিষ্টি রয়েছে।

—তা'তে চল্‌বে ?

—চল্‌বেনে ?

তবে আর কি উঠলেই মিটে যায়, বলিয়া বিজয় হাই তুলিল।

কুসুম বলিয়া উঠিল, কিন্তু তুমি যেন এক্ষুনি উঠো না একটু দরকার আছে।

কথাটা সকলেই শুনিল কিন্তু সাহস করিয়া কেহ কিছু ব[illegible] পারিল না। সকলেই উঠিয়া পড়িল। বিজয় শুধু হতভম্বের মত বসি

সকলে চলিয়া গেলে কুসুম কহিল, ত্যাখো তুমি লোকে[illegible]নে. [illegible] অমন করে অপিসতুচ্ছে ফেল না।

বিজয় অবাক্ হইয়া বলিল, আমি ফেললুম না তুমি ফেললে ?

—আমি তো মানিয়ে নিলুম, কিন্তু তুমি ?

—কিন্তু দোষ তো আমার নয়।

—মানে ?

—মানে আর কি। বুঝ্‌তে পারছ না!

সত্যই কুসুম বুঝিতে পারিল না। সে শুধু বিস্ময়-নির্ব্বাক দৃষ্টিতে বিজয়ের দিকে তাকাইয়া রহিল। আর বিজয় মনে মনে ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, কুসুম নিজের কথা অপরের সহিত আলোচনা করে ভাবিয়া। এইভাবে কিছুক্ষণ চুপ্‌চাপ কাটিয়া গেল।

কুসুমই প্রথমে নীরবতা ভঙ্গ করিল, তুমি আমাদের বাড়ী আস না। আর এলেও ওরা তোমার আসাটাকে ভালচোখে দেখে না। অথচ ওরা আসেই। ওরা আসে ব'লে তুমি আমার ওপর রাগ করো, এই কথাটা ওদের কাছে বল্‌লে এবাড়ীতে তোমার আসার পথ সোজা হ'য়ে যাবে। আর সেইজন্যেই আমি কথাটা বল্‌লুম কিন্তু তুমি বল্‌লে কিনা "তোমার ওপর রাগ ক'রতে যাব কেন।" কথাটা না ব'লে কি তুমি চুপ করে থাকৃতে পারতে না? পঞ্চু, বিষ্ণু রা সব যে ধরনের লোক তা'তে তোমার এই কথাটা নিয়েই কত হাসাহাসি ক'রবে আর সে হাসাহাসির পেছনে থাকৃবে আমার নামটা জড়ানো।

কুসুমের কথায় বিজয়ের রাগটা পড়িয়া আসিতেছিল। কিন্তু তার শেষ কথাটায় বিজয় আবার রাগিয়া উঠিল। বলিল, নিজের কথাটাই তুমি বেশি ভাবো, কিন্তু ভূলে যাও কেন আমারও মানসম্ভ্রম ব'লে একটা জিনিস আছে।

—তা' কি আমি অস্বীকার করছি ?

—ক'রছ তো। নিজেকে ধরাছোঁয়ার বাইরে রাখবার জন্যে লোকের কাছে ওকালতি ক'রতেও যখন পেছ্‌-পা হও না তখন আর ওসব কথা ব'লে লাভ কি ?

—ওমা! কার কাছে আমি ওকালতি ক'রতে গেছি ?

—পঞ্চু কি কথাগুলো অন্তর্যামী হয়ে বল্‌লে ?

—ওতো বল্‌লুম। আমি বলিচি। ওকথা বল্‌লে তো তোমারই আস্‌বার সুবিধে হবে এবাড়ীতে।

চুলোয় যাক্ সুবিধে, বিজয় উঠিয়া পড়িল। কুসুম পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি যেও না—

—যাব না তো কি ক'রব আমি ?

—একটু ব'স।

—না অনেক রাত হয়েছে।

—একটি বারও তুমি বস্‌তে পার না, একটুখানি ?

—না।

—বেশ, তুমি যাও। তবে যাবার আগে ব'লে যাও তুমি আমার ওপর রাগ কর নি ?

—রাগ আমি ক'রতে যাব কেন ?

—ঠিক বল্‌ছ ?

কড়াকথা মুখ দিয়া বাহির হইতে যাইতেছিল কিন্তু সে বলিতে পারিল না শুধু বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ।

কুসুম প্রশ্ন করিল, আবার তা'লে আস্‌বে বল ?

—আস্‌বো।

সহসা কুসুম তার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল, তোমার কাছে আমি কিছু চাই না। তুমি শুধু দিনান্তে একটিবার ক'রে আমাকে দেখা দিও। আমি বড় দুঃখী, আমার কেউ নেই।

শেষের দিকে কুসুমের কণ্ঠস্বর কেমন যেন গাঢ় হইয়া আসিল। বিজয় তা উপলব্ধি করিয়া কি যেন ভাবিল—তারপর কহিল, আচ্ছা বেশ তাই হবে। এখন আমি চলি। তুমি পথ ছেড়ে দাও—

কুসুম উঠিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। বিজয় তার মুখের দিকে একবার তাকাইয়া

নিয়া চলিতে লাগিল। কুসুম তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চল পুতুলের মত শুধু দাঁড়াইয়া রহিল। দুই চোখে তার জল।

আকাশে সেদিন তৃতীয়ার চাঁদ মধ্য গগনের গভীর শূন্যে দিশাহারা। রাত বেশিই হইয়াছে বলিয়া মনে হইল। বিজয় দামোদরের খালের পাশে পাশে, বাঁশের পুল পিছনে ফেলিয়া বাড়ী আসিয়া পৌছাইল। মা অনেক আগেই শুইয়া পড়িয়াছিল। বউ-ও তার ঘুমাইতেছে। বিজয় গোয়ালঘরে গিয়া অভ্যাসমত একবার গরুগুলাকে দেখিয়া নিল ঠিক আছে কিনা। তারপর শয়নঘরে গিয়া দরজা ঠেলিল। দরজা খোলাই ছিল। ঠেলিতেই খুলিয়া গেল।

দিয়াশলাই জ্বালিয়া সে ঘরে প্রবেশ করিল। কিন্তু দিয়াশলাই কাঠির সেই ক্ষণিক ও স্বল্প আলোকে বিছানায় বনমালার যে মূর্ত্তি সে দেখিল তা'তে সে বিরক্ত না হইয়া পারিল না। উপুড় হইয়া বনমালা বিছানার উপর আড়াআড়ি-ভাবে শুইয়া আছে। এইভাবে শুইয়া থাকার অর্থ দাম্পত্য অভিমান। পুরুষ-মানুষের কাছে এ-অভিমান অত্যন্ত পীড়াদায়ক তা' ইহার পিছনে কারণ থাকুক আর নাই থাকুক। কিন্তু এ আজ নূতন নয়। এরূপ অভিমান স্বামীমাত্রকেই ভাঙাইতে হয় এবং বিজয়ও তা' বহুবার ভাঙাইয়াছে। শুধু মিষ্ট কথায় কিছু প্রতিশ্রুতি দিলে এবং অভিমানিনীর কিছুটা চোখের জল ঝরিয়া গেলে, আপনা-আপনিই এ অভিমানের যবনিকাপাত হয়। বিজয় সেই দিকেই যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

২

ভোর হইতে না হইতে বুড়া ঘনশ্যাম আসিয়া হাঁকিতে লাগিল, বিজয়—বিজয় ?

বিজয় তখনও ঘুমাইতেছিল। মা উঠিয়া বিজয়কে ডাকিয়া দিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া ঘনশ্যামকে ডাকিয়া আনিয়া দাওয়ায় বসাইয়া কহিল, বড় ঘুমিয়ে প'ড়েছিলুম জ্যাঠা !

শুতে বুঝি রাত হ'য়ে গেছ্‌ল ?

হ্যাঁ।

—কেনরে ?

কেন হয়ত তা না বলিলেও চলিবে। সে কুসুমের ওখানে গিয়াছিল। তা ছাড়া কুসুমের সঙ্গে তার গত রাত্রির যেসব আলাপ-আলোচনা তা এতই অভিনব ও মাদকতাপূর্ণ যে সেসব কথা রাতে শুইয়া শুইয়া সে না ভাবিয়া পারে নাই। হাজার হোক্ সে তো মানুষ। মানুষের বুকের দরজায় মানুষ আসিয়া বারে বারে যদি করাঘাত করিয়া বলে—'ওগো দ্বার খোলো,' 'দ্বার খোলো' তবে সে মানুষ দ্বার না খুলিয়া করে কি ? এবং সেই ভাবে খুলিয়া দিতে হইলে তজ্জন্য যে-পরিমাণ ভাবনাচিন্তা আপনা হইতেই মাথার মধ্যে জমাট বাঁধিয়া তোলপাড় করিতে থাকে তার হাতই বা সে এড়াইয়া যায় কি করিয়া ? তার উপর আবার বনমালার কথাও আছে। বনমালার ভাগ্য তারই র সহিত জড়িত। কাজে-কাজেই কুসুমের কথা ভাবিতে গিয়া বনমালার উপর যেন সে কোন অবিচার না করিয়া বসে—একথাও তাকে ভাবিতে হইয়াছিল। কিন্তু মানুষের পক্ষে দুইকূল রাখিয়া সংসারে চলা কি সবসময়ে সম্ভব ? বিজয় সে জায়গায় নানারকম যুক্তি খুঁজিতে চেষ্টা করিয়াছে। যুক্তি ক্রমশঃ উদাহরণে গিয়া পৌঁছাইয়াছে। গ্রামে একাধিক বিবাহ বা [illegible]

ব্যাপারের অভাব নাই। ও পাড়ার ভট্‌চায্‌ই তার প্রমাণ। লোকটার দুই বিবাহ। দুই স্ত্রীই একসঙ্গে ঘর করিতেছে। দুই স্ত্রীরই পুত্রকন্যা হইয়াছে কিন্তু পারিবারিক জীবনে তাদের কোন বিরোধ নাই। তবু বনমালার কথা মনে করিয়া বিজয় কেমন যেন নিজেকে অসহায় বলিয়া উপলব্ধি করে। রাতে এইসব সাতপাঁচ ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইতে তার কিছুটা বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল এবং তারই জেরস্বরূপ আজ ভোরে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সময়মত উঠিতে পারে নাই। কিন্তু সে কথা ঘনশ্যামকে বলে কি করিয়া? তাই সে ছোট্ট একটু কথায় 'হাঁ' বলিয়া সারিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু ঘনশ্যাম বুড়া পুনরায় 'কেনরে' প্রশ্ন করিতে সে মুস্কিলে পড়িয়া গেল। কি বলিবে ভাবিয়া পাইলনা।

বুড়া নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়া উঠিল, গা-হাত ভারী হয়েছিল নাকি?

বিজয় কহিল, ঠিক তা'নয়—তবে শরীরটার বেশ জুৎ ছিলনা।

খুব সাবধান, ঘনশ্যাম কহিল, এসময়টায় আর জ্বরটরে পড়িস্‌নি বাবা। সারাবছরের এই মরশুম।

সেকথা আর বল্‌তে, বলিয়া বিজয় প্রস্তুত হইতে লাগিল। বাঁশের চোঙায় তামাক ভরিল, খড়ের ব্যাওনা সংগ্রহ করিয়া নিল। ঘনশ্যাম কহিল, আজ ওদিককার কাজ সেরে তবে আমরা নতুন কাজে হাত দোব কি বলিস্‌?

ওদিককার কাজ বলিতে নিজেদের জমির কাজ। ঘনশ্যামের বিঘা চারপাঁচ জমি আর বিজয়ের বিঘা তিনেক—এইমাত্র জমি উভয়ের জমা আছে।

বিজয় কহিল, তা তো ক'রতেই হবে জ্যাঠা। নিজেরা যা-হোক্‌ প্রতিবছরই যখন জমিটুকু জমা নিই তখন সেটাকে যদি জোন্‌খাটার লোভে চাষ না করি তো গোঁতবছর খাব কি?

—সেইজন্যেই তো বল্‌ছি।

—আমি কিন্তু এ-জমি রুইতে পারলে অন্যকাজ আর হাতে ছুঁনোবনা জ্যাঠা।

—কেন?

—যা' মজুরীর ছিরি। বরঞ্চ লাঙল বেচায় পয়সা আছে।

—তা যা বলিছিস্। তবে—

—তবে নয় জ্যাঠা। ওতে লোকের কাছে মান থাকে।

ঘনশ্যাম কথাটা ভাবিয়া দেখিতে লাগিল। লাঙল বেচা অর্থে লাঙল বেচিয়া দেওয়া নয়—লাঙল ভাড়া খাটানো। লাঙল ভাড়ায় প্রতিদিন লাঙল পিছু দেড়টাকা করিয়া পাওয়া যাইতেছে এবার। অন্যবারে অবশ্য এত ভাড়া পাওয়া যায়না—এবারে বিলম্বের চাষ, সকলেরই একসঙ্গে দরকার। স্বাভাবিকভাবে চাষ চলিলে দুদিন আগুপিছু করিয়া লোকে চাষ করে, তাই লাঙলের এত চাহিদা থাকেনা এবং চাহিদা না থাকিলে দরও থাকেনা। বিজয় কথাটা মন্দ বলে নাই। তবু ঘনশ্যাম বলিল, তুই বল্‌ছিস্ ঠিকই কিন্তু ব্যাপার কি জানিস্, এবারে ভাদ্দর মাসে আবাদ হ'চ্ছে বল্‌লেই হয়। পশ্চিমী কিরষেণ নেই এবার, এখনও যারা দু-একজন আছে তাদেরও দেশে ফেরবার সময় হয়েছে, কেননা তাদের দেশেও তো আবাদের সময় ঘুরে এল আবার—

বিজয় কহিল, তা বটে কিন্তু তাতে কি মজুরী বাড়বে বলে মনে হচ্ছে?

—এখুনি তো বেড়ে গেছে।

—কত?

—এখুনি তো বারো আনা হয়েছে।

—তাহলে এক কাজ করা যাবে জ্যাঠা!

—কি বলদিকি?

—আমরা তাদেরি লাঙল বেচব যারা আমাদের কাজে নেবে।

—আমিও তো তাই ভাবছি। আর সে রকম লোকেরও সন্ধান পেয়েছি আমি।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। আমাদের যোগেশবাবু তো বলেই রেখেছে আমাকে। ওরা ঐ যে কি আদর্শগ্রাম তৈরী করছে না, আমাকে বলছিল যে জমিগুলো যখন সার্ক করে বের করা হল তখন ফেলে রেখে লাভ কি? আমি বললুম, 'তা তো বটেই।' যোগেশবাবু বললেন, 'আদর্শগ্রাম তৈরী হলে সেই যখন আবাদই করতে হবে এ জায়গায় তখন আগে থেকে করলে তো লাভ ছাড়া লোকসান নেই আমাদের।' আমি বললুম, 'কথা তাই।' তাতে যোগেশবাবু বললেন, আবাদ ক'রে দেয়ার কথা। আমি বললুম, 'বলেন তো আমি নিজে কিম্বা আরও পাঁচসাতজনকে নিয়ে কাজ করতে পারি।'

বিজয় সব কিছু শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। ঘনশ্যাম কহিল, হাসলি যে?

হাসলুম তোমার কথা শুনে জ্যাঠা, বিজয় কহিল, যোগেশবাবুর সঙ্গে তোমার এত ভাব হল কবে?

—কেন বলদিকি?

বিজয় গোয়ালঘর হইতে গরু আনিতে যাইতে যাইতে কহিল, চিরকালটা তো তোমরা দু'পক্ষে মামলা মোকদ্দমা করে এলে!

ঘনশ্যাম কহিল, ও এই কথা! তা আমি তো আর নিজের জন্যে মামলা করিনি তেনার সঙ্গে, করিচি গেরামের পাঁচজনের জন্যে। কাজেই আমার দিক থেকে না ভাব থাকার কথা তো উঠতেই পারে না।

বিজয় গোয়ালঘর হইতে হাসিয়া উঠিল। ঘনশ্যাম কহিল, অবিশ্যি যোগেশবাবুর দিক থেকেও এই কথা। তিনিও নিজের জন্যে আমার সঙ্গে মামলা করেন নি—করেছেন বোর্ডের স্বার্থরক্ষার খাতিরে। কাজেই ভাব হবে না কেন?

বিজয় গরু খুলিয়া আনিয়া কহিল, যাকৃগে ও সব কথা জ্যাঠা—শশীখুড়োকে ডাকতে হবে নাকি ?

না-না, ঘনশ্যাম কহিল, খালের বেঁশোপুলের ওখানে সে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ডেকে তবে তোর এখানে এসিচি।

শশী হইতেছে ঘনশ্যামের বন্ধুলোক। ঘনশ্যাম শশীর বাড়ীতে খোরাকী দিয়া খায়। বিজয় কহিল, শশীখুড়ো আজ কোনদিকে কাজ করবে ?

—তা কিছু বলেনি।

—তা'লে বোধহয় নিজের ক্ষেতেই লাগবে ?

—কি জানি। যাকৃগে এখন একটু তাড়াতাড়ি চ'—

হ্যাঁ আমার তো হয়ে গেছে, বলিয়া বিজয় পা বাড়াইল। ঘনশ্যামও উঠিয়া পড়িল।

ভোরের অন্ধকার তখনও তরল হয় নাই। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র। তবু তারা এই সময়েই মাঠের উদ্দেশ্যে চলিল। পশ্চিমপাড়া জলের দেশ, বন্যার দেশ। প্রতি বছর দামোদর রুদ্ধ-আক্রোশে এদিকে ছুটিয়া আসে। তাই এখানকার ক্ষেত-খামার গ্রাম হইতে অনেকটা দূরে। প্রায় দেড় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া, হরিণাখালি, কেষ্টবাটী প্রভৃতি পার হইয়া, তবে যে যার ক্ষেতে আসে। সেজন্য এখানকার কৃষকদের একটু রাত থাকিতেই কাজে বাহির হইতে হয়। কারণ ভোরের শীতল আবহাওয়ায় যত দ্রুত বেশি কাজ করা যাইবে, সূর্য্যোদয় হইয়া গেলে তত কাজ করা যাইবে না।

খানিক পরেই তারা খালের বেঁশোপুলের নিকট আসিয়া পড়িল। শশী তাদের পদশব্দ পাইয়া বলিয়া উঠিল, তোমরা কি আজ আসবে নে ঠিক করেছো ?

বিজয় শশীর কণ্ঠস্বর পাইয়া কহিল, কেন খুড়ো ?

সেই কখন থেকে গরুগুলোকে নিয়ে এখানে একলা একলা দাঁড়িয়ে

রয়িচি, বিরক্তভরে শশী বলিয়া উঠিল। ঘনশ্যাম হাসিতে হাসিতে বলিল, ভূতের ভয় করছিল নাকি?

বিজয় হাসিয়া উঠিল। শশী সেদিক দিয়া না গিয়া বলিয়া উঠিল, এমনি দেরী করলে যে শেষটায় পস্তাতে হবে।

শশী ঠিকই বলিয়াছে। এ বছর বিলম্বে আবাদ হইতেছে। বৈশাখ গেল, জ্যৈষ্ঠ্য গেল, আষাঢ় গেল, গেল শ্রাবণও—তবু আকাশে একখণ্ড মেঘ দেখা গেল না। মাঠের বুকে হিংস্র জানোয়ারের ক্ষুধিত দন্তরাজির বীভৎসতার মত অজস্র ফাটল দেখা দিল। সারা দেশ যেন হইয়া উঠিল অজন্মার একটা পাতা ফাঁদ। যাহা হউক ভাদ্রের গোড়াতে শেষ পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইল। লোকে যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। কিন্তু সে তো নিঃশ্বাস ফেলা নয়—শুধু মরিয়া হইয়া উঠা। পারিলে লোকে এখন দিনরাত খাটিতে চায়। কারণ বর্ষার সুবিধা হয়ত আর না-ও মিলিতে পারে। তাই প্রথম সুযোগেই কাজ শেষ করা সব চেয়ে সুবিধাজনক। সেজন্য এই সুযোগের একটা মূহূর্ত্তও হেলায় নষ্ট করা উচিত নয়। ঘনশ্যাম বিজয়কে ডাকিতে গিয়া যে দেরী করিয়া ফেলিয়াছে তজ্জন্য সে মনে মনে লজ্জিত হইল এবং বলিয়া উঠিল, আমাদের পস্তাতে হবে না শশী। কেন না এত ভোরে বোধ হয় আর কেউ মাঠে যাচ্ছে না।

কে বললে, শশী প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিল, সাঁতরারা গেছে, ধাড়ারা গেছে—

ঘনশ্যাম আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, বলিস কি রে!

বলি আমি এই রকমই, শশী যেন একটু বিরক্ত ভরেই কহিল, এসো এসো পা চালিয়ে এসো—

বিজয় কহিল, লোকে একেবারে আদাজল খেয়ে লেগেছে দেখতে পাচ্ছি।

হুঁ, ঘনশ্যাম চিন্তিতভাবে কহিল। খালে জল নাই, জমিতে নাই সরসতা, আকাশেও মেঘের সন্ধান মিলে না—কাজে কাজেই সামান্য একটু

বৃষ্টি হইতেই যে লোকে আদাজল খাইয়া আবাদ করিতে ছুটিবে ইহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? ঘনশ্যাম নিজেও যেন একটু চঞ্চল হইয়া পড়িল। এই বৃদ্ধ বয়সেও মনে কেমন যেন একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব জাগিয়া উঠিল। তাকে আবাদ করিতেই হইবে।

ভোরের স্নিগ্ধবাতাস তখন ধীরে ধীরে বহিয়া চলিয়াছে। অন্ধকার তখনও অন্তর্হিত হয় নাই। ক্ষেতে যাইতে পথ অনেকখানি। তবু ঘনশ্যাম যেন শশী ও বিজয়ের চেয়ে একটু দ্রুতপদেই চলিতে লাগিল।

বেশ লোক ঐ ঘনশ্যাম।

সারাটা জীবন ধরিয়া লোকটা ধরিত্রীর উর্ব্বরা-অনুর্ব্বরা বুকে কেবলই লাঙলের কঠিন ফলা বিঁধিয়া আসিয়াছে। তাতে যা ফল ফলিয়াছে তা মানব-জীবনের পক্ষে এক নির্ম্মম অভিব্যক্তি। অঙ্কের হিসাবে শূন্যও যেমন একটা ফলাফল, ব্যাকরণের মতে বসিয়া থাকাটাও যেমন একটা কাজ, তেমনিতরো হাস্যকর ও পরিহাসময় ফলাফলে ঘনশ্যামের জীবনখাতায় জমার অঙ্ক দিনে দিনে বাড়িয়াই উঠিয়াছে। কাজেই ··· এবং এমনিতরো দিনগুলিতে ঠিক যেমন করিয়া লাঙলের ফলায় সে ধরিত্রীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া আসিয়াছে, তেমনি করিয়া মহাকালের লাঙল তার অব্যর্থ ও অনিবার্য্য ফলায় ঘনশ্যামের সত্তর বছরের শরীরটাকে চষিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছে। কিন্তু তা হইলেও মাটির সমুদ্র মন্থন করিয়া যে অমৃত উঠিয়া আসিয়াছে তা পান করিয়া ঘনশ্যাম এমন একটা জিনিষ লাভ করিয়াছে, যাকে ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলে বলিতে হয় অধ্যবসায় ক্ষমতা।

অদ্ভুত তার এই অধ্যবসায় ক্ষমতা। ঋতুর পর ঋতু, বছরের পর বছর বেচারা লাঙল দেয়, আবাদ করিয়া যায় কিন্তু হয় অনাবৃষ্টি, না হয় অতিবৃষ্টি কিম্বা অকালবৃষ্টি বা বন্যা প্রভৃতির দৌরাত্ম্যে তার অধিকাংশ ফসলই নষ্ট হইয়া যায়। তবু সে অদম্য উৎসাহে প্রতি ঋতুতে প্রতি বছরে চাষ আবাদ করিয়া

যায়। গাঁয়ের লোকে বলে, কি বাবু ও জমি কি না রাখলেই ? ঘনশ্যাম তার কৃষ্ণবর্ণ মুখখানার ভিতর হইতে পান ও তামাকের ছোপধরা দাঁতগুলা বাহির করিয়া বলে, কি যে বলো তার ঠিক নেই· আমার মায়ের মতন।

বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যস্থলে ঘনশ্যামের জমিগুলি। অনাবৃষ্টি বা বন্যার ধাক্কা যখন সারা মাঠেই আসিয়া লাগে তখন তারও এই জমিগুলি বাদ যায় না, সমানে সকলের সঙ্গে তাকে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। কিন্তু অধিকাংশ সময় তাকে যে দুঃখভোগ করিতে হয় সে দুঃখ আর সবাইকে ভোগ করিতে হয় না। কেননা তার জমিগুলি মাঠের মধ্যস্থলে হওয়ার দরুণ সেগুলি হইয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা নামী। নামী জমিতে ভেকের প্রক্রিয়া-বিশেষেও বাণ ডাকিয়া যায়। অতএব একটু ভারী বৃষ্টিতে যে কি অবস্থা হয় তা সহজেই অনুমেয়।

এম্‌নিতরো জমির সঙ্গে তাকে সারাজীবন ধরিয়া যুদ্ধ করিয়া আসিতে হইতেছে বলিয়া তাকে প্রয়োজনমত ব্যবস্থাও করিতে হইয়াছে। তাই জমিগুলির একপাশে একটি কুঁড়ের মত মাচা বাঁধিয়াছে। মাচার উপর খড়ের ছাউনি। সেইখানেই ঘনশ্যাম দিনরাত থাকে। দু-খানা তেলচিটে কাঁথা, অনুরূপ একটা বালিশ, কড়িবাঁধা দুটো হুঁকো, একটা চকমকি, জার্ম্মানীর লণ্ঠন যখন এদেশে আসে নাই তখনকার দিনের টিনের বাঁধুনি দেয়া চারচৌকো কাচের মধ্যে কেরোসিন ডিবার একটা সাবেককালের আলো, একটা ভাঙা বাক্স, একটা চুম্‌কি ঘটি, খান দুই কাস্তে, একটা জলের কলসী আর একখানা লাঠি—ইহাই হইতেছে মোটামুটি তার আসবাবপত্র। তা ছাড়া মনের খোরাক মিটাইবার জন্য আছে বহুদিনের পুরাণো একখানা পাতাছেঁড়া মহাভারত। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সুতাবাঁধা একজোড়া চশ্‌মা চোখে দিয়া সে সুর করিয়া পড়ে। মাচাটীতে ওঠানামা করিবার জন্য একটা মই লাগানো আছে মাচার গায়ে।

প্রতিদিন ভোরে ঘনশ্যাম তার এই মাচা হইতে গ্রামের ভিতর আসে এবং শশীও বিজয়কে ডাকিয়া নিয়া যায়। আশ্চর্য্য মানুষ কিন্তু।

ঘনশ্যামের স্ত্রী অনেকদিন গত হইয়াছে। তার তিনটী ছেলে। কিন্তু তারা সকলেই স্ত্রী-পুত্র নিয়া সহরে থাকে। সে এক বড় দুঃখের কাহিনী। চাকরী করিয়া তারা নগদ পয়সা আনিবে বলিয়া ঘনশ্যাম তাদের ছাড়িয়া দিল কিন্তু পয়সা তো তারা আনিলই না উপরন্তু সেই সঙ্গে তারাও সময়ের ব্যবধানে পিতার সহিত সকল সম্পর্ক চুকাইয়া দিল। বড়ছেলে কিঙ্কর চটকলে কাজ করে, মেজছেলে হরিহর কাজ করে কি একটা কাপড়ের কলে, ছোটছেলে শম্ভু করে বুঝি জলকলে। তাদের জীবনে বাজিয়া উঠিয়াছে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল জীবনের সুর। হয়ত সেই জন্যই আর তাদের পল্লীগ্রামকে ভাল লাগেনা, ভাল লাগেনা মান্ধাতা-আমলের এই চাষ আবাদকে এবং এমনিতরো পুরাতন সামাজিক আবেষ্টনীকে। এবং এইজন্য তারা ঘনশ্যামকেও ভুলিতে বাধ্য হইয়াছে। তা ছাড়া অর্থনৈতিক কারণটাও এখানে ধর্ত্তব্যের মধ্যে। সহরে জীবনযাত্রার মান পল্লীগ্রামের চেয়ে অনেক উঁচু এবং সেদিক দিয়া আবার তাদের স্ত্রী-পুত্র নিয়া বাস করিতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীভাড়াও দিতে হয়। কাজেই এই অর্থনৈতিক সমস্যা তাদের যে কি অবস্থায় টানিয়া নিয়া গিয়াছে তা সহজেই বুঝা যায়। পিতামাতার প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধা-ভক্তির কথাটা এখানে উহ্য থাকিতেই বাধ্য।

ঘনশ্যামের কাছে ছেলেদের এই ব্যবহারটা মর্ম্মান্তিক হইলেও কেমন করিয়া সে স্নেহের প্রলেপ দিয়া তা সহ্য করিয়া নিয়াছিল। কিন্তু লোকে তাকে এদিক দিয়া বড় বেশি সচেতন করিয়া দেয়, গায়ে পড়িয়া সহানুভূতি জানায়। ঘনশ্যাম কিন্তু ছেলেদের নিন্দা বাঁচাইয়াই যায়।

পথে যাইতে যাইতে এইসব কথাই হইতেছিল। ঘনশ্যামকে বিজয় শ্রদ্ধা করে। অবশ্য এ শ্রদ্ধা যে সে শুধু তাকে কাজ দেখিয়া দেয়, তার আপদে বিপদে দেখে, তাই বলিয়া করে তা নয়—বিজয় তাকে শ্রদ্ধা করে লোকটার

জীবনে অপূর্ব্ব সাদাসিধা ভাব দেখিয়া। মনের উপর দিয়া তার ঝড় বহিয়া যাইবার কথা কিন্তু গভীর প্রশান্তির স্নিগ্ধতায় আজ-ও সে মনকে সরস করিয়া রাখিয়াছে। সেই সরস মনের সজীবতা দিয়া কেমন করিয়া যেন সে মানুষের কল্যাণ কামনা করিতে পারে অদ্ভুতভাবে। গ্রামের কল্যাণ ভিন্ন লোকটা জীবনে কখনও অন্য কাজ করেই নাই। অথচ তার জীবনধারা এম্‌নিতরো। বিজয় কহিল, জ্যাঠা ওরা কি গাঁ-মুখো হবেনা আর?

ওরা বলিতেই ঘনশ্যামের চোখের সুমুখে ভাসিয়া উঠিল—তিনছেলে, তিন পুত্রবধু, নাতি-নাতনীদের মুখ। বড় বেদনাদায়ক এই অবস্থা। কিন্তু তা স্বভাবসিদ্ধ সহনশীলতার দ্বারা সে চাপিয়া রাখিয়া কহিল, আস্‌বে কি ক'রে বিজয়—পরের চাকরী বজায় রেখে তারপর তো সব?

তা বটে, বিজয় কহিল, তবে এলে আর পারেনা—এইতো লোক ইছেপুর ফ্যাক্টরীতে কাজ ক'রছে—ফি হপ্তাতে তারা আসেনা?

—তারা আসে তাদের সবকিছুই প'ড়ে আছে গেরামে, তাই—

—আর তাদের? এই গাঁয়ে তারা জন্মেছে, এই গাঁয়ে তারা মানুষ হয়েছে, এই গাঁয়ে তাদের ঘরবাড়ী—এর পরেও তাদের এ-গাঁয়ে কিছু কি নেই বল্‌তে হবে?

—কিন্তু সেকথা তো তারা বলেনি।

—না বলুক। লোকে যে বল্‌ছে।

—লোকে তো বল্‌তেই পারে। তারা তো ভেবে দ্যাখে না—

সত্যই লোকে ভাবিয়া দেখেনা হয়ত। তবু বিজয় কি যেন বলিতে উদ্যত হইল। শশী এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল—সে ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল, নে বাপু রাখ ওসব কথা, এখন পা চালিয়ে চল্—

শশীর কথায় উহাদের দু'জনেরই চমক্ ভাঙিল। বিজয় তাড়াতাড়ি গরু দুইটার লেজ মলিয়া দিয়া মুখে শব্দ করিয়া বলিল, হুঁ-র‍্যা র‍্যা। চলনা—ব্যাটারা চল না!

ঘনশ্যাম কি মনে করিয়া হাসিল ও পা ফেলিতে লাগিল

সূর্য্যোদয় হইতে না হইতেই দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠে পড়িয়া গিয়াছে জীবনের সাড়া।

বর্ষা-বিস্ফারিত বাংলার আর সে রূপ চোখে পড়ে না। যদিও এটা বর্ষাকাল নয় তবুও প্রথম বারিবর্ষণের দিকে বাংলাদেশে মাতৃত্বের পরিপূর্ণতার যে স্নিগ্ধ-স্বচ্ছরূপ বাঙালী মাত্রকেই মুগ্ধ করে, মাঠের দিকে তাকাইয়া তার অনুপস্থিতি দেখিলে সত্যই মনটা যেন কেমন হাহাকার করিয়া উঠে। এখন শরতের প্রথম দিক। এসময়ে গাছেপালায়, বনে বনে, মাঠে যে চোখ-ধাঁধানো সবুজের সমারোহ দেখার কথা, তা আর দেখা যায় না। গাছে গাছে বনে-জঙ্গলে বসন্তজাত সবুজ পত্রসমূহ জন্ম হইতেই ভিখারী বালকের মত অনাদৃত অবস্থায় ধুলাবালি মাখিয়া যেন কেমন মলিন হইয়া গিয়াছে। বর্ষাধারা জননীর মত তাদের বুঝি ধুয়াইয়া-মুছাইয়া দিবার অবসর-ও পায় নাই। তাই দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠে দাঁড়াইয়া সমস্ত প্রকৃতিকে মনে হয় যেন এক গভীর দুঃখে পৃথিবী ম্লান হইয়া গিয়াছে।

মাঠের বুকে কর্ম্মরত মানুষদের কিন্তু সেদিকে তাকাইবার অবসর নাই। বাংলাদেশ কি হইয়া গিয়াছে তা তারা জানে। নিজেদের গ্রামখানিই তার যথেষ্ট প্রমাণ।

ধীরে ধীরে সূর্য্যোদয় হইল, বেলা বাড়িয়া উঠিল। মাঠে মাঠে কর্দ্দমের জলীয় অংশ বাষ্প হইয়া আকাশে উড়িয়া গেল, মানুষের স্বেদাক্ত শরীরে ক্লান্তির বেদনা নামিয়া আসিল। গরুগুলারও সেই অবস্থা। জোয়াল হইতে ছাড়া পাইলে যেন বাঁচে। মুখ দিয়া তাদের ফেনা কাটিতেছে। এইবার বিশ্রাম, একটুখানি বিশ্রাম।

শশী ও ঘনশ্যামের ক্ষেত হইতে বিজয়ের ক্ষেত কয়েকটা জমি পরেই। ঐ মাঠের মাঝে ঘনশ্যামের চালাটা দেখা যাইতেছে। বিজয়ের জমির পাশে

একটা ডোবা, ডোবার চারিদিকে কয়েকটা বাবলাগাছ। একটা গাছের ডালে অনেকক্ষণ অবধি একটা মাছরাঙা পাখী ডোবার জলে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে। বিজয়ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সে একবার আকাশের দিকে, একবার মাছরাঙা পাখীটার দিকে তাকাইতেছিল। তাকাইয়া তাকাইয়া সে কি ভাবিতেছিল তা সেই জানে।

একবার মা আসিলে হয়। জলপান নিয়া মার আসার কথা। বুড়ী আসিলেই সে কাজ বন্ধ করিবে। কিন্তু এদিকে রৌদ্রের তেজ এমনই বাড়িয়াছে ও শরীর এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, সে যেন নড়িতে পারিতে-ছিলনা, তাই সে গরু দুটাকে লাঙল হইতে মুক্তি দিয়া, ডোবার জলে হাত-পা ধুইতে গেল। গরুগুলাও সঙ্গে সঙ্গে গেল। ডোবার একপাশ দিয়া গরু দুইটা জলের ধারে নামিয়া গেল এবং চোঁ-চোঁ করিয়া জলপান করিতে লাগিল।

বিজয় ডোবা হইতে উঠিয়া আসিয়া কোমর হইতে গামছা খুলিয়া নিয়া হাত-পা মুছিল। তারপর একটা বাবলাগাছের নীচে রাখা তামাকের সরঞ্জামের কাছে আসিয়া চকমকি ঠুকিয়া ব্যাওনা জ্বালিল। ব্যাওনা জ্বালাইয়া তামাক ধরাইল। পরিশ্রান্ত দেহ তামাকের ধোঁয়ায় যেন খানিকটা সজীব হইয়া উঠিল।

বিজয় তামাক ধরাইয়াছে দেখিয়া শশী কাজ বন্ধ করিয়া হাত-পা ধুইয়া আসিয়া তার কাছে বসিল। বলা বাহুল্য শশীর সাম্‌নে বিজয় তামাক খায় এবং শশীও বিজয়ের সহিত একসঙ্গে উহা খায়। ঘনশ্যাম জানে বিজয় তার সাম্‌নে তামাক খায়না, তাই সে খাইতেও আসে না।

খড়ের ব্যাওনাটা তখনও জ্বলিতেছিল। তার আগুন ধুঁয়াইয়া ধুঁয়াইয়া সরীসৃপের মত ক্ষেতের প্রায় হাত খানেক উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। শশী কোনকথা খুঁজিয়া না পাইয়া সেদিকে বিজয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিল, ধোঁয়াটা কেমন সাপের মত হিলিবিলি ক'রে যাচ্ছে ছাখ?

বিজয় হুঁকা টানা বন্ধ করিয়া বলিয়া উঠিল, ঠিক মানুষের জীবনের মত।

সত্যিই, শশী তারিফ করিয়া কহিল, মানুষের জীবন তো কখনো ঠিক সোজাপথে চলে না!

হুঁ হুঁ, বিজয় হাসিয়া উঠিয়া হুঁকাটা শশীর দিকে আগাইয়া ধরিল। শশী হুঁকাটা হাতে নিয়া প্রাণপণে টান দিতে লাগিল। বিজয় দূরে গ্রামের দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইল তার মা আসিতেছে মাঠের আলে আলে। বুড়ীর কোমরে একটা চ্যাঙারী, কাঁধে ফেলা মুড়ির পুঁটুলী, হাতে একটা ঘটি। বিজয় আপন মনেই বলিয়া উঠিল, এতক্ষণে বেটি আসছে।

শশী প্রশ্ন করিল, কে?

—মা।

—তোর মা এখনও বেশ শক্ত আছে কিন্তু।

—না এবার কাহিল হ'য়ে পড়েছে। দ্যাখনা আস্‌ছে যেন নুয়ে নুয়ে।

শশী তাকাইয়া দেখিল বাস্তবিকই তাই। তার কি মনে হইল সে বলিয়া উঠিল, আর বুড়ীটাকে কষ্ট দিস্ কেন বাপু—বউটাকে আস্‌তে বল্‌তে পারিস্ তো!

—তাহলেই হয়েছে।

—কেন?

—আরে খুড়ো গিন্নীবান্নি ছাড়া ঝি-বউদের বাইরে বেরুলে রক্ষে আছে?

—তার মানে?

—মানে আর কি যে সব মেয়েগুলো বাইরে বেরোয় তাদের কোনটার সুনাম আছে বল্‌দিকি?

শশী কথাটা ভাবিয়া দেখিল। বিজয় মন্দ বলে নাই। একে একে গ্রামের কয়েকটি যুবতী মেয়ে ও বউয়ের কথা তার মনে পড়িল। পঞ্চুর বউ, বিষ্ণুর বোন্, হরিপদর ভাই-ঝি—ইহারা যেন কি! কাজে-অকাজে ইহারা বাড়ীর বাহিরে আসে এবং আসিয়া যে-সকল কীর্ত্তি করে তা শুনিলেও যেন

কেমন বোধ হয়। শশী কহিল, বলিচিস্ তুই ঠিকই বিজয় কিন্তু অমন ধারা হ'তে দিবি কেন তুই বউকে ?

'অমনধারা হ'তে দিবি কেন তুই বউকে' কথাটার উত্তরে বিজয় শশীকে এমন একটা কথা বলিতে পারিত—যা' শুনিলে শশী আর কোন উত্তর দিতে পারিত না। সে বলিত শশীর ছেলে দীনুর কথা—দীনু গ্রামের একটি বউয়ের সম্পর্কে কি একটা মামলায় তিন বছর জেল খাটিয়া আসিয়াছে কিন্তু সে কথা এখানে তোলা শোভন নয় ভাবিয়া চুপ করিয়া গেল—তা নইলে সে বলিত, খুড়ো তুমি কি দীনুকে অমনতরো হ'তে দিয়েছিলে ? এবং একথা বলিলে শশী নিশ্চয়ই উত্তর দিতে পারিত না। এক্ষেত্রে সে শুধু বলিল, পঞ্চু কি তার বউকে, বিষ্ণু কি তার বোনকে, হরিপদ কি তার ভাই-ঝিকে অমনধারা হ'তে দিয়েছে খুড়ো ? এ দেশের হাওয়া—অমনধারা হ'য়ে যায়। যেতে বাধ্য !

শশী কি যেন ভাবিয়া নিয়া তারপর বলিয়া উঠিল, কেন এমন হয় বল্‌দিকি ?

কেন এমন হয় ? সে সম্বন্ধে বিজয়ের অবশ্যই একটা ধারণা আছে। এ ধারণা তার বই পড়িয়া বা বক্তৃতা শুনিয়া হয় নাই, হইয়াছে বাল্যকাল হইতে ঘটনার পর ঘটনা দেখিয়া। সে দেখিয়াছে মেয়েদের মনের মত স্বামী হয়না, যাকে স্বামীরূপে পাইতে চায় অনেকসময়ে তকে স্বামীরূপে পায়না ; কখনো সে দেখিয়াছে স্বামী-ঘর করিতে গিয়া মেয়েরা শুধু মারধরই খাইয়াছে, কখনো শুধু পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই, কখনো কখনো অভাবের তাড়নায় তারা বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই সব কারণে মেয়েরা বিপথে পা দেয় এবং এপথে পা দিবার প্রলোভন বড় কম নয়। পঞ্চুর বউ সম্পর্কে সে জানে, সে বউটা কখনও স্বামীসুখ পায় নাই—স্বামী তার দুশ্চরিত্র, লম্পট, পরস্ত্রীর উপর তার অত্যন্ত মোহ। বিষ্ণুর বোন সম্পর্কে আর কেহ না বলুক সে বলিতে পারে—মেয়েটা শুধু মারধরের ভয়ে শ্বশুরবাড়ী যায় না, পিত্রালয়ে থাকিয়া কাজকর্ম্ম করে এবং তারই ফাঁকে নিজ যৌবনের অগ্নিশিখায় নিজে তো পুড়িয়া মরেই, অপরকেও পুড়াইয়া মারে। হরিপদর ভাই-ঝি বিধবা—

শুধু দুটি ভাত কাপড়ের অভাবে মেয়েটা দিন দিন সমাজের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। অবশ্য একথা সবাই জানে কিন্তু কেহই সে সম্বন্ধে ভাবে না। মেয়েদের বিপথে পা দিতে দেখিলে গ্রামের অনেকেই যেন খুশি হয়। শশী সে ধরণের লোক নয় তাই সে অম্‌নিতরো প্রশ্ন করিয়াছিল। বিজয় উত্তরে কহিল, কারণ তো রয়েছে খুড়ো!

হুঁ, শশী হুঁকায় টান দিতে লাগিল।

মা কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া বিজয় উঠিয়া পড়িল। ইচ্ছাটা এই যে খানিকটা আগাইয়া গিয়া মায়ের হাত হইতে জিনিষপত্রগুলি নামাইয়া নেয়।

বুড়ী গরুর জাব, বিজয়ের গুড়মুড়ি ও খাবার জল আনিয়াছিল। বিজয় গরুগুলোকে খাইতে দিয়া তারপর নিজে খাইতে আরম্ভ করিল।

বুড়ী অনেকটা পথ হাঁটিয়া আসিয়াছিল। তাই একটা বাবলাগাছের গোড়ায় সামান্য একটু ছায়া দেখিয়া সেখানে বিশ্রাম করিবার চেষ্টা করিল। আঁচল ঘুরাইয়া বাতাস খাইবার উদ্দেশ্যে বুড়ী আঁচল টানিল কিন্তু আঁচলটা টানিতে গিয়াই পড়্ পড়্ করিয়া খানিকটা ছিঁড়িয়া গেল। বুড়ী বলিয়া উঠিল, এই যা!

বিজয় মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'ল গো?

কাপড়টা ছিঁড়ে গেল বাবা, বুড়ী কহিল, এখন কাপড় ছিঁড়লে বড্ড গায়ে লাগে!

কি গায়ে লাগে গো বৌদি, প্রশ্ন করিল শশী। সে ইতিমধ্যে তামাক খাওয়া শেষ করিয়া গিয়া মাঠে নামিয়াছিল। বুড়ী তার উদ্দেশ্যে বলিয়া উঠিল, এইমাত্তর দেখে এলুম চরণদাস একখানা কালাপাড় শাড়ী কিনে নে-এল· সাড়ে তিন টাকা দিয়ে। কাপড়ের দর যে আগুন! এখন কাপড় ছেঁড়া তো নয়—মনিষ্যির একখানা পাঁজর ভাঙা!

শশী বুঝিল বুড়ী কাপড়ের কথা বলিতেছে। গরুগুলোকে তাড়াইতে

তাড়াইতে সে কহিল, তাইতো! কদ্দিন যে এমন যুদ্ধ চলবে আর কদ্দিন যে মানুষকে এমন করে কষ্টভোগ করতে হবে!

যা হয় একটা হ'য়ে গেলে বাঁচি বাপু, বুড়ী কহিল, এযে মনিষ্যিকে দগ্ধে দগ্ধে মারা! এই ত্যাখো দিকিন্ কাপড়খানা ছিঁড়ল—এখন কিন্‌ব কেমন ক'রে?

দাঁড়াও এখন হয়েছে কি, বিজয় বলিল, এই সবে কলির সন্ধ্যে—মোটে তেরশো পঞ্চাশ সালের ভাদ্দর। কাপড়ের তো পরের কথা। অন্নকষ্ট কেমন লেগেছে শুনতে পাচ্ছো—

শশী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, শুনতে পাচ্ছো মানে—দেখতে পাওয়া যাচ্ছেনি!

হ্যাঁ কথা তাই, বিজয় বলিল, আমি সেই কথাই বলছি।

শশী বলিতে লাগিল, সেদিন চাঁপাডাঙায় পাঠিয়েছিলুম দীনুকে একটা কাজে। দীনু ফিরে এসে বল্‌লে, বাবা কি আকালই পড়েছে চারদিকে। কোথাও একদানা চাল নেই। লাইন দিয়ে দিয়ে লোকে সেই ভোর থেকে দাঁড়িয়ে আছে দোকানের সামনে, যদি একমুঠো চাল পায়।

আরে অতদূর যেতে হবে কেন, বিজয় কহিল, আমাদের গাঁয়েই কি আকাল হয়নি। গিয়ে ত্যাখো চন্দোরের দোকানে—একদানা চাল নেই। যারা দিনমজুরী ক'রে খায় তারা তো চালই পাচ্ছে না খাবার। কি যে হবে শেষ পর্য্যন্ত!

সেই কথাই তো ভাবি, বুড়ী বলিয়া উঠিল, ওবছরের সামান্য কটা ধান ছিল তাই কোন রকমে চালিয়ে এনু, এবার যে কি করব। তাও না হয় হ'ল—একদানা চাল নেই সে কথাও মুখপোড়ারা আবার লিকে নিয়ে গেল!

হ্যাঁ ঐ হয়েছে আর এক ব্যাপার, শশী বিরক্তভরে বলিয়া উঠিল।

বিজয় কহিল, তা লিখে নিয়ে আর খারাপটা কি হয়েছে। আমাদের তো নেই, যাদের মরাই মরাই আছে তাদের ধান তো লেখাই দরকার।

লোকে খেতে পাবে না আর তারা ধান ভর্ত্তি মরাই রেখে দেবে, চড়ায় বাজারে দাঁও মারবার। সেটা কি

না খেতে পেলে কি তারা লোককে দেবে, মা প্রশ্ন করিয়া বসিল।

আহা-আ দেয়াদিয়ির কথা হবে পরে, বিজয় বলিল, এখন হিসেবটা তো রইল।

—তা বটে।

কিছুদিন পূর্ব্বে সরকারী চেষ্টায় গ্রাম্য কমিটি গঠিত হয় এবং সেই সব কমিটি হইতে মজুত-বিরোধী অভিযান করা হয়। সেই অভিযান কিসের জন্ত এবং কেন তা লোককে না বুঝাইয়া হঠাৎই করা হইয়াছিল বলিয়া লোকের মধ্যে বিভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে। যে ব্যাপারটা বোঝে সে অপরকে বুঝাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে তো লোকের অভাব মিটে না—তাই লোকে ব্যাপারটাকে তলাইয়া দেখিবারও চেষ্টা করে না।

বুড়ী এবার কথান্তরে গেল। শশীর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করিল, হ্যাগা ঠাকুরপো কিছু শুন্‌চো টুন্‌চো?

কিসের, শশী পাল্টা প্রশ্ন করিল।

—এই যুদ্ধুর। থাম্‌বে টাম্‌বে বল্‌তে পারো?

—থাম্‌বে কি গো। হিটলার গোটা ছুনিয়াটা না নিয়ে থাম্‌বে না। সে বলেছে—কে কত মায়ের ছুধ খেয়েচে দেখা যাবে।

—আচ্ছা হিট্‌লার কি জাত। আমাদের বাঙালী না মোচরমান?

—শুন্‌তে পাইতো জার্‌মান।

—জার্‌মানরা কি জাত জানো না?

—লোকের মুখে যা শুনি তাতে তো মনে হয় হিট্‌লার আমাদের হিঁদুই হবে।

বুড়ী হাসিয়া বলিল, তা নইলে এত তেজ!

বিজয় উঁহাদের কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিয়া উঠিল। সে খবরাখবর রাখে। বিরক্তভরে বলিল, আচ্ছা মা তুমি বাড়ী যাও দিকি—

—আরে বাপু তোর খাওয়া হোক্ আগে!

খাওয়া আমার হ'য়ে গেছে, বলিয়া বিজয় ঘটী হইতে গলায় জল ঢালিতে লাগিল। তারপর কহিল, নাও—এসব নিয়ে যাও—

কেহ নির্ব্বোধের মত কথা বলিলে বিজয় বড় চটিয়া যায়। বুড়ীর সেকথা জানা আছে। তাই সে মনে করিল, সম্ভবতঃ সে বেফাঁস কিছু বলিয়াছে। হইবেও বা এবং সেইজন্য বিজয় বিরক্ত হইয়াছে—বুড়ী আর বিলম্ব না করিয়া চ্যাঙারী, ঘটি প্রভৃতি নিয়া উঠিয়া পড়িল।

বিজয় আবার মাঠে নামিল।

আকাশ ক্রমশঃ নির্ম্মম হইয়া উঠিল।

ভাদ্র-মধ্যাহ্নের মাঠ। দূরে তাকানো যায় না। তাকাইলে রৌদ্রকিরণের উজ্জ্বলতায় সৃষ্ট এক অদ্ভুত দ্যুতি সাগরের মত মাঠের উপর যেন নাচিতে থাকে। দূরের যে-কোন বস্তুই সেই নৃত্যরত সাগরের বুক বাহিয়া বিদ্যুতের মত চোখের তারায় আসিয়া ঘা দেয়। মানুষ চম্‌কাইয়া উঠে।

প্রাণপণে সকলে মাঠে লাঙল চালাইতেছে। ঘনশ্যাম ও শশীর কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। তারা লাঙল গরু নিয়া বিজয়ের কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের শ্রীপতি, পঞ্চু ও বলাই আসিয়াছে। তারা চাঁদা তুলিতে বাহির হইয়াছিল।

গ্রামে আবার কলেরার প্রকোপ বাড়িয়াছে। ভোরেই দশবারোটা নূতন আক্রমণ হইয়াছে। চরণদাসের বউয়ের অবস্থা ভাল নয়, বিষ্ণু যায় যায়, বিষ্ণুর বোন মাধবীও আক্রান্ত। এ অবস্থায় যা হয় একটা কিছু করা দরকার। আশু ডাক্তার সকালে আসিয়া সব বাড়ীকটায় একবার ঘুরিয়া গিয়াছে। আশু পাশ করা ডাক্তার না হইলেও এই ভয়ঙ্কর রোগের চিকিৎসা ভালই জানে। সহরে

সে কিছুদিন এক পাশকরা ডাক্তারের কম্পাউণ্ডারী করিয়াছিল এবং ইহাই তার ডাক্তারী শিক্ষা। সেলাইন করিতে সে রীতিমত ওস্তাদ। টাকার খাঁকতি তার নাই। তাই লোকে চিকিৎসা পাইয়া বাঁচিতেছে।

সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বিজয় কেমন অধীর হইয়া পড়িল এবং বলিয়া উঠিল, এর তো একটা প্রিতিকার করতে হয়।

প্রিতিকার আর কি, পঞ্চু কহিল চাঁদাটা এখন তুলে ফেলতে পারলেই হোল।

—আরে শুধু কি তা'তেই হবে ?

—নিশ্চয়ই হবে। তুমি এসব না মানতে পারো—আমরা এসব মানি।

—আচ্ছা লোকতো! মানা-না-মানার কথা কি আমি বলছি নাকি ?

—তবে ?

যাক্ ও তবেটবে, বিজয় কহিল, কি করতে চাও সেইকথাটাই বলো ?

ক'রব আবার কি, পঞ্চু কহিল, ক'রব অষ্টম প্রহরের ব্যবস্থা। এছাড়া আমাদের বাঁচবার আর দ্বিতীয় পথ নেই।

বিজয় পঞ্চুর কথাটা সম্পূর্ণরূপে মানিয়া নিতে পারে নাই এবং সেইজন্যই সে অষ্টম-প্রহরের ব্যাপার ছাড়াও আরো কিছু একটা ব্যাপারের কথা বলিতে চাহিতেছিল কিন্তু ইহারা সেদিক দিয়া যাইতেই চাহে না দেখিয়া সে চুপ করিয়া গেল। তাছাড়া সোজাসুজি সে অষ্টম-প্রহর সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করিতেও সাহস করিল না। জন্ম হইতেই ইহারা বিশ্বাস করে এইসব ব্যাপারকে এবং এই বিশ্বাসের উপরেই পল্লীগ্রামের সমাজ-ব্যবস্থা। বিজ্ঞান হয়ত এর মধ্যে আছে, মনস্তত্ত্বের বিজ্ঞান। সমস্ত পল্লীগ্রাম যখন মরণের মুখে তখন পল্লীগ্রামের মানুষের চিন্তাধারাকে যদি ভিন্নপথে প্রবাহিত করিয়া দেওয়া যায় তা হইলে দেখা যায় ম্যাজিকের মত মড়ক থামিয়া গিয়াছে। ইহারা জীবনে বহুবার এই ম্যাজিক দেখিয়াছে। কেহ দেখিয়াছে অষ্টম-প্রহরের মধ্যে, কেহ দেখিয়াছে কালীপুজার মধ্যে। তাই পঞ্চু যখন কহিল, এ ছাড়া আমাদের বাঁচিবার আর

পথ নাই তখন সমবিশ্বাসী হওয়ায় বিজয়ের পক্ষে সে কথা মানিয়া নেওয়াই ভাল।

ঘনশ্যাম বিজয়কে কহিল, নে এবার গরুগুলোকে নিয়ে চ—বেলা প'ড়ে যাবার দাখিল হয়েছে।

হ্যাঁ, বিজয় কহিল।

অতঃপর সকলে গ্রামের দিকে চালতে লাগল। মাঠের পথ শেষ করিয়া খালের বেঁশো পুলের কাছে আসিতেই তাদের সঙ্গে আশু ডাক্তারের দেখা। আশু ডাক্তার হইলে কি হইবে, পাঁড় মাতাল। আজ উপর্য্যুপরি কয়েকটা কলেরা কেস্ দেখিয়া সে মোটামুটিই পাইয়াছে। কিন্তু পাইলে কি হইবে, সে তা চোলাইয়ের পিছনেই ব্যয় করিয়াছে। আশু সেই তিরিশ বছর বয়স হইতে আজ প্রায় বিশবছর ধরিয়া মদ খাইতেছে। দোকানের মদে আর সে আনন্দ পায় না, কারণ তা'তে' নাকি এ্যালকোহলের মাত্রা বড় কম থাকে। চোলাইয়ে প্রায় শতকরা ষাটভাগ এ্যালকোহল পাওয়া যায়, তাই সে ঢক্ ঢক্ করিয়া পাঁইটের পর পাঁইট উড়াইয়া দেয়। নেশা জমিলে আশু বলে, 'এই না হ'লে মদ—গলার নলি দিয়ে নাববে তো একেবারে পুড়িয়ে দিয়ে যাবে না! মানুষের ভেতরটাকে এম্নি ক'রে পুড়িয়ে দেয়া দরকার!' কেন সে একথা বলে তা সে-ই জানে। শুনিলে মনে হয় লোকটার ভিতরে কোন আঘাতের বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। লোকটার বয়স হইয়াছে। মাথার চুল অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্যই বোধ হয় পাতলা হইয়া গিয়াছে। নাকটা ঈষৎ বাঁকিয়াছে। চোখদুটা সবসময়েই রক্তবর্ণ। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা। দীর্ঘ পাঞ্জাবীর উপর বুকখোলা কোট গায়ে, পায়ে আলবার্ট-স্যুর উপর হাফমোজা, হাতে রূপাবাঁধানো লাঠি। লোকটা নেশা করে বটে কিন্তু সম্বিৎ হারায় না কখনো। শ্রীপতিকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, ওহে শ্রীপতি খুড়ো! বাবা, তোমার বিষ্ণু গোলকধামে পালালো!

বল কি ডাক্তার, শ্রীপতি যেন আকাশ হইতে পড়িল। আহা-আ গতরাত্তিরেও যে সে কুসুমের ওখানে নাম-সংকেত্তন ক'রতে গেছ্যালো!

আশু লাঠি ঠুকিয়া কহিল, আরে বাবা এই হ'চ্ছে মানুষের জীবন! কাল যে ছিল আজ সে নেই। এখন যে আছে আর একটু পরে সে থাকবে না।

সত্যি ডাক্তারবাবু, বিজয় গদগদভাবে বলিয়া উঠিল।

শ্রীপতি কহিল, ওতো গেল—ওর বোন্‌টা কেমন আছে ডাক্তার?

বুঝলে না—সে হ'ল মেয়েমানুষ, বলিয়া আশু রীতিমত ক্ষিপ্রপদে লাঠি ঠুকিতে ঠুকিতে চলিয়া গেল। পরাণ, বিষ্ণুর ভাইপো ডাক্তারের ব্যাগ নিয়ে আসিতেছিল—সে তাকে অনুসরণ করিল। ঘনশ্যাম এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল। সে বলিয়া উঠিল, দ্যাখো ঠাকুরমশাই আজকেই সন্ধ্যেয় হরিসভায় ষোল আনাকে ডাক দাও—

শ্রীপতি কহিল, কিন্তু ষোল আনা কি আসবে?

আসবে না কেন, ঘনশ্যাম কহিল, গাঁয়ে এমন মড়ক আর এর বিলি করতে হ'লে সকলে আসবে না?

শ্রীপতি কহিল, আমার তো তাই মনে হয়।

ঘনশ্যাম কি যেন ভাবিয়া নিয়া কহিল, বেশ তোমরা ডাকতে যেও না—আমি সবাইকে ডাকব'খন!

—বেশ তুমিই ডেকো তাহ'লে।

—হ্যাঁ সেই ভালো!

আরও খানিকটা আসিতেই খালের ধারে এক জায়গায় দেখা গেল বিষ্ণুর শবদেহ দাহ করিবার জন্য আনা হইয়াছে। তারই একদিকে দেখা গেল নদীর ঢালু পাড়ে কয়েকটা দরিদ্র বালক শবদাহকারীদের পরিত্যক্ত কাপড়-গুলার লোভে বসিয়া আছে। যুদ্ধের বাজার, কাপড়গুলায় তাদের কাজ দেখিবে।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শবদাহ দেখিবার কারও অবসর নাই। তাই যে যার চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ঘনশ্যাম কহিল, আমি কিন্তু সবাইকে খবর দোব।

শ্রীপতি কহিল, বেশ তো!

তারপর যে-যার সব বাড়ীর উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল। দূর হইতে বিষ্ণুর দাহকারীদের কণ্ঠস্বর শোনা যাইতে লাগিল, বলহরি—হরিবোল!

"বলহরি—হরিবোল"ই এখানকার চিরন্তন ধ্বনি। এ অঞ্চলের নিষ্ঠুর জীবনলীলা শুধু ইহারই সাক্ষ্য দিয়া যায়।

পশ্চিমপাড়া গ্রামখানি অদ্ভুত গ্রাম। এই গ্রামেরই পূর্ব্ব সীমান্ত দিয়া বহিয়া গিয়াছে বিখ্যাত দামোদর নদ। দামোদরের কাহিনী জানে না ভারতবর্ষে এমন লোক নাই বলিলেই হয়। বর্ষার সময় দামোদর ফুলিয়া ফাঁপিয়া আপনার সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া লোকালয়, জনপদ, গ্রাম-গ্রামান্তর, শস্যক্ষেত্রের বুকের উপর দিয়া বহিয়া যায়। দামোদর এবং তার অন্যতম নিষ্কাশনী মুণ্ডেশ্বরী, দারকেশ্বর, রূপনারায়ণ রত্নাকর এবং বেগুয়া প্রভৃতি নদীগুলি সমবেতভাবে এই অঞ্চলকে প্রতি বর্ষায় এমনভাবে বেড় দিয়া ঘিরিয়া ধরে, যে গোটা একটা মহকুমা প্লাবনের ভবাবহ বিস্তৃতিতে পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে বাধ্য হয়।

শুধু ইহাই দামোদরের পরিচয় নয়। দু-দুটি জেলায় এই দামোদর মরণের কলরোল তুলিয়া দিয়াছে। বর্দ্ধমান জেলা, বিভাগের শ্রেষ্ঠ জেলা—তার সর্ব্বনাশ করিয়াছে এই দামোদর। যে-জেলা একদা, দূরাগত নরনারীদের স্বাস্থ্য-সম্পদলাভের মণিময় খনি ছিল, সেই জেলায় আজ বিখ্যাত 'বর্দ্ধমান জর' বাসা বাঁধিয়াছে। এবং সেই 'বর্দ্ধমান জর' যে কি নিদারুণ, তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে।

বর্দ্ধমানের পরেই দক্ষিণে হুগলী জেলা। পশ্চিমপাড়ার দিকটা দক্ষিণ হুগলীর সীমানায় পড়ে। উত্তর-সীমানায় এই দুর্দ্ধর্ষ দামোদরের গতিবেগ

হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে একদা কতকগুলি নিষ্কাশনীর ব্যবস্থা ছিল—আজ সেগুলি দামোদরের সর্ব্বনাশা জলরাশিকে বহন করিতে পারে না এবং পারে না বলিয়াই শুধু উত্তরাঞ্চলেই যে সেগুলি ধ্বংসের তাণ্ডব সুরু করে তা নয়—দক্ষিণাঞ্চলেও বন্যার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এ অঞ্চলের খড়িয়া, বাঁকা, কুন্তী, ঘিয়া প্রভৃতি নদীগুলির ধার দিয়া যদি একবার কেহ ঘুরিয়া আসে তা হইলেই বুঝা যাইবে, হুগলী জেলার উত্তরাঞ্চলের এই অংশটীর কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে।

উত্তরাঞ্চলের মজিয়া যাওয়া নিষ্কাশনীগুলির দরুণ ম্যালেরিয়া এবং দক্ষিণাঞ্চলের অতিরিক্ত জলবাহী নিষ্কাশনীগুলির অক্ষমতা সমগ্র হুগলী জেলার যে সর্ব্বনাশ করিয়াছে, এক একটা বিরাট মহাযুদ্ধও পৃথিবীর কোন জেলার ঐরূপ ক্ষতি করিতে পারে না। মোগল বাদশাহদের আমল হইতে বৃটিশযুগের উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই জেলা শিক্ষায়, সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে সমগ্র ভারতবর্ষের সম্মুখে আলোক-বর্ত্তিকা ধরিয়াছে। যুগ-প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন, রামকৃষ্ণ, ভারতচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিম, ভূদেব, হেমচন্দ্র, গোপাল উড়ে, নিধুবাবু, ভোলা ময়রা, এ্যাণ্টুনি ফিরিঙ্গী, অক্ষয় সরকার লালবিহারী দে, রবীন্দ্রনাথ, স্যার আশুতোষ, শরৎচন্দ্র, শ্রী-অরবিন্দ—সকলেরই লীলানিকেতন এই জেলা।

কিন্তু আজ এই জেলা সমগ্র বাংলার একান্ত পশ্চাদ্বর্ত্তী। শ্রীঅরবিন্দ ও শরৎচন্দ্রই এ জেলার শেষ প্রাতঃস্মরণীয় মানুষ। তারপর এ-জেলায় আর জনসাধারণকে আলো ধরিতে পারে, এমন মানুষ জন্মগ্রহণ করে নাই। তা ছাড়া এই জেলায় মানুষেরও সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। শুধু কমিয়া যাওয়াই নয়, এমনভাবে কমিয়াছে যে শুনিলেও বিস্ময় বোধ করিতে হয়। যেখানে বিশ লক্ষ মানুষের বাস ছিল সেখানে এখন হুগলী জেলার লোক সংখ্যা এগারো লক্ষের মত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দামোদরের নিকাশনী পথগুলিই ইহার প্রধানতম কারণ। বাস্তবিকই তাই।

এখানকার এই দামোদরের পিছনে একটা ইতিহাস আছে।

ছোট নাগপুরের পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে দামোদরের উৎপত্তি। পার্ব্বত্য-নদীর ভয়ঙ্করতা আর তার উচ্ছৃলতা যে কোন নদীর অপেক্ষাই বেশী। তার উপর ঐ ছোট নাগপুরের পর্ব্বতময় প্রদেশ হইতে আরও একটী নদী—বরাকর—দামোদরের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে। আসানসোলের প্রায় ছয় ক্রোশ উত্তরে বরাকর রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট এই নদ-নদীর মিলনস্থল। সেজন্য দামোদরের রূপ এখানে এক অদ্ভুত। তুটি পার্ব্বত্য জলস্রোত একত্র ছুটিয়া চলা যে কি ভয়ঙ্কর তা সহজেই অনুমেয়। বর্ষার সময় এর উন্মত্ত জলস্রোতের গতি কল্পনা করা যায় না। প্রতি সেকেণ্ডে পঞ্চাশহাজার বর্গফুট পরিমিত জল উদ্দাম গতিতে দামোদরের বুক বাহিয়া ছুটিয়া যায়।

এই দামোদরকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়—উত্তরাঞ্চল, বরাকর-অঞ্চল, মধ্যাঞ্চল এবং নিম্নাঞ্চল। দামোদরের এই নিম্নাঞ্চলকে নিয়াই আমাদের গল্প।

হাজার বর্গ মাইল জুড়িয়া এই নিম্নাঞ্চলের বিস্তৃতি। একদা নিম্নাঞ্চলে দামোদরের গতি ছিল বর্ত্তমানের দামোদর হইতে ভিন্নরূপ। স্মরণাতীত কাল হইতে এই অঞ্চলে সাধারণ এক বাঁধ আছে। সাধারণ বন্যা হইলে তার গতি-বেগ এই বাঁধে আটকায় কিন্তু ভারী বন্যার সময় বাঁধ ভাঙিয়া জলস্রোত লোকালয়ে, জনপদে ছড়াইয়া পড়ে। সেজন্য এতদঞ্চলে দামোদরের গতিপথ প্রায়ই পরিবর্ত্তিত হয়।

দামোদরের গতিপথ এইভাবে প্রায়ই পরিবর্ত্তিত হওয়ার দরুণ এ-অঞ্চলে পাহাড়ী জলের স্নিগ্ধতা এবং পলিমাটির প্রাচুর্য্য দেখা যাইত আর তারই ফলে এখানকার জমিতে ক্রমবর্দ্ধমান উর্ব্বরতা পরিলক্ষিত হইত।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ভয়াবহ প্লাবনে দামোদর কালনা দিয়া হুগলীর পথে কলিকাতার পশ্চিমদিকে গিয়া পড়ে—বর্ত্তমানে পড়িয়াছে রূপনারায়ণ দিয়া

কোলাঘাটের নিকটে। এই সময় সেলিমাবাদ দিয়া যে জলস্রোতটি হুগলীর মধ্যে আসিয়া পড়ে তাকে কাণা-দামোদর বলা হয়। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এই কাণা-দামোদরে বাঁধ বাঁধিয়া এতদঞ্চলে সর্ব্বনাশের গোড়া পত্তন করা হয়।

দামোদরের নিষ্কাশনী পথগুলির সংস্কার না করিয়া, কাণা-নদীর বাঁধ বাঁধিয়া এবং ইডেন ক্যানাল সৃষ্টি করিয়া দামোদরকে ভয়ঙ্কর করিয়া তুলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ১৮৫০ সালে সৃষ্ট ই-আই রেলওয়ের বাঁধ, গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের বাঁধও দামোদরকে ক্ষতবিক্ষত করিবার পথে সহায়তা করিল। এই সমস্ত বাঁধগুলি: কাণা দামোদরের বাঁধ, ইডেন ক্যানাল, রেলওয়ে বাঁধ, গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোডের বাঁধ এবং পূর্ব্বেকার সাধারণ বাঁধ—সমস্তগুলি একযোগে মিলিয়া দামোদরের চারি পাশে 'শয়তানের শৃঙ্খল' রচনা করিল এবং তারই ফলে বিদ্রোহী 'দামোদরের' মূর্ত্তি অনুরূপ হইয়া গেল।

এই 'শয়তানের শৃঙ্খল'-এর দরুণ হুগলী জেলার উত্তরাঞ্চল ম্যালেরিয়ায় পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে এবং শুধুমাত্র এই ম্যালেরিয়ার ভয়েই বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারসমূহ জেলা ছাড়িয়া চলিয়া যায়। দক্ষিণাঞ্চলেরও সেই অবস্থা। বর্ষার সময় এই অঞ্চল প্লাবিত হইয়া যায় কিন্তু যে হেতু দামোদরের গভীরতা নাই সেইহেতু দামোদরে সারা বছর জল থাকে না এবং জল না থাকার দরুণ বর্ষাকাল ব্যতীত আর সমস্ত সময়ে এখানে তীব্র জলকষ্ট দেখা দেয়। চাষের জল থাকে না, পানীয় জল থাকে না—খালখন্দাদি দিয়া চাঁপাডাঙ্গা, তারকেশ্বর প্রভৃতি গঞ্জস্থানীয় জায়গাগুলিতে যাওয়া যায় না, নানারকম অভাব-অভিযোগ দেখা দেয়, হাহাকার তীব্র হইয়া উঠে।

পশ্চিমপাড়ার ভিতর দিয়া যে খালটী গিয়াছে সেই খালের সহিত দামোদরের যোগাযোগ আছে। মাতৃগর্ভস্থ শিশুর জীবনধারা যেমন জননীর জীবনধারার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, ঠিক তেমনিই পশ্চিমপাড়ার খালটীর ভাগ্যধারা দমোদরের সহিত বিজড়িত। বর্ষায় এই খালটী ফুলিয়া

ফাঁপিয়া উঠে—অন্যান্য সময় দামোদরের মতই মরিয়া পড়িয়া থাকে। চারিপাশে শুধু ধু ধু করে বালুকারাশি।

মানুষের সৃষ্টি করা এই প্রাকৃতিক অসঙ্গতিই এ-অঞ্চলের সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের কারণ। ইহা ছাড়া অর্থনৈতিক অসঙ্গতি তো আছেই। এবং ঠিক এই জন্যই এখানে মৃত্যুরও বিরাম নাই—হরিবোল ধ্বনিরও শেষ নাই।

৬

বাড়ী ফিরিয়া স্নানাহার সারিতে বিজয়ের অপরাহ্ণ পার হইয়া গেল।

আহারাদি সারিয়া সবে মাত্র সে হুঁকা নিয়া বসিয়াছিল—এমন সময় বাহির হইতে কে যেন ডাকদিল। 'কে,' বলিয়া হাঁকিয়া বিজয় বাহিরে গিয়া দেখিল স্বয়ং নফর ভট্‌চায্। ব্যাপার কি! কি এক অজানা আশঙ্কায় মনটা তার দুলিয়া উঠিল। বড়মানুষের মো-সাহেবী করে যে সব লোক সে সব লোক সাধারণ মানুষের কাছে আসিলে, সেই মানুষ ভয় না পাইয়া পারে না। কারণ ইহারা কখনো বিনা স্বার্থে কোন লোকের কাছে আসে না। এবং অভিজ্ঞতালব্ধ বুদ্ধির দ্বারা মানুষ এটুকুও জানে যে ইহারা যে কাজের জন্য তাদের কাছে আসে সে কাজের পিছনে আছে নিশ্চয়ই কোন কুটিল চক্রান্ত। নফর ও-পাড়ার মোড়ল এবং যোগেশবাবুর মন্ত্রীবিশেষ।

বিজয়কে দেখিয়াই ভট্‌চায্ মাথার শিখা দোলাইয়া একগাল হাসিয়া কহিলেন, কিরে বাপু তোদের সব খবর কি?

বিজয় যুক্তকর আগাইয়া দিয়া ঘাড় নোয়াইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, পেন্নাম হই ভট্‌চায্যি মশাই!

কল্যাণ হোক্, উড়ুনীর ভিতর হইতে দক্ষিণহস্ত বাহিরে উপুড় করিয়া ভট্‌চায কহিলেন। দীর্ঘ রুক্ষ কদাকার চেহারা ভট্‌চাযের কিন্তু অদ্ভুত তাঁর মুখমণ্ডলের প্রকাশভঙ্গী। চোখদুটা এত সজীব ও চঞ্চল যে কাকচক্ষুও তার কাছে হার মানিয়া যায়। চারিদিকে তাঁর দৃষ্টি—পৃথিবীর কোনও ব্যাপার যেন সে দৃষ্টি হইতে ফস্কাইবে না! অভিনেতার মত ক্ষণে ক্ষণে তিনি তাঁর মুখভঙ্গী পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। গোঁফ দাড়ি কামানো, মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে—তার মধ্যে দীর্ঘ শিখাটী তাঁর কুটিল চাণক্যের কথা স্মরণ করাইয়া

দেয়। পরণে ধব্‌ধবে থান—কোঁচার অগ্রভাগটা ঘুরাইয়া পেটের দিকে গোঁজা। গায়ে মের্জাই, তার উপরে উড়ুনী। পায়ে খড়ম।

পুনরায় তিনি কহিলেন, তোদের খবর কিরে বাপু ?

এই একরকম আর কি, বিজয় বিনয়ে নুইয়া পড়িয়া কহিল, তারপর হঠাৎ ইদিকে আগমন যে ?

—আরে বাপু কদিন তোদের এখানে আস্‌ব-আস্‌ব মনে ক'রছি কিন্তু কিছুতেই আর হ'য়ে উঠ্‌ল না—তা আজ একেবারে তেড়েমেড়ে বেরিয়ে পড়লুম !

—তা বেশ ক'রেছেন কিন্তু—

ভট্‌চায্‌ সেইখানে সেই পথের উপর সহসা উপুড় হইয়া বসিয়া বলিয়া উঠিলেন, সেই 'কিন্তুর' কথাটাই তো বলতে এলুম ! তাঁকে পথের উপর ঐভাবে বসিয়া পড়িতে দেখিয়া বিজয় হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল। কহিল, ওখেনে বসবেন না—ওখেনে বসবেন না। আমি টুল এনে দিচ্ছি—

কিচ্ছু আনতে হবে না, ভটচায্‌ কহিলেন, এ বেশ বসিচি !

বিজয় শুনিল না। ছুটিয়া বাড়ির ভিতরে গেল। পরক্ষণেই একটা টুল আনিয়া নফরের দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল, এইটায় বসুন—

ভট্‌চায্‌ অতঃপর কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া টুলের উপর বসিয়া কহিলেন, আদর্শগ্রামের জমিগুলো চষবার কি হবে ?

—কবে থেকে চষা হবে ?

—কাল থেকে।

বিজয় হাসিয়া উঠিল। ভট্‌চায্‌ বলিয়া উঠিলেন, হাস্‌লি যে ?

বিজয় কহিল, কাল থেকে কি ক'রে হয় ভটচাষ্যি মশাই ?

ভট্‌চায গ্রাম্য কৃষাণদের মনস্তত্ত্ব ভালই বোঝেন। এস্থলে অন্য লোক হইলে "কাল থেকে কি ক'রে হয়" কথার উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন করিয়া বসিত 'কেন' কিন্তু ভট্‌চায্‌ সেদিক দিয়াও গেলেন না। বলিয়া উঠিলেন, সে কিরে !

আমি যে তোর কাছে এলুম অনেক আশা ক'রে। যোগেশবাবু তো পশ্চিমী কৃষেণ লাগাতে যাচ্ছিলেন। আমি বললুম—আমাদের গাঁয়ে লোক থাকতে কেন বাইরের লোক লাগাতে যাবেন? তা তিনি বললেন, বেশ গাঁয়ে লোক পান তাদেরই লাগান। তবে কাল থেকেই লোক লাগাতে হবে কিন্তু। আমি বললুম—নিশ্চয়ই। এখন তোরা যদি না লাগিস পয়সাগুলো পশ্চিমী কৃষেণরাই তো মেরে নেবে!

ভট্‌চাযের কথার ফল ফলিল। বিজয় কহিল, আর কেউ লাগবে বলেছে?

হ্যাঁ হ্যাঁ ভট্‌চায্‌ কহিলেন, ঘনশ্যাম শশী এরা তো আগেই যোগেশবাবুকে কথা দিয়ে রেখেছে।

ঘনশ্যাম কথা দিয়া রাখিয়াছে—কই একথা তো ঘনশ্যাম তাকে বলে নাই। বিজয় কহিল, ঘনশ্যাম জ্যাঠার সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে?

—এখনও হয় নি। তোর কাছে কথাটা নিয়েই আমি ওর ওখানে যাব।

বিজয় ভট্‌চাযের কথায় ফাঁক দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিল, তবে চলুন না ঘনশ্যাম জ্যাঠা, শশীখুড়োর সামনে থেকেই কথাটা হয়ে যাক্‌।

ভট্‌চায্‌ দেখিলেন—তিনি ভুল করিয়া বসিয়াছেন। তাই তা শুধরাইয়া নিবার উদ্দেশ্যে কহিলেন, আহা সে হবে'খন। তুই কাল থেকে লাগবি কিনা বলনা?

—সে ঐখেনেই হবে'খন চলুন না।

তর্ক করিয়া লাভ নাই। ভট্‌চায্‌ কহিলেন, কোথায় ওদের পাবো?

—শশীখুড়োর বাড়ীতে দু'জনকেই পাব।

—ঘনশ্যাম কি ওখানেই থাকে?

—থাকে না, ওখানে খায়।

তবে চ বলিয়া ভট্‌চায্‌ উঠিয়া পড়িলেন। বিজয় বাড়ীতে টুলটা রাখিতে

গেল। টুল রাখিতে গিয়া এক বিপদ। ঘরের সুমুখেই বনমালার সহিত দেখা। সে কহিল, চল্‌লে কোথায় ?

বিজয় থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, কেন বলদিকি ?

বলছিলুম কুসুমের ওখানে যাবে নাকি, বলিয়া বনমালা একটা পাক খাইয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

বারে, বলিয়া বিজয় ভটচায্যির উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। বিজয়কে দেখিয়া ভট্‌চায্‌ বলিলেন, চ দিকি একটু পা চালিয়ে—

বিজয় কহিল, চলুন। যাইতে যাইতে তার মনে পড়িয়া গেল বনমালার কথাগুলি। বনমালাটা যেন কি। কে জানে মেয়েমানুষ হয়ত এই রকমই !

খানিক পরে শশীর বাড়ীতে গিয়া দেখে ঘনশ্যাম ষোল আনাকে ডাকিবার জন্য আহারাদি সারিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। শশী যায় নাই, সে বাড়ীতে ছিল। বিজয় বাড়ীর ভিতর গিয়া শশীকে সব কথা খুলিয়া বলিল। শশী কহিল, যদি একান্তই ওরা ধরে—না হয় তুই আর আমি লাগব'খন।

সে কি গো, বিজয় কহিল, লাগতে গেলে আমাদের জমিগুলোর কি হবে ?

শশী গলার স্বর নীচু করিয়া কহিল, রোজ ভোরে খেয়ে দেয়ে আমরা কাজে লাগব। তিনটের সময়ে কাজ ছেড়ে দোব খাওয়া-দাওয়া করতে হবে ব'লে। আর ফিরতি বেলায় অম্‌নি নিজেদের জমিগুলো এক-একবার দেখে নোব !

এ মন্দ যুক্তি নয়, বিজয় উৎসাহ প্রাবল্যে হাসিয়া কহিল, তবে তাই বলিগে' চলো। কিন্তু রোজগণ্ডা আর লাঙল সম্বন্ধে দরদস্তুর একটা ঠিক ক'রে নিতে হবে।

—তা' তো হবেই।

অতঃপর দুইজনে বাহিরে ভট্‌চাযের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। শশী

যুক্তকরে নুইয়া পড়িয়া ভট্‌চাষ্‌কে প্রণাম করিয়া কহিল, পেন্নাম হই বাবাঠাকুর।

কল্যাণ হোক্, ভট্‌চাষ্‌ কহিলেন, ঘনশ্যাম কোথায় ?

শশী কহিল, সে তো আপনাদের ওদিকেই গেছে।

—আমাদের ওখানে !

—হ্যাঁ আজ একটা ডাক করা হয়েছে কিনা।

ভট্‌চাষ সবি জানেন, সবি তিনি শুনিয়াছেন এবং শুনিয়াছেন বলিয়াই তাড়াতাড়ি এ-পাড়ায় খানিকটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে আসিয়াছেন। ইহাদের একদলকে যদি কৃষাণ খাটাইয়া, পৃথক করিয়া রাখিতে পারা যায় তবে আগামী পূর্ণিমার দিনে এ-পাড়ার লোককে রীতিমত ভাবে দেখিয়া লওয়া যাইবে। তবু ভট্‌চাষ্‌ যেন কিছুই জানেন না এমনভাবে কহিলেন, ডাক কিসের ?

শশী কহিল, গাঁ-তো কলেরায় উজোড় হ'য়ে যেতে বসেছে—এখন যদি নামটাম না-দেওয়া হয়, মঙ্গলাচার কিছু না হয়—

ও সেইজন্যে ভট্‌চাষ্‌ কহিলেন, তা'হলে আমাকেও আস্‌তে হবে নাকি ডাকে ?

তা'তো আস্‌তে হবেই ভটচায্যি মশাই, বিজয় কহিল, ব্যাপার তো ষোল-আনারই !

তা'তো বটেই, ভট্‌চাষ কহিলেন, আচ্ছা দেখা যাবে'খন। এখন কথাটা সেরে ফেলা যাক্—

শশী কহিল, হ্যাঁ বাবাঠাকুর।

ভট্‌চাষ্‌ কহিলেন, আবাদের তো সময় হ'য়ে এল—হ'য়ে এল কেন বলি পেরিয়ে গেল ! এখন এ অবস্থায় আর তো আদর্শগ্রামের জমিগুলো ফেলে রাখা যায় না। যোগেশবাবু অবিশ্যি আগেই ব'লে রেখেছিলেন কথাটা—না শশী ?

শশী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা এখন তো তোদের লাগ্‌তে হয়, ভট্‌চাযের দৃষ্টি শশী ও বিজয়ের মুখের উপর দিয়া কেমন যেন এক অর্থব্যঞ্জক ভঙ্গীতে খেলিয়া গেল।

শশী কহিল, বেশ লাগ্‌ব। কিন্তু মজুরীটা সম্বন্ধে একটা পাকাপাকি ক'রে ফেলুন বাবাঠাকুর।

—বেশ যা' মজুরী তোরা নিস্, তাই নিবি।

—আর লাঙল সম্বন্ধে?

—লাঙল এবার কত ক'রে বেচ্‌চিস্?

—দেড়টাকা।

—তাহ'লে লাঙল দেড়টাকা আর জোন্ চোদ্দ আনা কি বল্?

উ হুঁ হুঁ, শশী বলিয়া উঠিল, না না ও পুরো একটাকা দিতে হবে বাবাঠাকুর। এবারে এক টাকার কমে কাজ ক'রছে না কেউ!

—আচ্ছা তাই হবে, ভট্‌চায্ কহিলেন, কিন্তু কে কে লাগ্‌বি তোরা?

আমি আর বিজয় দু'জনে লাগ্‌ব, শশী কহিল। ভট্‌চায্ কহিলেন, আর ঘনশ্যাম?

—আমরা দু-জন তো রইলুম। ঘনশ্যামকে জিগ্যেস্ ক'রব'খন।

—তাহ'লে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে রইলুম তো?

হ্যাঁ-হ্যাঁ, শশী কহিল, কথা যখন দিলুম তখন কি আর নড়চড় ক'রব বাবাঠাকুর?

তা নয়, ভট্‌চায্ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া পা বাড়াইলেন ও কহিলেন, আমি তাহ'লে চলি কি বল্?

আসুন বাবাঠাকুর, শশী ও বিজয় প্রণাম করিল।

দেখিতে দেখিতে পূর্ণিমা আসিয়া পড়িল।

যথারীতি সেদিন দক্ষিণপাড়ায় কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছে। উত্তরপাড়া

এ-পাড়ার অষ্টম প্রহর কীর্ত্তনে যোগদান করে নাই, করিবার কথাও নয়।

ঘনশ্যাম বুড়া যেদিন নিজে ষোল-আনাকে ডাক দিয়াছিল, সেদিন সন্ধ্যায় হরিসভায় ষোল-আনার সকলেই সমবেত হইয়াছিল—এমনকি নফর ভট্চাযও। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি এমন একটা গোলমাল পাকাইয়া তুলিলেন যাতে ওপাড়ার লোকেরা এই ব্যাপারে আদৌ উৎসাহ প্রকাশ করিল না—সকলে অসহযোগ করিল।

গ্রামস্থ ষোল-আনাকে ডাক দিয়াছিল ঘনশ্যাম—তাই ষোল-আনার সকলকে সে-ই প্রথমে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিতেছিল। কিন্তু নফর ভট্চায্ মাঝখান হইতে এক ফ্যাঁকড়া তুলিয়া বসিলেন। শিখা দোলাইয়া, কপাল কুঁচকাইয়া তিনি বলিলেন, এ তো দেখ্‌ছি সব এ-পাড়ারই লোক। এ তো বাপু ষোল-আনার ডাক নয়। কাজে কাজেই গাঁয়ের সবাইকে না ডেকে কি ক'রে ঠিক করা যায় যে অষ্টম প্রহর কীর্ত্তন হবে—না কালীপূজো হবে?

ভট্চায্ যদিও এইরকম একটা গোলমাল পাকাইতেই আসিয়াছিল, তবু লোকে এত তাড়াতাড়ি তার এই ধরণের কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না, তাই সকলেই যেন কেমন একটু বিস্মিত হইয়া পড়িল।

ঘনশ্যাম থাকিতে পারিল না। সে কহিল, বাবাঠাকুর আমি তো বুঝতে পারছি না কি ক'রে তুমি বল্‌ছ এ ষোল-আনার ডাক নয়!

কথার মাঝেই ভট্চায্ বলিয়া উঠিলেন, ও পাড়ার ক'টি লোক এসেছে দেখাও?

বস্তুতঃ ষোল-আনার অধিকাংশ এ-পাড়ার লোক। ওপাড়া হইতে শুধু নফর এবং আর দু-একজন আসিয়াছে। এবং কেন ওপাড়া হইতে সকলে আসে নাই, সেকথাও কারো অজানা নাই। ঘনশ্যাম হাসিয়া কহিল, সবাইকে

বল্‌বার পরেও যদি ওপাড়া থেকে কেউ না আসে তাহ'লে কি বোঝায় বাবাঠকুর ?

যা' বুঝাইবার তা-ই বুঝায়। এ-পাড়ার লোকেরা সকলেই ষোল-আনার বৈঠকে যোগ দেয় অর্থাৎ এ-পাড়ার লোক একতাবদ্ধ হইতে শিখিয়াছে। এ অবস্থায় ওপাড়ার লোক যদি এই ডাকে যোগ দিয়া ইহাদের একতাবদ্ধ হইবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যায়, তা হইলে এপাড়া যেমন হাতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, তেমনি ওপাড়াও যাইবে। পল্লী-স্বায়ত্বশাসনের প্রাণকেন্দ্রে যাঁরা বসিয়া আছেন অর্থাৎ যাঁরা ইউনিয়ন বোর্ডের কর্ণধার, মানুষকে দল বাঁধিতে দেখিলে তাঁদের গাত্রদাহ হয়। সেজন্য যাতে ওপাড়ার কেউ ষোল-আনার ডাকে যোগ না দেয় তার জন্য পূর্ব্বেই একদফা প্রচার হইয়া গিয়াছে এবং সে-প্রচার স্বয়ং ভট্‌চায্‌ই করিয়াছেন। ষোল আনা বুঝিল, ঘনশ্যাম সম্ভবতঃ সেই দিকটাতেই ইঙ্গিত করিল।

কিন্তু ভট্‌চায্‌ তাতে ঘাবড়াইলেন না। তিনি অভিনেতার মত হাসি-হাসি মুখে প্রশ্ন করিলেন, কি বোঝায় বল না ঘনশ্যাম ?

সেকথা থাক, ঘনশ্যাম কহিল, এখন কাজের কথা কওয়াই ভাল !

তা'তো ভালই, ভ্রূভঙ্গী করিয়া ভট্‌চায্‌ কহিলেন, ওপাড়ার লোক যে এল না তার তো কারণ একটা আছে গো ! আমি শুনে এলুম ওপাড়ার লোক সব কালীপূজো ক'রবে।

তা বেশ তো, ঘনশ্যাম কহিল, করুক না। যে-যার বিশ্বাস সে তার তাই নিয়েই থাক্‌ না বা করুক না কিন্তু ষোল-আনাকে মান্‌ব না, ষোল আনার ত্রিসীমানা মাড়াব না, সেই বা কিরকম ? তারা তো আজকের ডাকে যোগ দিতে পারতো !

দ্যাখো তা যদি বল্‌লে বাপু, ভট্‌চায্‌ চোখ পাকাইয়া কঠিন হইয়া বলিয়া উঠিলেন, আমাকে একটি কথা বল্‌তে হয়।

ভট্‌চাযের ভঙ্গী দেখিয়া শ্রীপতি জলিয়া উঠিল এবং বলিয়া ফেলিল, তুমি তো বল্‌বে এবার হিসেবের কথা।

হ্যাঁ, ভট্‌চায্‌ কঠিনভাবেই কহিলেন।

শ্রীপতি কহিল, কিন্তু সে হিসেবটা অষ্টম প্রহরের পরে হরিসভায় যে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেটা কি খেয়াল ছিল না? তখন তো কেউ আপত্তি করে নি?

আপত্তি করার মত মানুষ গাঁয়ে আছে কটা, ভট্‌চায্‌ এবার সকলের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, আমরা কি মানুষ—আমরা সব জানোয়ার। সোজা কথা সাম্‌নে এসে বল্‌তে ভয় পাই। তা নাহ'লে শ্রীপতিঠাকুর ষোল-আনার তবিল তছরুপ ক'রে পার পেয়ে যায়!

শ্রীপতি ক্রোধে জলিয়া উঠিল। কহিল, খবরদার বল্‌ছি তুমি ঐ তছরুপ-টছরুপের কথা বল্‌বে না, বল্‌লে ভাল হবে না ব'লে দিচ্ছি!

ভাল হবে না মানে, বলিতে বলিতে ভট্‌চায্‌ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীপতি কহিল, তুমি নিজে যেমন তেমনি আর সবাইকেও মনে করো। বোর্ডের তবিল ভাঙা তোমার অভ্যেস আছে কিনা!

যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা, ভট্‌চায কহিলেন, আমি তোমার খোতামুখ ভোঁতা ক'রে দোব।

ঘনশ্যাম চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সে বলিয়া উঠিল, বাবাঠাকুর তোমরা হ'লে বর্ণশ্রেষ্ঠ, বামুন—তোমরা এই রকম চেঁচামেচি করলে কি ভাল দেখায়?

ভট্‌চায কহিলেন, ত্যাখো ঘনশ্যাম তোমাকে আমি ভাল লোক বলেই জান্‌তুম কিন্তু তোমরা সকলেই এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছো। আমাকে তোমরা ডেকে এনে অপমান করছ।

সে কি বাবাঠাকুর, বিস্ময়ান্বিতভাবে ঘনশ্যাম বলিয়া উঠিল।

হ্যাঁ হ্যাঁ এই আমি চল্‌ছি—দেখি কি করতে পারি না পারি, বলিতে বলিতে ভট্‌চায ক্রুদ্ধভাবে চলিয়া গেলেন।

ভট্টচায সেদিন শুধু ক্রুদ্ধ হইয়াই চলিয়া যান নাই—পাড়ায় ফিরিয়া ব্যাপারটাকে নানাভাবে রঙ ফলাইয়া প্রচারও করিয়াছিলেন এবং তারই ফলে ওপাড়া একেবারেই অসহযোগ করিয়াছে।

করুক অসহযোগ ওপাড়ার লোক। তাতে দক্ষিণপাড়ার কিছু আসিয়া যায় না। তারা যথারীতি উৎসব সম্পন্ন করিবেই। গ্রামের লোক কলেরায় উজাড় হইয়া যাইতেছে, তারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে না।

হরিসভার সম্মুখস্থ সমস্ত প্রাঙ্গণটায় খুঁটি পুঁতিয়া সামিয়ানা টাঙানো হইয়াছে। খুঁটির গায়ে গায়ে জড়ানো হইয়াছে দেবদারু পাতা—তা ছাড়া রঙিন ঘুড়ির কাগজের শিকলি তৈরী করিয়া একখুঁটি হইতে আর একখুঁটি অবধি টানা দেওয়া হইয়াছে। নীচে সতরঞ্চি বিছাইয়া বহুকালের পুরানো কীটদষ্ট কয়েকখানা জাজিম্ সেফ্‌টিপিন দিয়া আঁটিয়া আঁটিয়া আসর তৈরী করা হইয়াছে। বিশেষভাবে জায়গা হইয়াছে মহিলাদের।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। আরেকটু পরেই কীর্ত্তন হইবে। তাই পাড়ার উৎসাহী ছেলেরা আসরের খুঁটিতে খুঁটিতে পেট্রোম্যাক্স আলোগুলি পাম্প করিয়া জ্বালিয়া দিতেছে।

লোকজন সব এদিক-ওদিকে ছড়াইয়া আছে। উৎসবকে যারা অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে দেখিয়াছিল তাদের কেহ কেহ হরিসভার সামনে পথের ধারে, তোলা উনুনের আঁচে পাঁপর ভাজিতেছে, বাদাম ভাজিতেছে, কেহ কেহ বা বাঁশের বাঁশীতে ফুঁ দিয়া বাঁশী বিক্রয় করিতেছে। দুইচারিটা পানবিড়ির দোকানও বসিয়াছে এদিক-ওদিকে। ইহাছাড়া ধূর্ত্ত ব্যক্তিরা অদূরে ঝোপে-ঝাড়ে কৌশলে তাড়ি বিক্রয়েরও ব্যবস্থা করিয়াছে।

উৎসবের যাবতীয় ঝামেলা কুসুমের বাড়ীতেই হইতেছে। তারই বাড়ীর উঠানে, উপরে সামিয়ানা টাঙাইয়া এবং নীচে খান কাটিয়া সমানে সারাদিন রন্ধনকার্য্য চলিয়াছে, তারই দাওয়ায় সমাগত অতিথিবৃন্দকে ভুরিভোজনে

আপ্যায়িত করা হইয়াছে, গ্রামের ঝি-বউয়েরা তারই ঘরগুলিতে বসিয়া বসিয়া তরী-তরকারী কুটিয়াছে, বাট্‌না বাটিয়াছে, পান সাজিয়াছে। গ্রামে যারা কৃষান খাটে তারা কোন্ দূর এক টিউবওয়েল হইতে ঘড়া আর বাঁকে করিয়া জল আনিয়া কুসুমেরই ঘরে জমা করিয়াছে।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল বলিয়া কুসুমের বাড়ীর উঠানেও গোটাকয়েক পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাই বাড়ীটা আলোয় আলো হইয়া গিয়াছিল।

অনির্ব্বাণ-চিতার মত সারাদিন বানের আগুন জ্বলায় এবং উপরের সামিয়ানায় তার তাপ আটক পড়ায়, সারা বাড়ীটা এক চাপা গরমে ভ্যাপসাইয়া উঠিয়াছিল। কুসুম সারাদিন ছুটাছুটি করিয়া এবং এই গরমে একেবারে হাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। তাই কোথাও বসিয়া যে সে দু-দণ্ড একটু বাতাস খাইবে, তারও জো নাই। একটু বসিবে কি অম্‌নি চারিদিক হইতে তার উদ্দেশ্যে হাঁক উঠিবে।

দাওয়ায় কীর্ত্তনের দল জলযোগ করিতে বসিয়াছিল, শ্রীপতি তাদের তত্ত্বাবধান করিতেছিল। এই ফাঁকে যদি সে একটু বাহিরে ঘুরিয়া আসিতে পারে! তাই সে পা বাড়াইল।

শুধু কি এই উদ্দেশ্যেই সে পা বাড়াইল?

আজ এতবড় একটা উৎসব। এই উৎসবে যাদের আসিবার কথা সকলেই আসিয়াছে—আসে নাই কেবল দুটি লোক। একজন ঘনশ্যাম, আরেকজন বিজয়।

ঘনশ্যাম কেন আসে নাই তা সে জানে না। হয়ত লোকটার একটা না একটা কিছু জরুরী কাজ পড়িয়াছে, তা না হইলে সে না আসিবার লোক নয়। কিন্তু বিজয়? বিজয় তো আসিতে পারিত! কুসুম আজ সমগ্র উৎসবের মধ্যে সারাটা দিন ধরিয়া শুধু ঐ একটিমাত্র লোকের জন্যই আসা-পথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিয়াছে। কতবার ছল করিয়া বাহিরে গিয়াছে, কতবার হরিসভার

সামনে লোকজনের ভিড় ঠেলিয়াও সে পথে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাড়ীর ভিতর হইতে অন্যের কণ্ঠস্বরকে বিজয়ের কণ্ঠস্বর ভাবিয়া সে ছুটিয়া গিয়াছে—কিন্তু হায়, তবু বিজয়কে সে দেখিতে পায় নাই। মুহূর্ত্তের চক্রধারায় সারা দিনমান গড়াইয়া গিয়াছে—প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় কুসুম অধীর হইয়া উঠিয়াছে। তার ধৈর্য্যের বাঁধ আর অটুট থাকার কথা নয়—বুঝিবা ভাঙিয়া যায়। এবং ঠিক এইজন্যই বাহিরে যাইবার উদ্দেশ্যে মনটা তার ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল।

কিন্তু মুক্তি নাই কুসুমের। সমস্ত উৎসবের ভিতর হইতে কুসুমকেই চোখে পড়ে সর্ব্বাগ্রে। পরণে তার লাল পাড় শাড়ী, গলায় একটা চন্দ্রহার, হাতে গাছকতক সোনার চুড়ি—সিঁথিতে সিঁদুর জল্‌ জল্‌ করিতেছে প্রভাত-সূর্য্যের রক্তিম-রূপের মত।

দূর হইতে তাকে দেখিতে পাইয়া শ্রীপতি হাঁকিল, কুসুম—ওকুসুম ?

কুসুম বিরক্তভরে সেদিকে তাকাইল এবং ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সে দাঁড়াইতেই শ্রীপতি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চু ও বলাই তার কাছে আসিয়া পড়িল। শ্রীপতি কহিল, কীর্ত্তনওলারা সেবা ক'রতে ব'সেছেন—ভ্যাখো ওনাদের যত্ন-আত্যি ঠিক হ'চ্ছে কিনা !

পূর্ব্বেই কুসুম বিরক্ত হইয়াছিল। শ্রীপতির কথায় সে বিরক্তি আরও বাড়িয়া গেল। সে কহিল, আমি ছাড়া আর কি কেউ দেখবার নেই ?

পঞ্চু কহিল, আর কে আছে কুসুম আমাদের ?

কুসুম কহিল, কেন তোমার বউ।

আরে ও আবার একটা মানুষ, তাচ্ছিল্যভরে বলিয়া উঠিল।

কঠিন দৃষ্টিতে কুসুম পঞ্চুর দিকে তাকাইল। স্ত্রীলোকের কাছে যে-পুরুষ স্ত্রীর নিন্দা করে, সে পুরুষ আর যাই হোক্‌ ভাল মানুষ নয়—আসলে সে চায় যার কাছে নিন্দা করে তার সহানুভূতি এবং সে সহানুভূতি যদি কোনও অসতর্ক মুহূর্ত্তে কোন স্ত্রীলোক দেখাইয়া বসে, তবে তার উপর জুলুম হইতে এতটুকু

বিলম্ব হয় না। কুসুম ইহাদের চিনে এবং এইজন্য সে পঞ্চুর দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাইল। তা ছাড়া একে তো সে পঞ্চুকে দেখিতে পারে না, তার উপর আজ পঞ্চু যা' পোষাক পরিয়াছে তা অভিনব। সে গ্রামের ছেলে হইলে কি হইবে—দেশী তাঁতের কাপড়ের নীচে অন্তর্ব্বাস পরিয়াছে, পেট্রোম্যাক্সের আলোয় তা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বৃন্দাবনী ছাপা কাপড়ের টুকরার রুমালে আতর মাখাইয়া সিল্কের পাঞ্জাবীর বুক পকেটে খুঁট উচুঁ করিয়া রাখিয়াছে এবং যথেষ্ট আর্টিষ্টিক জ্ঞান না থাকার ফলে ঘাড়-কামানো মাথার উপর নাকের সোজা সিঁথিটার দুইপাশের চুলগুলোকে মেয়েদের মত পাতা কাটার কায়দায় সামনের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। আর কবে বুঝি সাইকেল করিয়া বেলুড় মঠ দেখিতে যাইবার জন্য একজোড়া খাকীরঙের সাইকেল মোজা কিনিয়াছিল, তা-ই আজ পচা-ভাদ্রের ভ্যাপসা গরমে 'পাম্-সু' জুতার ভিতরে পরিয়া আসিয়াছে। তদুপরি এই সন্ধ্যাবেলায় সে আবার একজোড়া গগল্স্ জাতীয় রঙীন্ চশমাও পরিয়াছিল। মোটকথা ঈশ্বরদত্ত চেহারাটাকে যতরকমে পারিয়াছিল সে 'কারিকুরি' করিয়া মানান্ সই করিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তা হইলে কি হইবে রস-জ্ঞানহীন বিধাতা তাকে এমন করিয়াই গড়িয়াছিলেন যে তার যা রুচি সেই রুচি অনুযায়ী নিজেকে পালিশ করিতে গেলে তা করা একরকম প্রায় দুঃসাধ্য, কেননা চেহারাটি তার লম্বাদিকে প্রমাণ সাইজ হইলেও ঘেরে বোধকরি সাধারণ মানুষের চেয়েও অনেকখানি কম। তাকে দেখিলে কুসুম তো কুসুম—মরা মানুষেরও পিত্ত জ্বলিয়া উঠিবে।

কুসুমের কঠিন দৃষ্টির সাম্‌নে পঞ্চু ভড়কাইল না। মনটা তার ক্ষুব্ধ হইল বটে কিন্তু মুখে সে বলিয়া উঠিল, যাও কুসুম—ওঁদের একটু ছ্যাখোগে'—

কুসুম আর কোন কথা না বলিয়া বিরক্তভরে পাক খাইয়া দাওয়ার দিকে চলিয়া গেল।

কুসুম চলিয়া যাইতেই শ্রীপতি পঞ্চুকে কহিল, ছ্যাখ্, পঞ্চু এইমাত্র বলাই খবর নিয়ে এল! বড় সম্বিস্তেয় প'ড়ে গেছিরে!

খবরই বা কিসের, পঞ্চু কহিল, আর সমিস্তেই বা কিসের ?

শ্রীপতি কহিল, ওপাড়ার লোকেরা আসচে—

পঞ্চু চশমাটাকে নাক হইতে নামাইতে নামাইতে প্রশ্ন করিল, তারপর ?

—তারপর আর কি আমাদের প্রিস্তুত থাকতে হবে।

—দাঙ্গা হবে নাকি ?

শ্রীপতি এবার বলাইয়ের দিকে তাকাইল। গোলগাল বেঁটে চেহারা বলাইয়ের, চোখদুটা গোল, গায়ে সকল সময়েই ফতুয়া। সে কহিল, আর হবে—হ'ল ব'লে !

পঞ্চু চিন্তিতভাবে বলিল, তাহ'লে লোক চাই কিছু কি বলেন ?

—হ্যাঁ এক্ষুনি। ওরা লেঠেল-টেঠেল নিয়ে বেরুবার উদ্‌যুগ ক'রছে।

বেশ আমরাও সব বন্দোবস্ত ক'রছি, বলিয়া পঞ্চু নাকে চশমা লাগাইয়া বাহিরে যাইবার জন্য পা বাড়াইল।

ইতিমধ্যে কীর্ত্তনের দল জলযোগ করিয়া উঠিয়া পড়িয়াছিল। শ্রীপতির কথামত কুসুম বাড়ীর যেদিকে হাত-পা ধুইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেইদিকে তাঁদের নিয়া যাইতে লাগিল। সেখানে একখানা জলচৌকি পাতা ছিল। লোকগুলা একে একে সেখানে বসিল এবং কুসুম একে একে জলের ঘকে করিয়া সকলের হাতে জল ঢালিয়া দিল। তারপর আঁচানো হইয়া গেলে তাদের পায়ে জল ঢালিয়া সে নিজের আঁচল দিয়া তাদের প্রত্যেকের পা মুছাইয়া দিল।

অতঃপর কীর্ত্তনের দল কুসুমের দাওয়ায় আসিয়া বসিল। কুসুম-ও তাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিল। তাদের সকলের হাতে পান দিয়া সে সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিন্তু সহসা শ্রীপতি আসিয়া কহিল, এখন ভালয় ভালয় আরম্ভ হ'লে বাঁচি।

শ্রীপতির কথাটা যেন হাঁফছাড়া কথা। এই ধরণের কথায় কোনও গুরুত্ব আছে তা বোঝাও যায় না এবং প্রশ্নও করিতে হয় শ্রোতার পক্ষ

হইতে। প্রশ্নের উত্তর পাইলে অবশ্যই নিশ্চিন্ত হইতে হয় কিন্তু যতক্ষণ না উত্তর পাওয়া যায় ততক্ষণ জিজ্ঞাসা না করিয়াও পারা যায় না। তাই চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত অবস্থাতেও কুসুম প্রশ্ন করিয়া বসিল, কেন ঠাকুরদা!

কেন সে তো জানো বোন, শ্রীপতি বিষণ্ণভাবে কহিল।

শ্রীপতির এই ধরণের কথায় কুসুম এবার সত্য-সত্যই চিন্তিত হইয়া পড়িল এবং এক সঙ্গে অনেকখানি ব্যাপার ভাবিয়া নিয়া বলিয়া উঠিল, ওপাড়ার লোক বাধা দেবে?

—তা ছাড়া আর কি!

—কেন ওরা এরকম ক'রছে বলদিকি?

—স্বধম্মো!

কীর্ত্তনের দল পান চিবাইতে চিবাইতে উহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। দলপতি গোপাল চক্রবর্ত্তী অভিজ্ঞ লোক। সে শ্রীপতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, তা'লে আপনাদের ইদিকেও আছে এ সব!

তা থাকবে বৈকি, শ্রীপতি কহিল, যখন সবাইকেই এক ক্ষুরে মাথা মুড়োতে হয়েছে!

শ্রীপতি কথাটা মন্দ বলে নাই। চোখের সুমুখে গোপালের ভাসিয়া উঠিল নিজ গ্রামখানির কথা। মনে পড়িল তার তারিণী পাল আর গুইরাম দাসের মামলা। গুইরাম গাঁয়ে শিবঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিতে চায় কিন্তু তারিণী সেখানে গাঁজা খাইবার আড্ডা হইবে বলিয়া, স্ত্রীলোকদের সম্মান থাকিবে না বলিয়া—এই মর্ম্মে গ্রামে জটলা পাকাইতে লাগিল, পায়ে পা দিয়া গুইরামের সঙ্গে ফৌজদারী বাধাইল। আসল কথা হইতেছে তারিণী পাল 'পেটিসান বাবুর' দলের লোক। গুইরাম বিগত নির্ব্বাচনে তারিণী এবং 'পেটিসান বাবু'—এই উভয়েরই বিরুদ্ধে ভোটের প্রচার করিয়াছিল, তাই এই ফৌজদারী'। গোপাল ভাবিয়া দেখিল এক ক্ষুরেই মাথামুড়ানো বটে! কিন্তু সে যা-হউক

গোপাল কিন্তু প্রশ্ন করিয়া বসিল অন্য রকম। সে কহিল, গান বন্ধ হবে না তো!

শ্রীপতি কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। এখন যদি সে কোন রকম দোদুল্যমানতার পরিচয় দিয়া বসে তবে কীর্ত্তনের দল হয়ত বিগড়াইয়া যাইবে। অথচ বলিবেই বা কি! কুসুম সুযোগ বুঝিয়া পায়ে পায়ে সরিয়া গেল। গোপাল আবার প্রশ্ন করিল, কি রকম মনে করছেন?

ওপাড়ার লোক—বিশেষ করিয়া নফর ভট্চায যে কতখানি হিংস্র তা সে জানে। গোপালের প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে তাকে এমন কথা বলিতে হয় যে, যার দরুণ গোপালকে আজ কীর্ত্তন বন্ধই রাখিতে হয়। কিন্তু কীর্ত্তনও বন্ধ রাখা যায় না। তাই সে আমতা আমতা করিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ এমন সময় পঞ্চু আসিয়া তাকে বাঁচাইয়া দিল। সে কহিল, ঠাকুরদা সব ঠিকঠাক।

শ্রীপতি মনে মনে খুশি হইয়া কহিল, এঁরা জিগ্যেস্ করছিলেন কীর্ত্তন বন্ধ হবে কি না।

আরে কীর্ত্তন বন্ধ হবে কেন, পঞ্চু কহিল, আমাদের যাত্রার দলের সবাইকে ব'লে দিয়িছি আসরটা ঘিরে দাঁড়াতে।

শ্রীপতি বলিয়া উঠিল, ব্যস্—ব্যস্! তারপর চট করিয়া একবার বাহিরটা দেখিয়া আসিয়া গোপাল চক্রবর্ত্তীর উদ্দেশ্যে কহিল, এবার আরম্ভ করা যেতে পারে চক্কোত্তিমশাই!

—বেশ চলুন।

কুসুম বাড়ী হইতে সরিয়া আসিয়া উঠিয়াছিল মাঠের ধারে একটা কলাবাগানে।

ভাদ্রের পূর্ণিমা। বর্ষা-ধোয়া আকাশের বুক হইতে অজস্র চন্দ্রকিরণ ঝরিয়া ঝরিয়া সারা বিশ্ব-প্রকৃতিকে সেদিন যেন প্লাবিত করিয়া দিয়াছে। পল্লীপ্রকৃতি,

বাঁশবন, পুকুর-ডোবা মাঠ-ঘাট সবই যেন সেদিন জ্যোৎস্নায় জ্যোৎস্নায় মদির। গ্রামের পথ পার হইলে মাঠের পর মাঠ দিকচক্রবালের সীমান্ত-রেখায় বিলীন। সদ্য রোপিত স্নিগ্ধ কচি ফসলের দিগন্তহীন বিস্তৃতি জুড়িয়া শোনা যায় একটানা সঙ্গীতের সুর। দূরে, বহুদূরে, যেদিকেই তাকানো যাক্না কেন—জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্না···তারপর ধোঁয়া, শুধুই ধোঁয়া—প্রথমে কুয়াসার মত, তারপর রহস্যের মত, তারপর চিতার ধোঁয়ার মত, তারপর···তারপর অজানা, অচেনা কল্পনাতীত ধূম্রাবরণ—হয়ত বা কঠিন, হয়ত বা কোমল, নয়ত বা কিছুই নয়।

তবু যেন তারই আকর্ষণ পূর্ণিমারাত্রির পূর্ণচন্দ্রের চেয়েও বেশি। কলা-বাগানের গাছে গাছে পাতায় পাতায় জ্যোৎস্নাকিরণ ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। মনে হয় যেন অবগুণ্ঠিতা বউ-রাণীরা 'চাঁপা-বরণ' শাড়ী পরিয়া প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে প্রণতি জানাইতেছে। কুসুমের মনটা কেমন করিয়া উঠিল।

সৌর-জগতের নিয়মানুসারে পৃথিবীতে অনেক আলোড়ন-বিলোড়ন হইয়া থাকে। এমন কি মানুষের দেহে, মনে, জীবনের চলার পথেও। হয়ত এই পূর্ণচন্দ্রের রাত্রি কুসুমের মনেও একটা আলোড়ন তুলিয়াছিল। তাই বুঝি বা মনটা তার হাহাকার করিয়া উঠিতেছিল।

হঠাৎ কার পদশব্দে কুসুম চম্‌কাইয়া উঠিল। শুধু চম্‌কানোই নয়, ভয়-ও পাইল। লোকটা ছোট ছোট কলা-চারাগুলির পাতা সরাইয়া সরাইয়া তার দিকেই আগাইয়া আসিতেছে। কে জানে লোকটা কে! ভয়ে তার প্রাণ উড়িয়া যাইবার যোগাড় হইল।

পরিপূর্ণ ভয়ে মানুষ মরিয়া হওয়ার অন্ধ সাহস পায়। কুসুম হাঁকিল, কে?

আমি, বলিয়া বিজয় একেবারে তার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। উঃ! কুসুম যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল! কিন্তু তা সত্ত্বেও সে প্রশ্ন করিয়া বসিল, তুমি এখানে কেন?

তোমাকেই খুঁজতে এসেছিলুম, বিজয় কহিল, কিন্তু বাড়ীতে তুমি নেই শুনে আমি এদিক দিয়ে মাঠে মাঠে জ্যাঠার কাছে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ দেখতে পেলুম কলাবাগানের ঘোমটার মধ্যে তোমার চন্দ্রহারের হাসি, তাই এসে পড়লুম এখানে।

কুসুম যেন কি ভাবিয়া প্রশ্ন করিল, ইদিকে এসেচো কেউ দেখেচে?

হ্যাঁ তা দেখেছে বৈকি, বিজয় কহিল, কিন্তু আমি তো সেজন্যে আসি নি।

সে-জন্য মানে কি? যে জন্য সারাদিন, প্রতি মুহূর্ত্ত, প্রতি পল, অনুপল কুসুম বিজয়ের আসা-পথ চাহিয়াছিল, বিজয় সে-জন্য আসে নাই, ইহাও শুনিতে হইল কুসুমকে! বিজয় এমনই। বাল্যকালের সেই খেলাঘর হইতে সে বিজয়কে দেখিয়া আসিতেছে, বিজয় এমনিই! যেকথা শুনিতে কুসুম ভালবাসে, বিজয় তার উল্টা কথাই কুসুমকে শুনাইবে। ইহাই তার অভ্যাস। সবাই জানে নিরুদ্দিষ্ট স্বামী তার ফিরিবে না, তবু, বিজয় বলিবে, না সে ফিরিবেই। সে-জন্য বিজয় আসে নাই, একথা শুনিয়া কুসুম বিরক্ত হইল এবং বিরক্তভাবেই প্রশ্ন করিল, তবে তুমি কি জন্যে এসেচো?

বিজয় কহিল, ওপাড়ার লোকেরা আসছে তোমার ঘর পুড়িয়ে দেবার জন্যে, তাই সেই কথাটাই বলতে এলুম।

—আমার ঘর পোড়ানোর মানে?

—তোমার ঘরেই তো আজকাল গাঁয়ের লোকের আড্ডা!

—মুখ সামলে কথা বলবে?

—আমার ওপর রাগ দেখালে কি হবে কুসুম, কথাটা যে বলে ওরাই!

—কেন বল্‌বে ওরা?

—সেটা তো আমার দোষ নয়। ওরা বলে ওদের সুবিধে হবে বলে।

—আমার ঘরে গাঁয়ের লোকের আড্ডা একথা বলে ওদের কি সুবিধেটা হবে?

বিজয় কহিল, সে কথা তুমিও বুঝবে না আর তোমার বাড়ীতে যারা আড্ডা দেয় তারাও বুঝবে না। আসলে ব্যাপার কি জানো—ও হরিসভা যাই গাঁয়ের ক তোমার বাড়ীতে যাতায়াত করেই। প্রথম প্রথম ও-পাড়ার লোকেরা ভেবেছিল, তোমাকে ঘিরে ওরা সব গোল্লায় যাবে কিন্তু আজকাল ওরা বুঝতে পেরেছে শুধু তুমি শক্ত হওয়ার দরুণ লোকগুলো গোল্লায় না গিয়ে এক হয়ে যাচ্ছে। এটা ওপাড়ার বাবুদের চক্ষুশূল—বিশেষ করে যোগেশবাবুর।

এবার কুসুম বলিতে লাগিল, তা তো আমি জানি না। তবে একথা শুনিচি যে ও-পাড়ার লোকেরা এদিককার কোন ব্যাপারে থাকবে না!

বিজয় হাসিয়া কহিল, মুখে তারা বলবে থাকবে না কিন্তু থাকতে তাদের হবেই। অবিশ্যি বন্ধুভাবে নয়, শত্রুভাবে।

—তা এরকম ক'রেই বা লাভ কি ওদের?

—লাভ ষোল আনা। তোমাদের আড্ডাটাকে ভাঙতে পারলে 'বিরোধী' ব'লে ওদের আর কেউ থাকবে না আর তা না থাকলেই সুবিধে—বছরের পর বছর বোর্ডের কর্ত্তা হ'য়ে থাকবেন ওঁরা।

—আর তার জন্যেই আমার ঘর পুড়িয়ে দেয়া হবে?

—সেই রকমই তো শুনছি!

কুসুম চিন্তিত হইয়া বলিল, তা তুমি এখন যাবে কোথায়?

—কেন বলদিকি?

—এর তো একটা বিহিত ক'রতে হয়।

—ঠাকুরমশাই পারবে না?

—পারলেও সব কিছু কি আর সামলাতে পারবে?

—তাহ'লে তো ঘনশ্যাম জ্যাঠাকেই ডাকতে হয়।

হ্যাঁ, কুসুম কহিল। বিজয় কহিল, কিন্তু জ্যাঠা কোথায় গেল তো—তোমাদের ওখানে তো দেখতে পেলুম না!

—কি জানি বুড়ো কোথায় গেছে। সারাদিন তো আসেনি এদিকে।

—সারাদিন! তা'লে গেল কোথায়?

—কদিন আমরা যোগেশবাবুর ওখানে কাজ ক'রছি তাই জ্যাঠার সঙ্গে দেখাও হয় নি।

—ও! তা' যাবে একবার জ্যাঠার ওখানে?

—তুমি যাবে?

—যদি যাই—

—আপত্তি নেই। তা ছাড়া আমার মনে হয় তুমি গিয়ে একবার জ্যাঠাকে সব খুলে বলো। আর যাই হোক ও-লোকটা এসে দাঁড়ালে কেউ কিছু করতে সাহস করবে না।

—তা ঠিকই।

তা হলে চলো দিকি, বলিয়া বিজয় চলিতে সুরু করিয়া দিল। কুসুম তাকে অনুসরণ করিল।

ওদিকে কীর্ত্তনের আসরে তখন আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। খোল-খত্তাল যন্ত্রপাতিও পড়িয়া গিয়াছে। লোকজন সব বসিতে সুরু করিয়া দিয়াছে।

মেয়েদের বসিবার জায়গায় চিক নাই—তার পরিবর্ত্তে নারিকেল পাতা বাঁখারির সঙ্গে সঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইতিমধ্যেই সেগুলা ছোট ছেলেমেয়েদের দৌরাত্ম্যে ও পুরুষ-ঘেঁষা মেয়েদের অনুসন্ধিৎসা মিটাইতে ধ্বংস-প্রাপ্তির অবস্থায় পৌঁছাইয়াছে। তাই কীর্ত্তন আরম্ভ হওয়ার আগে সেগুলা আরেকবার ঠিক করিয়া দেওয়া হইতেছে।

কিছুক্ষণ পরে গোপাল দলবল-সহ আসরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ধীরে ধীরে তারপর খোল-খত্তালে হাত পড়িল। মূল গায়েন গোপাল নিজে। মুখে চন্দনের ফোঁটা, গলায় পুষ্পহার, মাথায় কৃষ্ণচূড়া, হাতে বুঝি মোহন-বেণু।

গান সুরু হইল। লোকে শান্তভাবে শুনিতে লাগিল।

গানের ফাঁকে গোপাল ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে লাগিল, তরীখানি ফুটা একজনের বেশি যাত্রী নেয়া যায় না। অথচ উনি আছেন সখিগণের সঙ্গে। তাই আমাদের মাঝি ঠাকুরটি বলছেন—

[সুর করিয়া]……'আমার তরীতে যাবে না
একজনা বই যাবে না
আমি কারে লব পারে আগে…'

গোপালের গাওয়া হইয়া গেলে তার দলবল শুধু শেষটুকু বলিয়া উঠিল, 'আমি কারে লব পারে আগে।' গোপাল পুনরায় ব্যাখ্যা করিতে লাগিল, সখিগণ বললেন—'আমরা এক সঙ্গেই যেতে চাই মাঝি।' মাঝি বললেন—'তা হয় না বাছা তা হয় না। পারে যাবার যদি তোমাদের ইচ্ছা থাকে তা হ'লে বল কাকে আগে পার করব।' যাত্রীনীরা বললেন—'সেকথা তুমিই বল না মাঝি।' মাঝি ঠাকুর তখন বললেন—

[সুর করিয়া]
'যে ঐ সুন্দরী নারী
উহারে লইতে পারি
সবার প্রথম ভাগে …'

সুস্পষ্ট উচ্চারণে এবং কীর্ত্তনের মধুর সুরে সমবেত নরনারী 'অতি ছল অতি খল অতীব কুটিল' সেই চতুরালী মুরলীধারীর ছলনার কথা স্মরণ করিয়া ভাবে গদগদ হইয়া 'আহা-আ' শব্দে অন্তরের উচ্ছাসটুকু প্রকাশ করিল। গোপাল অভিনেতা—সে বুঝিল গান জমিয়া উঠিয়াছে। গানের কলি ছাড়িয়া দিয়াই সে এই কলিটা সবটুকু গাহিবার জন্য দলবলকে ইঙ্গিত করিল। দলবল তদনুযায়ী শবটাই পুনরাবৃত্তি করিল। গোপাল সেই অবসরে চট্ করিয়া কয়েকটা লাইন ফাঁক দিয়া, কিছু উপরি উপায়ের উদ্দেশ্যে একেবারে নূতন কলি ধরিবার ফন্দী আঁটিয়া ফেলিল। সে বলিতে লাগিল, সখিগণ বললেন— 'বেশ তাই হবে।' মাঝি ঠাকুর তাতে বললেন—'তা হ'লে ভাড়াটা দিয়ে

যাও বাছা।' সখিগণ বিস্মিত হ'লেন ঠাকুরের কথায়। তাঁরা বললেন—
'ভাড়া আবার কি গো।' মাঝি ঠাকুর তখন বললেন—

[সুর করিয়া] '…পারে যাবার কড়ি যে চাই
বিনা ভাড়ায় আমি না যাই
পারের কড়ি লাগে গো লাগে।'

পদগুলি গাহিয়াই গোপাল দলের অপেক্ষাকৃত কমবয়স্ক ছেলেটীর দিকে ইঙ্গিত করিল। সে ইঙ্গিত ছেলেটী বোঝে। তাড়াতাড়ি তাই একখানি থালা নিয়া সে আসরের চারিদিকে এবং নারিকেল পাতার আড়ালে মেয়েদের মধ্যে 'পারে যাবার কড়ি' সংগ্রহ করিতে গেল। পারের কড়ি সংগ্রহও হইতে লাগিল বেশ। টুকটাক্ পয়সাটা, আনিটা মন্দ পড়িল না। যতক্ষণ ছেলেটী ঘুরিয়া ঘুরিয়া কড়ি সংগ্রহ করিতে লাগিল ততক্ষণ উপরোক্ত লাইন কটাই গোপাল বার বার গাহিতে লাগিল। লোকে মুগ্ধ হইয়া শুনিল।

কিন্তু শ্রীপতি কেমন যেন একটু চঞ্চল হইয়া পড়িল। ইতিপূর্ব্বে সে একখানি টুল পাতিয়া কুসুমের ঠিক দরজায় বসিয়া ছিল। ওপাড়ার লোকেরা এখনও আসিল না। মারামারি তারা করিবেই কিন্তু গান জমিয়া উঠিলে যদি তারা আসিয়া পড়ে এবং অতর্কিত আক্রমণ করিয়া বসে তা হইলে এ-পাড়ার লোকেরা হারিয়া যাইতে বাধ্য হইবে। এখনও যখন তারা আসিল না তখন হয় তো তাদের সেই রকমই কোন মতলব আছে। শ্রীপতি উঠিয়া পড়িয়া কয়েকবার এদিক-ওদিক পায়চারী করিল। তারপর বাড়ীর ভিতর গিয়া কুসুমকে খুঁজিল। কিন্তু কুসুম কোথায়?

কুসুম—কুসুম, বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে শ্রীপতি সারা বাড়ীটা তোলপাড় করিয়া ফেলিল। বাহিরে গিয়া খানিকটা খুঁজিয়াও আসিল কিন্তু কুসুম কোথাও নাই!

বিজয় ও কুসুম ঘনশ্যামের মাঠের কুঁড়েতে আসিয়া দেখিল, ঘনশ্যাম

নাই। মাচার উপর আগড় বন্ধ। বিজয় কহিল, তা'লে কি ক'রবে কুসুম ?

কুসুম কহিল, ফিরে যাব।

—তাই যাও। কিন্তু কোন পথ দিয়ে যাবে ?

—মাঠে মাঠেই যাব।

—একলা ভয় করবে না ?

—তুমি একটু দাঁড়িয়ে আসবে না হয়।

—কিন্তু বেশি দূর আমি যেতে পারব না !

—বেশি দূর তোমায় যেতেও হবে না ! খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসবে শুধু।

আসল কথা কুসুমের ভয় নয়। ভয় পাইলেও মানুষ পথ চলিতে কুণ্ঠিত হয় না কোন দিন। কিন্তু তবে ? আকাশে এমন জ্যোৎস্না, পাশে বিজয়, বিজয়ের সঙ্গ—এ সবকে জয় করিবে সে কি করিয়া ? কুসুম গ্রামের সাধারণ মেয়ে—মন প্রাণ যা' চায় তাকে সে ঠেকাইবে কি দিয়া ? তাই তো তার অমন বেদনামাখা কথা 'বেশি দূর তোমায় যেতেও হবে না—খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসবে শুধু।' এই 'খানিকটা' তার কাছে শুধু 'খানিকটাই' নয় 'অনেকটাও' বটে।

বিজয় কহিল, তবে চল—আমায় আবার যেতে হবে একবার ডিহিবাৎপুরে।

—ডিহিবাৎপুরে কেন ?

—আরে বল কেন। 'চাল' 'চাল' ক'রে চারদিকে কি অবস্থা হয়েছে জানো ত। মাকে বৌকে আমি কদিনই ব'লে আস্‌ছি, হ্যাগা আমাদের চাল-টাল কিছু আছে তো ? পাছে আমি ভাবি সেজন্যে ওরা বরাবরই ব'লে আস্‌ছে দেখা যাবে'খন। আজ খোঁজ নিয়ে জানলুম একেবারে ঢন্‌ঢনে অবস্থা। এখন করি কি বলতো! যে দিনকাল আস্‌ছে আর কি খেতে

পাওয়া যাবে? তাই যাব একবার রাখহরির দোকানে যদি বস্তাখানেক অন্ততঃ চাল দেয়।

—তাহ'লে আর তোমাকে বারণ করি কি ক'রে!

—না। বারণ ক'রলেও আমাকে যেতে হবে।

—তা তো বটেই।

মাথার উপর পূর্ণিমার চাঁদ। মাঠের পথে আলোর বন্যা। চলিয়াছে তারা দুটী প্রাণী। কুসুমের মনে কত কথা। সব কথা গুছাইয়া সে বলিতেও পারেনা। তবু সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা ও-পাড়ার লোকেরা যদি সত্যিই আমাদের বাড়ী চড়াও করে তা'লে তুমি আসবে ত?

কুসুমের এ প্রশ্ন বাহুল্য। সম্ভাবিত বিপদের সম্ভাবনা দেখাইয়া মনের মানুষকে কখনও আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে নাই। তা'তে তার ভালবাসার গভীরতা কখনও বুঝা যায় না। কেননা, কারও বিপদের সম্ভাবনায় নিতান্ত সম্পর্কহীন মানুষও মানুষের প্রাথমিক কর্ত্তব্য বোধে তার পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে পারে এবং তাকে ভালবাসা বলিলে ভুলই বলা হইবে। সে জন্য মনের মানুষ সত্যই তার মনের মানুষ কিনা তা বুঝা যায় শুধু দায়িত্ব-পালনের সময়েই। বিজয়, দায়িত্ব-পালনের সময় কি করিবে তা তার বিবেক-বুদ্ধি এবং হৃদয়ের অনুভূতির কাছেই ছাড়িয়া দেওয়া ভাল।

কুসুমের প্রশ্ন শুনিয়া বিজয় কি যেন ভাবিল। তার মনে পড়িয়া গেল —বনমালার মুখ। একটু আগে সে যখন ওপাড়ার লোকের মনোভাব সম্বন্ধে বাড়ীতে গল্প করিতেছিল, তখন বনমালা তাকে বলিয়াছিল, "যাও এবার কুসুমকে তা'লে বাঁচাওগে' ওদের হাত থেকে।" বিজয় বলিয়াছিল, "যদি সত্যিই ওরা এরকম করে তা'লে আমাকে তো তাই ক'রতে হবে।"

বনমালা ফুঁসিয়া উঠিয়া বলিয়াছিল, "কেন বলদিকি কুসুমের জন্যে তোমার এত দরদ? সে তোমার কে?" বিজয় যে কুসুমের কে, তা সেও জানে না। বনমালা আরও বলিয়াছিল, তাকে বাঁচাতে গিয়ে যদি একটা অঘটন ঘটে যায়

তোমার ওপর দিয়ে তা'লে কি হবে বলতো? একজনকে বাঁচাতে গিয়ে আরেকজনকে তুমি মারবে কেন—কিসের জন্যে?

সত্যই তো! এই দোটানার পথে তার কর্ত্তব্য কি তা সে এখনও জানে না। কুসুমের জন্যই যদি তাকে কিছু করিতে হয় তবে বনমালাকে সে অস্বীকার করিবে কি করিয়া? আর বনমালার জন্যই যদি তাকে ভাবিতে হয় তবে কুসুমের জন্য তার ভাবিবার পথ কোথায়?

তাই বিজয় উত্তর দিল, সে পরের কথা পরে হবে'খন। এখন আমি চলি।

—চলবে?

—হ্যাঁ।

—তা'লে দরকার হ'লে এসো।

—দেখা যাবে'খন।

বিজয় চলিয়া গেল। কুসুম শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিল।

হঠাৎ কীর্ত্তনের সুর কানে আসিয়া লাগিতেই সে চমকাইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সে নিজেকে সচেতন করিয়া নিল এবং এতক্ষণ যে এদিকে এইভাবে সময় নষ্ট করিতেছিল তার জন্য মনে মনে সে লজ্জিত হইল। ওদিকে গান আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, লোকে এতক্ষণ তাকে খোঁজাখুঁজি করিতেছে আর সে কিনা—ছিঃ, ছিঃ এদিকে বিজয়ের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল! তার সম্বন্ধে লোকে ভাবিবেই বা কি! দ্রুতপদে সে চলিতে লাগিল। মাঠের বুকে অফুরন্ত আলো। সে আলোয় পথ চলিতে আদৌ কষ্ট হয় না।

বিজয় আসিয়া উঠিল ডিহিবাৎপুর হাটতলায়। রাখহরির দোকানে ভিড়ে ভিড়। হাটের সর্ব্বাপেক্ষা বড় মুদীখানা দোকান তার। যাদের চাল কিনিয়া খাইতে হয়, পুরুষানুক্রমে রাখহরিরা বংশপরম্পরায় তাদের চাল যোগাইয়া আসিতেছে। ভুঁড়িওয়ালা গোলগাল চেহারা লোকটার—গলায় হরিনামের মালা। বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি, মাথায় খোঁচা খোঁচা চুল। ভ্রূ-দুইটা জোড়া—চোখ দুইটা ঈষৎ ক্ষুদ্র। সব সময়ে নাভির নীচে আটহাতী কাপড় পরিয়া থাকে। কোমরে লোহার সিন্দুকের চাবীটাও প্রায় সবসময়েই ঝুলে। দোকানের স্তিমিত আলোকে দূর হইতেই লোকটাকে দেখা যায়। ক্যাস বাক্সের উপর খাতা রাখিয়া কি যেন লিখিতেছে।

দোকানটার চারিদিকে করগেটের দেয়াল—উপরে করগেটের ছাউনি। ভিতরটা বেশ প্রশস্ত। কিছুদিন আগেও চাউলের বস্তায় দোকানের প্রশস্ততা অনুভব করা যাইত না—প্রায় উপরকার ছাউনি অবধি বস্তা সাজানো থাকিত। ইদানীং তা আর নাই, তাই দোকান ঘরটার প্রশস্ত রূপটুকু চোখে পড়ে খুব বেশি।

অনেকগুলি লোক সেখানে বসিয়া আছে। সকলেই চাউল চায়। বিজয় গিয়া দাঁড়াইতেই রাখহরি হাসিয়া উঠিয়া বলিল, কিরে বিজয়—তোরও চালের দরকার?

বিজয় রাখহরির খুবই পরিচিত লোক। রাখহরির জমি অনেকবার বিজয় জমা নিয়াছে। সেইসূত্রে সে বিজয়কে জানে। একপাশে বসিয়াছিলেন নফর ভট্‌চায। কার সহিত বুঝি কথা বলিতেছিলেন। বিজয়ের কথা হইতেছে শুনিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, আর কোনমুখে ও বলে যে চালের দরকার নেই—

অতো দুঃখেও সবাই হাসিয়া উঠিল। বিজয় কহিল, ঘর সংসার ক'রতে গেলে সবারই দরকার। একটা পেট হ'লে ভাবতুম না।

সকলেই বিজয়ের কথাটা তারিফ করিল। বাস্তবিক একটা পেট হইলে কেহই ভাবিতনা। রাধহরি কহিল, তোদের গাঁয়ের দোকানে চাল নেই?

চন্দোরের কথা বল্‌ছেন, বিজয় কহিল, তার বারোটা বেজে গেছে।

হ্যাঁ, বারোটাই বাজিয়া গিয়াছে। শুধু চন্দরেরই নয়—সকলেরই। এই হাটতলার চেহারা দেখিলেই আজকাল কান্না পায়। আগে যেখানে দিন-রাত হাটতলায় গরুর গাড়ীর ভিড় দেখা যাইত, কৃষক ও গাড়োয়ানদের হাঁকাহাঁকি, ছুটোছুটিতে সারা হাটতলাটা মুখরিত হইয়া উঠিত, সেখানে আজ একখানিও গরুর গাড়ী দেখিতে পাওয়া যায় না, কৃষক ও গাড়োয়ানদের হাঁকাহাঁকি, চীৎকার প্রভৃতিও শোনা যায় না। আগে যেখানে নন্দীদের সাধু-খাঁদের, পালেদের আর কুণ্ডুদের, দাঁ আর সাহাদের আড়তের সামনে বসিয়া বাঁশের তেকাটায় বড় বড় কাঁটা-পাল্লায় দিনরাত ওজন হইত ধান, পাট, ছোলা, সরিষা প্রভৃতি, যেখানে আড়তের সামনে বসিয়া আড়তের কর্ম্মচারীরা হাঁকিত "রামে রাম" হইতে বিশ-পঁচিশ বস্তা ওজনের সংখ্যা আর সরকারেরা একটার পর একটা কড়ি ডানদিক হইতে বাঁ দিকে, বাঁ দিক হইতে ডান দিকে রাখিয়া হিসাব মিলাইত ওজন করা বস্তার—যেখানে গরুর গাড়ী আর ছালাবাহী গরুর ভিড় জমিত অসম্ভব রকমের—সেখানে আজ প্রচণ্ড নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। হাটতলারই যদি এই অবস্থা হয় তা হইলে অন্য জায়গাকার অবস্থা কি তা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু কেন এমন হইল?

কেন এমন হইল, সে কথার উত্তর দিবে কে? রাধহরি কহিল, বিজয় বারোটা শুধু চন্দোরেরই বাজে নি, দেশের সবারই বেজেছে। কিন্তু কেন জানো?

কেন—সেই কথাটাই সকলের মনে ঘুলাইয়া উঠিতেছে। সকলেই রাখহরির মুখের দিকে তাকাইল। রাখহরি বলিতে লাগিল, গত বছর স্বদিশি হাঙ্গামার কথা মনে আছে?

সকলেই ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হ্যাঁ আছে।

সেই আগষ্ট-হাঙ্গামার কথা। দেশের দিকে দিকে আমলাতান্ত্রিক অভিযান। দেশের প্রিয় নেতাদের আমলাতন্ত্র তার বিষাক্ত দ্রংষ্ট্রারেখা বিস্তার করিয়া অতর্কিতে ছোবল মারিল। দেশ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। উন্মত্ত বারিধি-কল্লোলের ক্রুদ্ধ গর্জ্জন যেমন হয়, ঠিক তেমনিভাবে সারাদেশ ক্রুদ্ধ-আক্রোশে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। দীর্ঘ দুই শতাব্দীর পরাধীনতার অচলায়তন প্রাচীর-গাত্রে দেশবাসী নির্ব্বিচারে আঘাত করিতে ছুটিল। গাঁয়ে গাঁয়ে কত গুজব। কত আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব। নেতৃত্বহীন দেশ, তাই দেশের মুক্তিকামদের আকুল-আগ্রহকে কাজের মধ্যে টানিয়া নিয়া যাইবার কেহ নাই—যার যা খুশি তাই করিতে লাগিল।

মনে পড়ে সেই সময়ে পাছে আমলাতন্ত্র দেশের লোকের সমস্ত ধান চাউল কাড়িয়া নিয়া যায় এবং যুদ্ধরত তার সৈন্যদলকে খাওয়ায়, তার জন্য লোকে ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে ক্ষেপিয়া উঠিল।

যে আমলাতান্ত্রিক শাসনের জগদ্দলন পাথরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মানুষ নিষ্পিষ্ট হইয়াছে, সেই আমলাতন্ত্র আপনার সৈন্যদলকে খাওয়াইবে দেশবাসীর ধান-চাউল নিয়া—তা কখনই হইতে দেয়া যায় না! সেজন্য যে পারিল তার ধান বেচিয়া দিল, যে পারিল মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিল। যে পারিল সে আপনার রক্ত জলকরা পরিশ্রমের ধনগুলিকে নির্ব্বিচারে পুড়াইয়া ফেলিল। সকলেরই চোখের সুমুখে ভাসিয়া উঠিল, সেই দুর্য্যোগময় দিনগুলি!

রাখহরি বলিল, মনে পড়ে সেই স্বদিশি হাঙ্গামার কথা?

ভট্‌চায্‌ কহিল, ঐ স্বদিশিরাই তো দেশের এই অবস্থা ক'রেছে।

দেশের নিকৃষ্ট-চরিত্র অথবা অজ্ঞ লোকদের ধারণা যে রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলেই মানুষের দুরবস্থা—সেজন্য সুযোগ পাইলেই তারা এই-ধরণের কথা বলিয়া বসে। ভট্‌চাযের মুখে অম্‌নিতরো কথা শুনিয়া কেহ্ কোন প্রতিবাদ করিল না। স্বদেশীদের নিন্দা বিজয় সহ্য করিতে পারে না। সে বলিয়া উঠিল, স্বদিশিরা কেন দায়ী হবে ভট্‌চাযি্য মশাই?

রাখহরি ভট্‌চাযের কথাটায় চাতুর্য্য নাই দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। তাই বিজয়ের কথাটাকে সে যেন সমর্থন করিয়া কহিল, না ঠিক তা নয়—তবে—যাইহোক্ স্বদিশিরা ছিল ব'লে—আজো···

বটেই তো, বিজয় কহিল।

কিন্তু কথাতো তা নয়, রাখহরি বলিতে লাগিল, সেই হাঙ্গামার পরই এলো ঝড়। সে ঝড়ের কথা মনে হ'লে আজ-ও আমি শিউরে উঠি।

হ্যাঁ, সেই তেরশো উনপঞ্চাশ সালের উনত্রিশে আশ্বিন—সপ্তমী পূজার রাত্রি। সে ঝড়ের কথা ভুলিবার নয়। সারা রাত্রিব্যাপী ঝড়। ঝড় আর বৃষ্টি। আকাশে বিদ্যুতের হিংস্র হাসি। গাছে গাছে, লোকালয় জনপদে, শস্যক্ষেত্র মাঠে মাঠে ঝড়ের দাপাদাপি। প্রায় পাকা ফসল ক্ষেতের—ক্ষেতকে ক্ষেতই নষ্ট হইয়া গেল। লোকের ঘরদোর কত পড়িয়া গেল, কত গরুবাছুর জলে ভাসিয়া গেল, কত ধানের মরাই, কত ঘরের কত আসবাবপত্র, বাক্স, প্যাটরা, খাটবিছানা, তক্তাপোষ জলস্রোতে হারাইল, কত মানুষের জীবন চলিয়া গেল, কে তার হিসাব রাখে। সে সব কথা মনে পড়িতে সকলেই যেন শিহরিয়া উঠিল। বিজয় কহিল, হ্যাঁ ঝড়ের কথা বল্‌তে পারেন বটে—তাতে খুব ক্ষতি হ'য়ে গেছ্‌ল।

শুধু কি তাই, রাখহরি বলিতে লাগিল, সেই ক্ষতির পরেও—সবচেয়ে যা' ক্ষতি হয়েছে তা রেঙ্গুন থেকে চাল না আসায়। বর্ম্মা-মুল্লুক যেদিন জাপানীদের হাতে চলে গেল সেদিন থেকে আর একদানাও চাল বাংলায় আসে না। কাজেই কেন হবেনা চালের জন্যে এই হাহাকার!

কথাটা কে কিভাবে নিল তা ঠিক বোঝা গেল না। কারণ ইতিহাস শুনিতে কেহ রাখহরির কাছে আসে নাই। সকলেই আসিয়াছে চাউল পাইবার আশায়।

ভট্চায্ বলিয়া উঠিল, আরে চাল আমদানী নেই যে মোটে—

এই আসল কথা, রাখহরি বলিয়া উঠিল। বিজয় কহিল, হ্যাঁ আমদানী না থাক্‌লে পাওয়া যাবে কি করে ?

তবু সকলে বসিয়া রহিল, যদি সকলে চলিয়া গেলে রাখহরির কাছে কিছু পাওয়া যায়। বিজয় দেখিল এখানে বসিয়া থাকিলে কিছুই হইবে না। তাই সে উঠিয়া পড়িল। কহিল, বস্তাখানেক ও হবে না বাবু ?

—নারে বাবু।

তবে আজ উঠলুম—পেন্নাম হই, বলিয়া বিজয় রাখহরির দোকান হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

দ্রুতপদে বিজয় চলিতে লাগিল। মাঠের বুকে অফুরন্ত আলো। সে আলোয় পথ চলিতে কষ্ট হয় না। বেশ স্বচ্ছন্দেই সে চলিতে থাকিল। খানিকটা পথ আসিতেই হঠাৎ একটা ভয়াবহ গোলমালের শব্দে বিজয় ভয় পাইয়া গেল। গোলমালটা আসিতেছে হরিসভার দিক হইতে। গোলমাল শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল, ওপাড়ার লোকের কথা, দাঙ্গার কথা, শাক্ত আর বৈষ্ণবের চিরন্তন বিবাদের কথা, যোগেশবাবুর কথা। হয়ত ওপাড়ার লোকেরা আসিয়া পড়িয়া মারামারি বাধাইয়া দিয়াছে এবং তারই বীভৎস ব্যাপার গোলমাল হৈ-চৈ-এর ভিতর দিয়া এখানে এই মাঠের দিকে ভাসিয়া আসিতেছে। বিজয় কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। ঐ গোলমাল হৈ-চৈ, মারামারি প্রভৃতির ভিতর গিয়া সে কিছুই করিতে পারিবে না অথচ না-গেলেও নয় আবার। ওপাড়ার লোকেরা যদি মারামারি করিতে আসিয়া আকৃচা-আকৃচি করিয়া কুসুমের ঘরে আগুন লাগাইয়া দেয় ? যদি কুসুমের উপর

অত্যাচার করে? তাহইলে কি হইবে? এ পাড়ার লোকেরা ত যে-যার প্রাণ নিয়াই ব্যস্ত থাকিবে! কে তাকে রক্ষা করিবে? তাই তাকে কুসুমের ওখানে যাইতেই হইবে—ঐ মারামারি, চেঁচামেচি প্রভৃতির মধ্যে গিয়া তাকেই দাঁড়াইতে হইবে। বিজয় একরকম প্রায় ছুটিতে লাগিল।

গোলমাল তখন ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। লাঠালাঠির শব্দ পাওয়া যাইতেছে, খুনোখুনির জন্য লালায়িত হিংস্র মানুষের হুঙ্কার শোনা যাইতেছে। হরিসভার চারিদিকে উঠিতেছে বীভৎস আর্ত্তনাদ।

বিজয় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া খিড়কী দিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। বাড়ীর ভিতরে তখন চলিয়াছে হুলস্থূল ব্যাপার। কয়েকটা লোক লাঠির ঘায়ে সেই সময়ে পেট্রোম্যাক্স আলোগুলি ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিল! কয়েকটা লোক উঠানের বানকাটা উনুন হইতে জ্বলন্ত কাঠের টুকরা তুলিয়া নিয়া সেগুলা ছুড়িয়া ছুড়িয়া ঘরের চালের উপর ফেলিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে দাউ দাউ করিয়া খড়ের চাল জ্বলিয়া উঠিল। ভয়ার্ত্ত কুসুম বুঝি চীৎকার করিতেছে, ঠাকুরদা'—ঠাকুরদা' ?

ইতিপূর্ব্বেই বাড়ীতে কর্ম্মরত নরনারীগুলি পলাইয়া গিয়াছিল। শ্রীপতিও নাই। কে কুসুমকে সাড়া দিবে? ঘরের চাল বুঝি ছাই হইয়া যায়।

মুহূর্ত্তের মধ্যে লোকগুলা আলো নিভাইয়া, ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়া কোথায় যেন উধাও হইয়া গেল। সারা বাড়ীটায় তখন এক কুসুম ছাড়া আর একটিও প্রাণী নাই। অথচ ঘরের চালে ঐ লেলিহান শিখা! এক কলসী জল ঢালিয়া দিবারও কি কেহ নাই, সবাই প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছে! ছিঃ ছিঃ এরা কি কাপুরুষ!

বিজয় ছুটিয়া গেল ঘরের দিকে। হাঁকিল, কুসুম—কুসুম ?

কার কণ্ঠস্বর? কুসুম ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিয়া প্রজ্জ্বলিত ঘরের চালের খোড়ো আগুনের আলোয় দেখিল—বিজয়!

ছুটিয়া গিয়া সে বিজয়ের দুইখানা হাত ধরিয়া বলিয়া উঠিল, এ সর্ব্বোনাশের হাত থেকে তুমি আমায় বাঁচাও।

এ অস্থির হবার সময় নয় কুসুম, বিজয় দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল, চলো আগুন নেভাবার ব্যবস্থা করি গে'।

—এ আগুন কি করে নেভাবে?

—যেমন ক'রে হোক নেভাতেই হবে। এ তো শুধু তোমার ঘরের আগুন নয় কুসুম! এ আগুন ছড়ানো মানে সমস্ত গ্রামেই আগুন লাগা!

—যাক গ্রাম!

তা বল্‌লে কি হয়, বলিয়া বিজয় বাহিরের দিকে একরকম ক্ষিপ্র-পদেই ছুটিয়া গেল। উদ্দেশ্য—যদি কোন লোকজনকে পায়। লোকজন পাইলে নিশ্চয়ই আগুন নিভানো সহজ হইবে। কিন্তু কোথায় লোকজন! বাড়ীর বাহিরে আসিয়া দেখে চারিদিক অন্ধকার। খুঁটিগুলা ভাঙিয়া সামিয়ানা ছিঁড়িয়া পড়িয়া আছে। কোথায় কেহ নাই। যে লোকগুলা দোকানপাট করিয়াছিল, তারা পর্য্যন্ত পালাইয়াছে। কাজেই কাকেও পাওয়া যাইবে না ভাবিয়া সে আবার ছুটিয়া আসিল বাড়ীর ভিতরে।

দাওয়ায় বসানো ছিল কতকগুলো ঘড়া ও বাল্‌তি। তার কয়েকটাতে জলও ছিল। সেগুলা তুলিয়া নিয়া প্রথমে সে চালের আগুনে ঢালিয়া দিল কিন্তু তা'তে কি আগুন নিভে? সে ছুটিল পুকুরের উদ্দেশ্যে। বাড়ীর পাশেই পুকুর, ছুটিয়া ছুটিয়া বিজয় ঘড়া-বাল্‌তি করিয়া জল আনিতে লাগিল এবং জ্বলন্ত চালে ছুড়িয়া ছুড়িয়া ছিটাইয়া দিতে লাগিল। বিজয়ের দেখাদেখি কুসুমেরও আগ্রহ হইল। আজ এই রাতে যখন তার একদিকে ঘর ভাঙিতেছে তখন আরেকদিকে তার আরেকটা ঘর গড়িয়া উঠুক না কেন! সে বেশ উৎসাহভরেই বিজয়কে কহিল, আমি জল এনে দিই তুমি ঘরের চালে ছিটিয়ে দাও—

বিজয় কহিল, কিন্তু দেরী কোরোনা—

না, বলিয়া কুসুম ঘড়া বালতি নিয়া ছুটিল।

কুসুম জল আনিয়া দেয় আর বিজয় সে জল ঘরের চালে ছিটাইয়া দেয়। আগুন একটু কমিয়া আসিলে বিজয় চালের উপর উঠিয়া পড়িল—তারপর লাঠি দিয়া জলন্ত, খড়ের চাপগুলিকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া নীচে ফেলিয়া দিতে লাগিল। এম্‌নি করিয়া ঘণ্টা দেড়-দুই ধরিয়া কঠিন পরিশ্রম করিবার পর আগুন প্রায় নিভিয়া আসিল। কিন্তু সে এক অমানুষিক পরিশ্রম। জলন্ত ঘরের আগুন নিভানো যে কি কঠিন তা সে যে নিভাইয়াছে সেই বুঝিতে পারে। সারা দেহটা তার জলসিক্ত, মুখমণ্ডল গা-হাত-পা দগ্ধ-খড়ের ভস্মে কালিমাখা। তা ছাড়া তার মনে হইতেছিল যেন সারা শরীরটা তার পুড়িয়া গিয়াছে। সে আর দাঁড়াইতে পারিতেছিল না।

কুসুমেরও সেই অবস্থা। ছুটাছুটি করিয়া সেও জল তুলিয়াছে। একে সারাদিন বাড়ীতে উৎসবের জন্য তাকে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তার উপর আবার এই অগ্নিকাণ্ড! কে কাকে দেখিবে তার ঠিক নাই। তবু সে বিজয়ের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। বলিল, তুমি গা-হাত ধুয়ে ফেল—

—না এবার আমি বাড়ী চলি।

—বাড়ী যাবে!

—হ্যাঁ কাজ তো মিটিয়ে দিয়িচি কুসুম!

বিজয় কাজ মিটাইয়া দিয়াছে! এ তো কাজ মিটানোর দাবী নয়—এ বিজয়ের অভিমান। কিন্তু কেন এই অভিমান? পরক্ষণেই বিজয়ের কথায় কুসুম তা বুঝিতে পারিল। বিজয় কহিল, যারা তোমার আপনার লোক— তারা বিপদের সময় আসে নি। আমি তো এসেছিলুম!

কুসুমের এখানে অনেকেই আসে এবং তারা কেন আসে সে তারাই জানে। বিজয় সেইদিকটাতে ইঙ্গিত করিয়াই এই অভিমান করিয়াছে। জগতে কেহ তার আপনার নাই—এক বিজয় ছাড়া। তাই সে

কহিল, আপনার যে সে ঠিকই এসেছে—তা ছাড়া যারা তারা কেউ আসে নি।

হুঁ, বলিয়া বিজয় আরও যেন কি বলিতে যাইতেছিল। সহসা কারা যেন আসিতেছে বলিয়া বোধ হইল। তাই সে কহিল, কারা আসছে বোধ হয়!

—কারা?

চারিদিকে অন্ধকার। আকাশের জ্যোৎস্নাও যেন ম্লান হইয়া গিয়াছে। তবু তারই অস্পষ্ট আলোকে বেশ বোঝা গেল পঞ্চু ও তার মা আসিতেছে।

পঞ্চুর মা বুড়ী হাঁকিল, কই গো কুসুম কোথায় গেলি?

কুসুম কহিল, কে জ্যাঠাইমা!

হ্যাঁগো, পঞ্চুর মা কহিল, বলি কাণ্ডকারখানা যা' সব হয়ে গেল তা তো আর মুখে আনা যায় না—তাই থির থাকৃতে না পেরে ছুটে এলুম বাছা!

বেশ ক'রেছ জ্যাঠাইমা, কুসুম বুড়ীর কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বিজয় কহিল, তা'লে আমি এবার আসি কুসুম।

পঞ্চু কহিল, বাঃরে আমরা এলুম আর তুই চলে যাবি।

আর দাঁড়াতে পারছি না ভাই, বিজয় কহিল, আগুন নেভানো কি সহজ কথা?

—ও!

কুসুম কহিল, সকালে এসো।

যদি সময় হয়, বলিয়া বিজয় চলিয়া গেল।

বিজয় চলিয়া যাইতেই কুসুমের মনটা কেমন ছাঁৎ করিয়া উঠিল। আসিয়াছে তারা—যাদের সে আদৌ দেখিতে পারে না। তবু মনের সে ভাব চাপিয়া রাখিয়া সে প্রশ্ন করিল, পঞ্চুদা, ঠাকুরদা কোথায়?

ঠাকুরদা কোথায় পঞ্চু তা জানে না। সে প্রথমাবস্থাতেই স্ত্রীকে নিয়া পলাইয়াছিল। কাজেই সে কেমন করিয়া বলিবে ঠাকুরদা কোথায়! কিন্তু পরক্ষণেই বলাই আসিয়া বলিয়া উঠিল, ঠাকুরদা ডাক্তার বাড়ী গেছে—

কুসুম সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তার বাড়ী কেন?

বলাই কহিল, বুড়োর মাথাটা একেবারে ফেটে গেছে।

তাই নাকি, চিন্তিতভাবে কুসুম কহিল। পঞ্চু বলাইয়ের উদ্দেশ্যে কহিল, তুই এতক্ষণ কোথা ছিলি বলদিকি বলাই?

বলাই হাসিতে হাসিতে বলিল, য পলায়তি—

ও, পঞ্চু হাসিল।

বলাইয়ের হাসিটা কুসুমের ভাল লাগিল না। যখন এতবড় একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল তখন সে পলাইয়া বাঁচিল এবং সেই পলায়নের কথাটাই আবার হাসিতে হাসিতে সে বলিতেছে—লজ্জাও করে না!

শুধু কি তাই? বলাই ঠিক পালায় নাই—সে বাড়ীর পাশেই লুকাইয়াছিল। শুধু বিজয় ছিল বলিয়া সে আসিতে পারে নাই। এই বলাইটীকে কুসুম আদৌ দেখিতে পারে না। বলাই ওপাড়ার লোক কিন্তু তা হইলেও সে তার ছেলেবেলাকার খেলার সাথী। বিশ্বাসঘাতকতা করিতে ছেলেটী অদ্বিতীয়। বিজয়ের সঙ্গে তার পথে ঘাটে, আড়ালে-আবডালে, বারোয়ারীতলায় বা বাড়ীতে যেখানেই দেখা হইত সে কথা কহিত। কিন্তু ঐ বলাই সমস্ত গ্রামময় সে সব কথা রটাইয়া দিয়া, নানাভাবে ভয় দেখাইয়া, তাকে যেন কি বলিতে চাহিয়াছে। এমনও হইয়াছে কখনো-সখনো পথে ঘাটে বলাই তাকে নির্জ্জনে পাইয়া, এমন সব ভাষায় কথা বলিয়াছে, যা কুসুমের বোধগম্য নয়—কুসুম তার দৃষ্টি দেখিয়া ছুটিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। তার স্বামী নিরুদ্দেশ হইবার পর বলাই-ই একমাত্র লোক যে সর্ব্বক্ষণ তাকে জ্বালাতন করে।

সেজন্য বলাইকে আসিতে দেখিয়া কুসুম বিরক্তই হইল। পঞ্চু বুঝিতে পারিল সে কথা। সেজন্য সে বলিল, পালিয়ে গেলি কোথা?

বলাই সত্য কথাই বলিল। তবে বলিবার ভঙ্গিটা ভারী চমৎকার। সে কহিল, পালিয়ে যাব কোথায়? আর যাওয়াটাই কি আমার সাজে? কুসুমের

ওপর যদি কোন অত্যেচার হয়—এই ভেবে আমি বাড়ীর পাশের ঐ ঝোপটায় লুকিয়ে রইনু।

পঞ্চু কহিল, কিন্তু অত্যেচারটা তুই কি রুখলি? এই তো ঘরখানা পুড়েছে দেখতে পাচ্ছি, সামিয়ানাগুলো ছিঁড়েছে, সব লণ্ডভণ্ড একাকার হ'য়ে রয়েছে!

আহা-আ, বলাই কহিল, ওসব আমি রুখব কি ক'রে? আমি রুখতুম যদি কেউ কোন অত্যেচার টত্যেচার ক'রত—

ইহাদের আলোচনা কোনদিকে পাক খাইতেছে তা লক্ষ্য করিয়া কুসুম বলিয়া উঠিল, কাজ কি পঞ্চুদা' ওসব কথা আলোচনায়। জ্যাঠাইমা এসেছে, বেটী থাকুক আমার কাছে, আর তোমরা সব যাও এখন। আমি আর কিছু ভাবতে পাচ্ছি না!

কথাগুলা বলিয়া কুসুম দাওয়ায় আঁচলটা বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। বলাই ও পঞ্চু পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইল বোধ করি। পঞ্চুর মা বুড়ী কুসুমের কাছে আগাইয়া গিয়া কহিল, তাই যা না বাবু তোরা—আমি রাতটা কুসুমের এখানেই থাকি!

কিন্তু কে আগে যাইবে? পঞ্চু ভাবিতেছে, বলাইটা যাক্—বলাই ভাবিতেছে পঞ্চুটা গেলে হয়। কিন্তু পঞ্চুকেই যাইতে হইল আগে। হাজার হোক্ সে ঘরোয়া লোক। সব দিক মানাইয়া তাকে চলিতেই হইবে—যতই সে লম্পট হোক। তাই সে কহিল, কিন্তু একটা আলো-টালো হ'লে ভাল হ'ত—নয়?

মা কহিল, তা যদি পারিস্ একটা দিয়ে যা।

বলাই কহিল, আচ্ছা আমি আলো নিয়ে আসছি।

পঞ্চু আর কি বলিবে—সে চলিয়া গেল। বলাই গেল আলো আনিতে।

কালিঝুলি মাখা মূর্ত্তিতে বিজয় বাড়ী ফিরিল। বাড়ী ফিরিতেই বনমালার সহিত একচোট হইয়া গেল।

হরিসভায় ষোল-আনার অষ্টম-প্রহর কীর্ত্তন হইবে শোনা অবধি বনমালা আদৌ সহ্য করিতে পারিতেছিল না। সে কেমন করিয়া যেন ধরিয়া নিয়াছিল ও অষ্টমপ্রহর কীর্ত্তন আর যাইহোক্, তার পক্ষে কিন্তু অভিশাপ। কীর্ত্তনের ছল করিয়া তার স্বামী কুসুমের ওখানে যাইবে এবং যদি যায় তো তাকে কিছু বলাও যাইবে না—অথচ সর্ব্বনাশটা হইবে তারই। তাই কদিনই বনমালা অন্তরে অন্তরে ফুঁসিয়া উঠিতেছিল কিন্তু চট্ করিয়া তো কিছু বলা যায় না।

আজ সকালে যখন কীর্ত্তনের নাম শুনিয়া সারা গ্রাম আনন্দমুখর হইয়া উঠিয়াছিল তখন বনমালা প্রাণ খুলিয়া তা মানিয়া নিতে পারে নাই। মধ্যাহ্নে মাঠ হইতে বিজয় ফিরিলে, সে সব কথা ফেলিয়া রাখিয়া সর্ব্বপ্রথমে তাকে জিজ্ঞাসা করিল, কুসুমের ওখানে তাহ'লে আজ যাচ্ছো?

বিজয় কথাটার কধ্যে কোন মারপ্যাঁচ দেখে নাই। সে সহজভাবেই কহিল, তা সবাই যখন যাবে, আমিও যাব বৈকি!

হুঁ, বলিয়া বনমালা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িল। তারপর ঝাঁঝালোস্বরে কহিল, তোমাকে যেতেই হবে?

বনমালার কথায় উষ্মা দেখিয়া বিজয় মুখ তুলিয়া তার দিকে তাকাইল। তারপর একটু হাসিয়া কহিল, হ্যাঁ!

হ্যাঁ, ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া বনমালা দৃঢ়ভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নাকের পাতা দুইটা তার থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। ঘনঘন শ্বাসপ্রশ্বাসে বুকটা তার নদীর তরঙ্গায়িত বুকের মত উঠা-নামা করিতে লাগিল।

সারাদিনটা সে ঐভাবেই কাটাইয়াছে। সন্ধ্যা হইলে সে কীর্ত্তন-ও শুনিতে যায় নাই। কীর্ত্তনের এক-একটা কলি তার কানে ভাসিয়া আসিয়া লাগিয়াছে, আর তার বুকের ভিতরে গুম্‌রাইয়া গুম্‌রাইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য তা যে গানের সুরে নয়, সেকথা বলা বাহুল্যমাত্র। যতক্ষণ কীর্ত্তন হইয়াছে, সে এক-একবার মাদুর বিছাইয়া শুইয়াছে, দরজার ধারে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, কখনো

বা উঠানে পায়চারী করিয়াছে। আর এ সমস্ত সময়টা তার কেবলই মনে হইয়াছে তার একান্ত অন্তরের ধনটিকে বুঝি কুসুম ছিনাইয়া নিতেছে। সে কীর্ত্তন শুনিতে যায় নাই বলিয়া শাশুড়ীও যায় নাই। তার এইরকম চঞ্চল অথচ বিষাদমাখা মূর্ত্তি দেখিয়া কতবার শাশুড়ী বলিয়াছে, বউ-মা ওরকম হান্-টান্ না ক'রে তুমি তো কেত্তন শুনতে গেলেই পারতে বাপু। অতো দুঃখের মাঝেও বনমালার হাসি পাইয়াছে। শাশুড়ী তার ভাবিয়া নিয়াছে যেন সে কীর্ত্তন শুনিতে যায় নাই বলিয়াই অমন করিয়া বেড়াইতেছে! সত্যই কি তাই?

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে যখন বিজয় বাড়ী হইতে বাহির হইতেছিল তখন বনমালা বলিয়া দিয়াছিল, হরিসভায় যাবে বটে কিন্তু সোজা চলে আসবে। আর ডিহিবাৎপুর যদি যাও তো ফিরতে রাত করোনা!

তারপর মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত চলিয়া গিয়াছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিক্রান্ত হইয়াছে, কীর্ত্তন সুরু হইয়াছে, কীর্ত্তন থামিয়াছে, গোলমাল উঠিয়াছে, গোলমাল থামিয়াছে—তবু বিজয় বাড়ী আসে নাই। কাজেই বনমালা একবার মাদুর পাতিয়া শোয়া, না হয় দরজায় যাওয়া, কিম্বা উঠানে পাক্ খাওয়া ছাড়া আর করে কি?

এমনিতরো চঞ্চল অবস্থা যখন বনমালার ঠিক তখনই বিজয় বাড়ী ফিরিল। বনমালা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। স্বামীর আপাদমস্তক একবার দেখিয়া নিয়া, সে কহিল, মূর্ত্তিটা এরকম জন্তু জানোয়ারের মত কেন?

—আগুন নিভিয়িচি যে!

—কার, কুসুমের মনের নাকি?

অষ্টম-প্রহর কীর্ত্তনের ব্যাপারে বনমালা যে তাকে দু'কথা শুনাইবে, এটুকু বিজয় জানিত। কিন্তু তা হইলেও বনমালা তো মানুষ—যখন শুনিবে যে কুসুমের ঘরে ও-পাড়ার লোকেরা আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল আর সেই আগুন বিজয় নিভাইয়া আসিয়াছে, তখন আগুন লাগায় কুসুমের যে

সর্ব্বনাশ হইল তার জন্য মনটা কুসুমের প্রতি সমবেদনায় ভরিয়া এবং বিজয় সেই আগুন নিভাইয়া আসিয়াছে বলিয়া সে প্রচ্ছন্নভাবে গর্ব্ববোধ করিবে। কিন্তু বনমালা তার ধার পাশ দিয়াও গেল না দেখিয়া, সে বিরক্ত হইয়া উঠিল। এ বিরক্তি ক্রোধেরই পূর্ব্বাভাষ। বিজয় দাওয়ায় বসিয়া পড়িয়া বলিল, দ্যাখো সব সময়ে 'কুসুম' 'কুসুম' ভাল লাগে না। এখন একটা গামছা-টামছা দাও আমায়—একেবারে পুকুরে ডুব দিয়ে আসি।

মা বুড়ী দাওয়ায় শুইয়া ছিল। বলিল, এই রাতে তুই নাইবি ?

—কি ক'রব মা। চাপ চাপ খড়ের আগুন! আর তার সঙ্গে লড়াই ক'রে এলুম। এখন না নাইলে চ'লে ?

মা জিজ্ঞাসা করিল, আগুন কি খুব হয়েছিল নাকি ?

—তা খুব হলে কি আর নেভাতে পারতুম ?

বনমালা জিজ্ঞাসা করিল, আর কে কে ছিল ?

—আমি আর কুসুম।

—তা নইলে আর আগুন নেভাবার সুবিধে হয়।

সেই এক কথা, রাগতভাবে বিজয় বলিয়া উঠিল।

একে হরিসভার ওদিকের গোলমাল, কুসুমের বাড়ীতে আগুন, তারপর আগুন নিভানো, পরিশেষে কুসুমের বাড়ীতে নিত্যকার আড্ডাধারী লোকেদের অতবড় একটা ঘটনায় অনুপস্থিতি প্রভৃতি—এই সব ব্যাপারে তার মন-মেজাজ এমন খারাপ হইয়া গিয়াছিল যে সে আর কোনকিছু যেন সহ্য করিতে পারিতেছিল না। তার উপর পথে আসিতে আসিতে সে উত্তর পাড়ায় যে কাণ্ড দেখিয়া আসিয়াছে তা'তে কোন মানুষের পক্ষেই মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া চলা সম্ভব নয়।

দক্ষিণপাড়ার অষ্টমপ্রহর কীর্ত্তনে ওপাড়ার লোকেরা যোগ দেয় নাই। যোগ না-দিয়াছিল না-দিয়াছিল কিন্তু তার জন্য অমনভাবে—অমন

পৈশাচিকভাবে ধর্ম্মের নামে মানুষের এই সর্ব্বনাশ করিবার প্রয়োজন ছিল না।

এমন পূর্ণিমা রাত। সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া চাঁদের হাসির মেলা। তবু এমনিতরো রাতেই উত্তর পাড়ায় কালীপূজার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কালীপূজা হয় অমাবস্যা রাতে কিন্তু উদ্যোক্তারা সুবিধামত পূর্ণিমাকেই অমাবস্যা তিথিরূপে ব্যবহার করিতেছিল।

কালীপূজা হইতেছিল সম্ভবতঃ কালীমাতার উপর ভক্তি গদ-গদ হইয়া নয়—কালীপূজা হইতেছিল, কারণ-বারি পানে উন্মত্ত হইয়া ও-পাড়ার লোকেরা এ-পাড়ার লোকের উপর অত্যাচার করিতে পিছ্-পাও হইবে না এইজন্য।

পথে আসিতে আসিতে কারণ-বারি পানোন্মত্ত ও-পাড়ার লোকেদের বিকৃত-কণ্ঠের ততোধিক বিকৃত চীৎকার শুনিয়া কি ভাবিয়া বিজয় ওপাড়ার দিকে যায়। গিয়া দেখে যোগেশবাবুর বাড়ীর ঠিক কাছাকাছি একটা মাঠে বেদীর উপরে ক্ষুদ্রাকৃতি এক কালীমূর্ত্তি। মূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া স্বয়ং নফর ভটচায্। সম্ভবতঃ ধ্যানস্তিমিত তিনি। পিছনে তাঁর অনেকগুলি লোক মদের বোতল ও মাংসের থালা নিয়া বসিয়া বসিয়া গলাধঃকরণ করিতেছে।

ওঃ ধন্য ঐ ভট্‌চায! একটু আগে তাকেই বিজয় ডিহিবাৎপুরে রাখহরির দোকানে দেখিয়া আসিয়াছে। অথচ সেই লোকই আবার কালীপূজার সময় ঠিক কালীপূজা করিতে আসিয়াছে। ইহা ভট্‌চাযের আর কিছু নয়—শুধু গোলমালের জন্য যাতে তাকে না দায়ী করা হয়, তদুদ্দেশ্যেই এই সুচতুর আত্মগোপন।

বিজয় বেশ বুঝিল, এই কালীপূজা করার অর্থ কি! কালীপূজার নামে ওপাড়ার লোকগুলিকে মদ্য আর মাংস খাওয়াইয়া তাদের কাজে লাগানো অর্থাৎ তাদেরই কৃষকভাইদের বিরুদ্ধে তাদেরই দ্বারা লাঠি ধরানো! কি চমৎকারই না কৌশল!

দেখিয়া শুনিয়া একদিকে বিজয় যেমন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল অন্যদিকে তেমনি তার কৌতূহলও হইল। দেখা যাক্ এই অত্যাচারের মূল উৎস কোথায়। সে ধীরে ধীরে যোগেশবাবুর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

যোগেশবাবুর সদরবাড়ীতেই ইউনিয়ন বোর্ডের অফিস। নিজে প্রেসিডেণ্ট বলিয়া যোগেশবাবু মনের মত করিয়া ঘর এবং ঘরের চারিদিকটা সাজাইয়াছেন। সদরে ঢুকিতেই দু'পাশে নানারকম ফুলগাছে ভর্ত্তি বাগান। মাঝখানে রাস্তা। রাস্তা পার হইলেই সিঁড়ি—সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলেই দালান। দালানের দুইদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুইটা দরজা। ভিতরে হলঘর। হলঘরের পূব ও পশ্চিমে দুইখানি ঘর। এসবগুলি নিয়াই বোর্ডের অফিস।

দূর হইতে জ্যোৎস্নালোকে দেখা গেল যোগেশবাবু দালানের উপর পায়চারী করিতেছেন। তাঁর চোখে ঘুম নাই। পল্লী-জীবনের প্রাণকেন্দ্রে তাঁর অবস্থিতি। কাজেই কি করিয়া তিনি ঘুমাইবেন? অনেক কৌশল, অনেক ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁকে চলিতে হয়—আর তা করিতে হয় বলিয়াই তাঁর সময় নাই। সুন্দর গৌরবর্ণ চেহারা তাঁর। আল্‌গা গা, সপেতা চেহারাটা যেন পৌরাণিক যুগের কোন মানুষকে মনে করাইয়া দেয়। প্রশস্ত ললাট, চোখ দুইটা টানা টানা, প্রতিভার দীপ্তিতে পূর্ণ। চুলে পাক ধরিয়াছে, ভ্রূর চুল কাঁচাপাকা, গোঁফও তাই, শক্ত চোয়াল আর চিবুক। দেখিলেই লোকটাকে গম্ভীর প্রকৃতির রাশভারী লোক বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এই গভীর রাত্রিতে তাঁর পায়চারী করাটা কেমন যেন একটা অশোভন ও অস্বাভাবিক ব্যাপার। বিজয় দূর হইতে তাঁকে এই অবস্থায় দেখিয়া কেমন যেন একটু ঘাবড়াইয়া গেল—আর অগ্রসর হইলনা। সে বেশ বুঝিল, যোগেশবাবু কোন খবরের জন্যই হয়ত অমনিতরো উৎসুকভাবে প্রতীক্ষা করিতেছেন।

বিজয় ফিরিল। ফিরিতে ফিরিতে ভাবিতে লাগিল, কুসুমের উপর অত্যাচার হইয়াছে এইখান হইতেই এবং এইখানেই তার মূল উৎস।

ঠিক এইসব কারণেই তার মনের অবস্থা ভাল ছিলনা—বরং রীতিমত বিরক্তিতেই পূর্ণ ছিল। সেজন্য বনমালা যখন বার বার করিয়া কুসুমের ঘরে আগুন-লাগা সম্বন্ধে বক্র ইঙ্গিত করিতেছিল তখন বিজয়ের তা ভাল লাগিতেছিল না। সময় সময় সে ক্ষেপিয়া উঠিতেছিল।

বনমালারও বিজয়ের এই গায়ে পড়িয়া কুসুমের উপকার করাটা সহ্য হইতেছিল না। সে তার কে যে তার জন্য বিজয় অতখানি করিতে ছুটিয়া যাইবে? তাই বিজয় যখন বলিল, 'সেই এককথা' তখন বনমালা একেবারে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, নাঃ এক কথা বল্‌বে না! একটা নষ্ট মেয়েছেলের বাড়ীতে তুমি যখন তখন—

বিজয় আর সহ্য করিতে পারিলনা। বনমালার কথা শেষ হইতে না হইতেই সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া ঠাস্ করিয়া তার গালে একটা চড় বসাইয়া দিয়া ফস্ করিয়া আন্‌লা হইতে গামছাটা টানিয়া নিয়া পুকুরের উদ্দেশ্যে পা বাড়াইল।

চড়টা সম্ভবতঃ একটু জোরেই হইয়াছিল। বনমালা ঘুরিয়া বসিয়া পড়িল। মা বলিয়া উঠিল, ও তোর কি কাণ্ড বিজয়—বৌকে তুই মারলি?

মারবে না তো কি, বলিয়া বিজয় উঠান পার হইয়া গেল। মা উঠিয়া বনমালার কাছে আসিয়া কহিল, গ্যাখো দিকিনি এই রাত্ত দুপুরে সব কি কাণ্ড মাণ্ড—

বনমালার দুই গণ্ড বহিয়া শুধু অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

খানিক পরেই বিজয় পুকুর ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইল।

সেকালের প্রতিষ্ঠা করা পুকুর। দীর্ঘকাল অসংস্কৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। মাঝে মাঝে অবশ্য বন্যার জল পুকুরটাকে ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া যে পরিষ্কার করিয়া দিয়া যায় না তা নয়। পাকাঘাটের পৈটাগুলায় ফাটল ধরিয়াছে, ঝাঁকে ঝাঁকে আসর জমাইয়াছে যত আগাছার দল।

পূর্ণিমার চাঁদ মায়া গুলিয়া দিয়াছে পুকুরের জলে। জল হাসিয়া উঠিয়াছে। জলে নামিতে গিয়া কি যেন মনে হইল, সে আর মামিল না—শুধু গামছাটা ভিজাইয়া নিল ও আঁজলা করিয়া জল তুলিয়া নিয়া মুখে চোখে ছিটাইয়া দিল। তারপর ভিজা গামছাটা দিয়া গা-হাত মুছিয়া নিয়া সিঁড়ির একটা ধাপে আধ শোয়া অবস্থায় সে দেহটা বিছাইয়া দিল।

আকাশে চাঁদ। সুমুখে পুকুর। মধ্যরাত্রির ঠাণ্ডা বাতাস বহিয়া যাইতেছে হু হু করিয়া। ক্লান্ত বিজয়, শরীরটা যেন তার অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল যেন সে খানিকটা ঘুমাইয়া নেয়। কিন্তু ঘুম আসিবে কি করিয়া? আজ য়ে কাণ্ড ঘটিয়া গেল কুসুমের বাড়ীতে তার তো তুলনা হয়না। এই অত্যাচারের কাহিনীকে ভাষায় বর্ণনা করাও যায় না।

সংসারে যারা বড়, যাদের আছে ক্ষমতা, তারা তো এরূপ করিবেই কিন্তু কুসুমের বাড়ীতে যারা নিত্য আড্ডা বসায়, যারা তাকে ঘিরিয়া দলবদ্ধ হইয়াছে, তারা নীরবে এসব সহ্য করিল কেন? সহ্য করাই বা কি—সেদিক দিয়াও তারা যায় নাই। তারা কাপুরুষের মত কুসুমকে একাকীনি রাখিয়া পালাইয়াছে। এই এখানকার মানুষের সত্যকারের পরিচয়। বিজয় এসব কথা ভাবিতে ভাবিতে রাগে দুঃখে অপমানে নিজের কাছে নিজেই যেন কি প্রতিজ্ঞা করিতে চায়।

হায় ভগবান! কেন তুমি তাকে এমন দরিদ্র করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলে? যদি পাঠাইয়াছিলে তবে তেমন ভাবে তাকে লেখাপড়া শিখিবারই সুযোগ দিলে না কেন? যদি তার কিছুটাও পয়সা থাকিত কিম্বা যদি জানিত সে তেমন লেখাপড়া তা হইলে সে দেখিয়া নিত এই অন্যায়, জঘন্য অন্যায়, এই নির্ম্মম পাশবিকতার প্রতিকার করিতে হয় কি করিয়া?

কিন্তু কি-ই বা করিতে পারিত সে? পল্লীসমাজকে সে ভাল ভাবেই জানে। এখানে কেউ কোন কিছুর প্রতিকার করিতে গেলে সকলে তাকেই চাপিয়া ধরে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে তার নিজের বোন সীতার কথা। সীতা তার একটি মাত্র বোন। হতভাগিনী বালবিধবা। বিজয়ের কাছে থাকিয়াই সে জীবনের দুঃখমাখা দিনগুলি অতিবাহিত করিত। রূপ ছিল সীতার অতুলনীয়। পল্লীগ্রামে অমন রূপ সচরাচর চোখে পড়ে না। একবার মাহেশে রথ দেখিতে গিয়া সে একটা গরুর গাড়ী চাপা পড়ে এবং তার জন্য তাকে হাঁসপাতালে পাঠাইতে হয়। সেখানে ডাক্তাররা তার বাঁহাতের কনুইটার নিকট হইতে হাতখানা বাতিল করিয়া দেয়। তদবধি সেই অর্দ্ধকর্ত্তিত হাতখানা নিয়াই সে বাঁচিয়া থাকে। মৃত্যু যার ভাগ্যে নাই সে মরিবে কেন? তা ছাড়া হাতখানা গিয়াও সীতার রূপের জৌলুষ এতটুকু কমে নাই। দরিদ্র ঘরের রূপসী মেয়ে গৃহস্থের পক্ষে অভিশাপ। প্রায়ই তাদের বাড়ীতে গ্রামের লোকের, বিশেষ করিয়া অত্যাচারী লোকদের দৃষ্টি পড়িতে লাগিল। হঠাৎ একদিন রাত্রিতে কে বা কারা সীতাকে মুখে কাপড় গুঁজিয়া ধরিয়া নিয়া যায়। বিজয় সেদিন বাড়ী ছিলনা, সে গিয়াছিল তার শ্বশুরালয় হাঁট-গোবিন্দপুরে—বর্দ্ধমান জেলায়। আসিয়া যখন সব শুনিল তখন সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। মায়ের মুখে সে শোনে যে, সীতা নাকি বারকয়েক 'ভট্চায্যি মশাই' 'ভট্চায্যি মশাই' করিয়া চীৎকার করিয়াছিল। তাই তারই সূত্র ধরিয়া বিজয়ের মনে হয় সম্ভবতঃ সেই দুর্ঘটনার সময় যে কোন কারণেই হোক্ সীতা ভট্চাযকে দেখিতে পাইয়াছিল। বিজয় সেজন্য ব্যাপারটা ভট্চায্‌কে জিজ্ঞাসা কবিতে যায় কিন্তু ভট্চায্‌ তার কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাকে যৎপরোনাস্তি গালাগালি দিয়াছিলেন এবং বলিয়া দিয়াছিলেন—'ষোলআনাকে ডেকে তোর বিচার ক'রব—আর বিচার ক'রে তোকে জুতুবো।' বিজয়ের বেশ মনে আছে সেদিন গ্রামের লোক তাকে সমর্থন করে নাই—সমর্থন করিয়াছিল ভট্চায্‌কে। অথচ সেই যে সীতা গেল, সে খোঁজ আর কেউ করিলনা, করিতেও চাহিল না।

কাজেই কি করিতে পারে সে? সে উঠিয়া পড়িল এবং পুকুরের সেই

পাকাঘাটের পৈটার এদিক-ওদিকে একটা নিষ্ফল-আক্রোশে পায়চারী করিতে লাগিল।

মাথার মধ্যে অজস্র চিন্তা ঘুলাইয়া উঠিতেছে। কি করিবে সে? করিবার আছেই বা কি?

নিজেকে যখন সে নিজে এমনিভাবে প্রশ্ন করিতেছে, সহসা তারই ফাঁক দিয়া একজনের একখানি মুখ তার চোখের সুমুখে ভাসিয়া উঠিল। অত্যাচারিতের প্রতি যদি তার এতই সমবেদনা তবে বনমালার উপর অত্যাচার করে সে কেমন করিয়া? কুসুমের দিকে তাকাইতে গিয়া সে তাকেই বা কষ্ট দেয় কেন? আর কেনই বা কিছুক্ষণ আগে তাকে সে প্রহার করিয়া আসিল? আহা-আ বনমালা বড়ই দুঃখী। সংসারে বিজয় ছাড়া তার আপনার জন আর কে আছে? বাপ আছে বটে কিন্তু সে বেচারী থাকে অনেকদূরে—বর্দ্ধমানে। এতক্ষণ হয়ত বউটা তারই আশায় জাগিয়া জাগিয়া দাওয়ায় বসিয়া আছে!

বনমালার কথা মনে পড়িবা মাত্রই বিজয় আর একমুহূর্ত্ত-ও বিলম্ব করিল না। ঝুপ করিয়া গিয়া জলে নামিল। জলের বুকে ঢেউ উঠিল—আর সেই ঢেউয়ের দোলায় একচাঁদ অসংখ্য হইয়া মালার মত বৃত্তাকারে ছড়াইয়া পড়িল। বিজয় গা-হাত রগড়াইয়া গোটাকয়েক ডুব দিয়া জল ও চাঁদের খেলা দেখিতে দেখিতে উঠিয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে বনমালা দাওয়ায় বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। চোখের জল কখন শুকাইয়া গিয়াছে। শাশুড়ী সহানুভূতি জানাইয়া গিয়া কোনকালে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তবু সেই যে লোকটা গামছা নিয়া পুকুরের উদ্দেশ্যে গেল কই এখনও তো ফিরিল না! বনমালার মনে কেমন ভয় হইল। ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনুশোচনা আসিয়া তাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বনমালা যেন দিন দিন কি হইয়া উঠিতেছে। মানুষের কাছে মানুষ গেলেই কি খারাপ হইয়া যায়? তা ছাড়া ওসব কথা বলিবারও তো একটা সময়-অসময় আছে।

এমন সময় বনমালা তাকে বলিল, যখন নাকি ওসব কথা তোলাই তার উচিত নয়। লোকটা সবেমাত্র আসিয়াছে তাতিয়া পুড়িয়া! শবদাহ করা আর আগুন নিভানো প্রায় একই জিনিস। মানুষকে আঘাত দিয়া কি ওসব কিছু বলিতে আছে? ফিরিয়া আসুক লোকটা—সে দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিবে!

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই বিজয় আসিয়া উঠানে পা দিল। বনমালা উঠিয়া পড়িয়া কেরোসিনের ডিবাটা জ্বালিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল। ভাত বাড়িয়া সে বলিল, খাবে এসো।

যাই, বলিয়া বিজয় কাপড় ছাড়িয়া আসিল।

আহারাদি সারিয়া বিজয় শুইয়া পড়িলে বনমালাও গিয়া শুইয়া পড়িল। কেন যে সে না খাইয়া শুইয়া পড়িল তা সেই জানে। সম্ভবতঃ অভিমানেই সে এরূপ করিয়া থাকিবে। চড় মারার পর স্বামীর দিক হইতেও কি কিছু করিবার ছিল না?

বিজয় প্রশ্ন করিল, তুমি খেলেনা যে?

অভিমানে বনমালার চোখে জল আসিল। তবু মনে মনে সে খুশি হইল। এদেশের মেয়েরা চিরকাল ধরিয়া অবহেলিতা—বিশেষ করিয়া তারা কি খাইল না খাইল, এ খোঁজটুকু পর্য্যন্ত অনেকেই নেয় না। সেজন্য তাদের খাওয়ার খোঁজ নিলে সত্যই তারা খুশি হয়। শুধু খুশিই হয় না—বুঝিতে পারে যে সে অবহেলিতা নয়, তারও একান্ত আপনজন পৃথিবীতে আছে, অতি নিকটেই আছে। খুশির ভাব চাপিয়া রাখিয়া সে কহিল, না।

বিজয় কহিল, ঐ কেমন তোমাদের মজা। ঝগড়া রাগারাগি হ'ল তো অম্নি খাব না'!

বনমালা স্বামীকে জানে। লোকটা রাগিলেও রাগ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না—ক্ষণকাল পরেই জুড়াইয়া জল হইয়া যায়। কিন্তু তা হইলে সেই-বা ছাড়িয়া

দিবে কেন—মেয়েদের এই তো বলিবার তাল। তাই সে বলিয়া উঠিল, তুমি মারলে কেন ?

—তুমি অমন ক'রে 'নষ্ট ফষ্ট' সব বাজে কথাগুলো বল্‌লে কেন ?

—তুমি কুসুমের ওখানে যাও কেন ?

—মানুষ বিপদে পড়লে তাকে দেখব না ?

—সে তো দেখাই উচিত কিন্তু তাব'লে সব সময়েই দেখ্‌তে হবে ?

—সবসময়েই কি আমি যাই কুসুমের ওখানে ?

তা নয় অবশ্য—বনমালা হিসাব করিয়া দেখিল। পূর্ব্বচিন্তার স্রোতে এবং বর্ত্তমান আলোচনার আবেগে সে সহসা স্বামীর প্রতি সশ্রদ্ধ আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল এবং কহিল, আমার সদাই ভয় পাছে তোমায় কেউ কেড়ে নেয়। তাই কোথাও তোমাকে যেতে দেখলে আমার ভয় হয়।

আচ্ছা সে ভয় এখন থাক্, বিজয় কহিল, আগে খেয়ে এসো দিকি !

তুমি জেগে থাক্‌বে, বনমালা উৎসুকভাবে প্রশ্ন করিল।

বিজয় কহিল, কেন ?

স্বামীর গায়ে একটা টোকা মারিয়া বনমালা খাইতে চলিয়া গেল।

এইতো মানুষ। অথচ একটু আগে কি ভয়ানক ভাবেই না ফুঁসিয়া উঠিয়াছিল। অন্যলোক হইলে বলিত—ধন্য এই নারী জাতি, ইহাদের বুঝা ভার! কিন্তু বিজয় তা বলিবেনা। কারণ সে তার স্ত্রীকে বোঝেনা এমন নয়। যার সহিত তাকে প্রতিদিনকার জীবন কাটাইতে হইতেছে, যার মনের ধারার সহিত তার নিজের মনের ধারা সমান্তরাল রেখায় মিশিয়া গিয়াছে, তাকে সে বুঝেনা একথা বলিলে মিথ্যা কথাই বলা হয়।

তা ছাড়া বনমালাকে বুঝিতে কষ্টই বা হইবে কেন ? বনমালার কথাগুলো তো খুবই পরিষ্কার। সে বলিয়াছে, 'আমার সদাই ভয় পাছে তোমায় কেউ কেড়ে নেয়।' একথা সে বলিতেই পারে! এরকম ঘটনা তো অহরহঃই

ঘটিতেছে। আরও সে বলিয়াছে, 'কেউ বিপদে পড়লে দেখাই তো উচিৎ কিন্তু তা ব'লে সব সময়েই দেখতে হবে?' অর্থাৎ সে বলিতে চায়—নির্য্যাতিতের প্রতি তুমি তোমার সমবেদনা জানাও কিন্তু তার সুযোগ নিও না। হয়ত সারাদিন ধরিয়া সে ব্যাপারটা বুঝিতে পারে নাই, তাই সে অমন করিয়াছিল—এখন বুঝিয়াছে, তাই শান্ত হইয়া গিয়াছে।

বনমালা তাড়তাড়ি ছুটি নাকে মুখে গুঁজিয়া আসিল। বিজয় অবিশ্বাস্য স্বরে কহিল, খেয়েচ তো?

—দেখে আস্‌বে চলো।

—আর দেখতে হবে না।

—যা' খেয়েচি এরপর ঐ জুটলে হয়।

—তা যা' বলেছ।

এই প্রসঙ্গে বনমালার মনে পড়িয়া গেল—ডিহিবাৎপুর যাওয়ার কথা। হাতে করিয়া আলোটা নিভাইতে নিভাইতে সে প্রশ্ন করিল, হ্যাগা ডিহিবাৎ-পুর গেলে যে! কি হ'ল?

—কোন আশা নেই।

—বল কি!

সমস্ত দেশ জুড়িয়া 'হা-অন্ন' 'হা-অন্ন' রব উঠিয়াছে। কথাগুলা বলার সঙ্গে সঙ্গে বনমালার সেই হাহাকারের চিত্র চোখের সুমুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

আলো নিভিয়া গিয়াছিল। বনমালা কিন্তু শুইতে পারিলনা। বিছানার কাছে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। বিজয় কহিল, রাত অনেক হয়েচে—এখন ঘুমুই। একটু বাদেই তো আবার যেতে হবে দিনগত পাপক্ষয়ে।

বনমালার কানে যেন কথাটা গেলই না। রাত পোহালে খাওয়া হবে কি?

ঘরের বাহিরে পৃথিবী উদ্ভাসিত। জানালার ফাঁকে বনমালা সেদিকে তাকাইল ও তারপর উপর দিকে মাথা তুলিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে কি প্রার্থনা জানাইয়া মনে মনে কহিল, আমার এই সাজানো সংসারকে নষ্ট হইতে দিওনা প্রভু!

বিজয় ঘুমাইয়া পড়িল। বনমালা চুপ করিয়া গিয়া স্বামীর পায়ের কাছে শয়ন করিল।

৮

রাত্রি শেষের দিকে আসিলে কুসুম ভাবিয়াছিল অনেকেই তার বাড়ীতে আসিবে কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল কেহই আসিল না। রাত্রির শেষ প্রহর কাটিয়া গেল।

ধীরে ধীরে সূর্য্যোদয় হইল। বেলা বাড়িয়া উঠিল। দেখা গেল শ্রীপতি প্রায় শ-দুই লোকের এক বিরাট জনতা নিয়া কুসুমের বাড়ীতে প্রবেশ করিল। কীর্ত্তনের দলও সঙ্গে আসিয়াছে। শ্রীপতিকে দেখিতে পাইয়াই কুসুম ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, ঠাকুরদা' ঠাকুরদা' গো—

শ্রীপতি কুসুমের কাছে গিয়া কহিল, দুঃখু করিস্‌নি বোন? আমি সব ব্যবস্থা ক'রে এসিচি!

কিন্তু তোমরা সব ছিলে কোথা গো, কুসুম কহিল, আমি একলা মেয়ে মানুষ—

শ্রীপতি কুসুমের পোড়া ঘরখানির দিকে তাকাইল। সে কহিল, কি করি বোন্! আমি বেরুলুম তোকে খুঁজতে আর গুণ্ডোরা আমাকে এমুখো হ'তে দিলেনা! লাঠির ঘায়ে ঘায়ে আমাকে সেই গেরাম পার ক'রে দিয়ে তবে ছাড়লে।

এতক্ষণ কুসুম লক্ষ্য করে নাই। শ্রীপতির মাথায় একটা প্রকাণ্ড ব্যাণ্ডেজ। রক্ত ও আইডিনে ভিজিয়া কালো হইয়া উঠিয়াছে। তাই সে ভয়-চকিতস্বরে বলিয়া উঠিল, উই বুঝি মারের দাগ?

হ্যাঁ, শ্রীপতি কহিল, এর জন্তে আমি ঘাবড়াই নি। যখন দেখলুম সত্যি-সত্যিই তারা আমাকে গেরামের বাইরে এনে ফেল্‌লে তখন আমিও দেখলুম এই সুযোগ—সোজা রক্তমাখা উড়ুনীটা নিয়ে চ'লে গেলুম একেবারে থানায়।

থানায় দারোগাকে সব বুঝিয়ে বল্‌লুম। এই তিনি এসে পড়লেন ব'লে। দেখি একবার কত ধানে কত চাল হয়!

কথাগুলা বলিয়া শ্রীপতি খানিকটা আত্ম-প্রত্যয়ের ভঙ্গীতে সকলের মুখের দিকে তাকাইল। জনতার মানুষগুলার মুখে মুখেও তার ঢেউ খেলিয়া গেল। বাস্তবিক এই অত্যাচারের একটা বিহিত হওয়া দরকার! শ্রীপতি জনতার দিকে তাকাইয়া কহিল, দারোগা এলে তোরা যা' প্রিকিতো ঘটনা তা-ই বলবি। এ একেবারে সরেজমিনে তদন্ত, এরপর মামলা চলবে!

জনতার মধ্যে অধিকতর দৃঢ়তা পরিলক্ষিত হইল। তারপর ধীরে ধীরে উঠিল গুঞ্জনধ্বনি। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, হ্যাঁ সব সত্যি ঘটনাই আমরা বল্‌ব! কোম্পানীর রাজত্বে বাস করি—ভয়টা কিসের?

এবার কীর্ত্তনের দলের দলপতি গোপাল কহিল, আমরা আর এ গেরামে থাক্‌তে চাইনা মশাই—আমাদের পাওনাটা আর জিনিসগুলোর দাম মিটিয়ে গ্যান, আমরা চলে যাই—

জনতার মুখে একটা ঘৃণার অভিব্যক্তি দেখা গেল। লোকগুলা কে গো! এত বড় একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া গেল, সেটা কিছুই নয়, পাওনা মিটাইয়া দাও আগে! শ্রীপতি বলিল, বলেন কি মশাই—এতবড় বিপদ আমাদের মাথায়!

বিপদ, গোপাল কহিল, তা আমাদেরও তো বিপদ কম নয় মশাই। জিনিসগুলো সব গেল। বায়না হ'লে গাইব কি ক'রে?

গাঁয়ে কি হারমোনি খোলখত্তাল নেই, শ্রীপতি কহিল, চালিয়ে নেবেন যা হয় ক'রে—

তা হয়না মশাই—তা হয়না, গোপাল জনতার দিকে তাকাইয়া কাকে যেন খুঁজিতেছিল। সেদিকে চোখ পড়িতেই সে কহিল, পঞ্চু নিয়ে এসো ত ওগুলো। দেখাও এঁদের—

কি দেখাইবে? পরক্ষণেই দেখা গেল ফাঁসা খোলটার দুদিকের ছাউনি

ছেঁড়া পাতার মত ফাঁক হইয়া গিয়াছে, হারমোনিয়মের বেলোর দিকটা যন্ত্রটার অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, ঘণ্টা দিবার ঘড়িটা ভাঙিয়া দু-টুক্‌রা চাঁদের মত হইয়াছে। পঞ্চু যাত্রাদলের 'মোসেন মাষ্টার'—কমিক পার্টেও তাকে নির্দ্দেশ দিতে হয়, তাই এ বিদ্যা তার আয়ত্ত এবং সেই আয়ত্ত বিদ্যার জোরে সে এমন এক ভঙ্গীতে জিনিসগুলি উর্দ্ধে তুলিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া লোককে দেখাইতে লাগিল যে জনতা হাসিয়া ফেলিল। সে হাসির স্রোতকে কিছুক্ষণ বজায় রাখিবার জন্য পঞ্চু আরও অনেক রকম কসরৎ দেখাইল এবং লোকেও হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে লাগিল।

ইহাতে একটা ব্যাপার হইল। জনতা লঘুচিত্ত হইয়া গেল। হাসির রোল উঠিতেই কুসুম সেখান হইতে সরিয়া পড়িয়া দাওয়ায় গিয়া উঠিল। দাওয়ায় আসিয়া সর্ব্বপ্রথম সে শ্রীপতিকে বসিবার জন্য আসন দিল, তারপর কীর্ত্তনের দলের জন্য একটা মাতুর পাতিয়া দিল।

জনতার এই উচ্ছ্বসিত হাসির স্রোতে শ্রীপতি ব্যথিত হইল, ক্রুদ্ধ হইল, এমন কি লজ্জিতও হইল। এতখানি একটা দাঙ্গা হাঙ্গামার পর যে লোকে কি করিয়া এমনিভাবে হাসিতে পারে তা-ই হইতেছে হিসাব করিবার বিষয়।

কিন্তু তাদের হাসাইলে কি করিতে পারা যায়?

পঞ্চুর এই ব্যবহারটা তাই শ্রীপতির কাছে কেমন যেন দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িল। সে তাই ধীরে ধীরে আসিয়া দাওয়ার উপরে আসনে বসিল। গোপাল চক্রবর্ত্তী এবং তার দলবলও মাতুরে আসিয়া বসিল। পঞ্চু আসিয়া দাওয়ার উপর জিনিসগুলি এমনভাবে বসাইল যে লোকে আর একবার হাসিতে বাধ্য হইল।

শ্রীপতি আর এবার নিজেকে সামলাইতে পারিল না। বিরক্তভরে বলিয়া উঠিল, কি হ'চ্ছে পঞ্চু—এ কি তামাসার সময়?

পঞ্চু নির্লজ্জের মত এমন ভঙ্গীতে শ্রীপতির কথায় চমকাইয়া উঠিবার

অভিনয় করিল যে, জনতা আবার ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। শ্রীপতি ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, এ হাসি-তামাসার সময় নয় পঞ্চু? দারোগা আসছে, কে সাধু আর কে বদমাইস তা বেরিয়ে যাবে। তার পর তাদের সবাইকে চালান দেয়া হবে—

ইঃস! পঞ্চু এবার কথা কহিল, হাসি-তামাসা আর কি হয়েছে ঠাকুরদা? বেচারীদের খোল, হারমোনিয়াম, ঘড়ি-টড়ি সব গেল—উগুলো ওদের দিতে হবে না? আজ আবার ওদের গাওনা ক'রতে হবে।

আমরা কি দোষ না বলিছি, শ্রীপতি কহিল, তুই যে লোক হাসাচ্ছিস।

আমার ভুল হয়ে গেছে, পঞ্চু কহিল, মেয়ে-মালপোর কাণ্ড হ'লে এমনিই হয়! শেষ কথাটা পঞ্চু বেশ জোর দিয়াই বলিল।

এ সব পঞ্চু কি বলিতেছে? শ্রীপতি প্রথমটায় যেন থতমত খাইয়া গেল। গোপাল চক্রবর্ত্তীর স্বরও যেমন বেয়াড়া, পঞ্চুরও তেমনি। ব্যাপার কি?

গোপালের স্বর না হয় বেয়াড়া হইতে পারে। সে বিদেশী লোক। তা ছাড়া তার সঙ্গে তাদের পয়সার সম্পর্ক। গোলমাল দেখিয়া তার পক্ষে ঘাবড়াইয়া যাওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয় কিন্তু পঞ্চু—পঞ্চু তো আর বিদেশী লোক নয়? সে এই গাঁয়েরই ছেলে, অষ্টম প্রহর কীর্ত্তনের অন্যতম উদ্যোক্তা। তার স্বর বেয়াড়া হইলে যে বড় দুঃখের! তা ছাড়া দেখিতে শুনিতেও কেমন লাগে। লোক হাসিবে। এ সব কথা ভাবিয়া শ্রীপতি দৃঢ়ভাবে যেন কি বলিতে গেল কিন্তু বলিতে পারিল না—রাগে শুধু ঠোঁট দুইটা তার কাঁপিতে লাগিল।

পঞ্চু দৃঢ়তার সহিত বলিল, তা নাহ'লে শাস্ত্রে বলেছে নারী নরকের দ্বার! যেখানেই মেয়েমানুষ আছে সেখানেই এসব কাণ্ড। তাড়ি-মদ খেয়ে এসে মেয়েমানুষের বাড়ীতে ব'সে যতসব হল্লা, হবেনা এসব?

অদূরে ঘরের দরজার কাছে কুসুম দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পঞ্চুর কথাগুলি

শুনিল। সে বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে জনতার দিকে তাকাইল। জনতা তাকে কুটিল দৃষ্টিতে বিদ্ধ করিল।

এবার শ্রীপতি আর স্থির থাকিতে পারিল না। পল্লীগ্রামের সহজ ব্যাপারটি সে ধরিতে পারিয়াছে। পঞ্চু নিশ্চয়ই শত্রুপক্ষে যোগ দিয়াছে। শত্রুপক্ষে যোগ দেয়ার ব্যাপারটা যে ইহারা কি করিয়া বুঝে তা ইহারাই জানে। কেহ যে আসিয়া ভিতরকার কোন সংবাদ দেয় এমন নয় অথচ ইহারা ঠিকই অনুমান করিয়া নেয়। হয়ত এই ক্ষমতা ইহাদের সহজাত, নয় পুরুষানুক্রমে জীবনের অভিজ্ঞতায় এ ক্ষমতা ইহারা অর্জ্জন করিয়াছে। তাই সে উঠিয়া পড়িয়া কহিল, বের ক'রে দাও ওকে বাড়ী থেকে, বের ক'রে দাও! ওপাড়ার টাকা খেয়েছে!

জনতা এবার ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিল। কে একজন বলিল, তাই বলি এ বাড়ীতে না এলে যে পঞ্চার পেটের ভাত হজম হয়না সে পঞ্চা অমন সাধু বুলি আওড়ায় কি ক'রে?

হুঁ-হুম্ বাব্বাঃ! জনতাও সমর্থন করিল লোকটাকে।

সমর্থন করিবারই কথা। গতরাত্রিতে যোগেশবাবু যখন বোর্ডের অফিস ঘরে চঞ্চল পদবিক্ষেপে একবার-ঘর একবার-দালান করিতেছিলেন, তখনই লক্ষ্য করিলে ব্যাপারটা বোঝা যাইত। কথা ছিল ভট্‌চায্ পূজা সারিয়া পঞ্চু ও কীর্ত্তনের দলকে ডাকিয়া আনিবে এবং হইয়াছিলও তা-ই। হাতে একটা লণ্ঠন নিয়া ভট্‌চায্ পঞ্চুর বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন।

ভট্‌চায্ ওস্তাদ লোক। তা ছাড়া তার সুবিধাও হইয়াছিল—কীর্ত্তন-ওয়ালারা পঞ্চুর ওখানেই উঠিয়াছিল। ভট্‌চায্ যখন পঞ্চুর ওখানে গেলেন, পঞ্চু তখন বাড়ী ছিল না—সে কুসুমের বাড়ীতে গিয়াছিল। ইতিমধ্যেই পরদিন উত্তর পাড়ার কীর্ত্তনের বায়না দিয়া ভট্‌চায্ গোপাল চক্রবর্ত্তীকে দলে টানিয়া ফেলিলেন। পঞ্চু ফিরিতেই ভট্‌চায্ লণ্ঠনটা কমাইয়া দিয়া কহিলেন, ওরে বাবা পঞ্চু—ইদিকে আয় দিকি!

পঞ্চু তো অবাক। এত রাত্রিতে ভট্‌চায্‌ কেন তাদের বাড়ীতে? সে আগাইয়া আসিয়া কহিল, ব্যাপার কি ভট্‌চায্যি মশাই!

ভট্‌চায্‌ কহিলেন, এই রাতে তো বাবা সব কিছু নিদ্রা-টিদ্রা ত্যাগ ক'রে ছুটে এলুম।

পঞ্চু প্রণাম করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। তাই সে কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত নোয়াইয়া যুক্ত করে বলিল, প্রণাম হই ভটচায্যি মশাই।

কল্যাণ হোক, বলিয়া ভট্‌চায্‌ পঞ্চুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পঞ্চু কহিল, হঠাৎ?

হঠাৎই আসতে হ'ল বাবা, ভট্‌চায্‌ বলিলেন, তোর নাম যে উঠল!

পঞ্চু সবিস্ময়ে কহিল, কোথায়?

—আরে ভয় নেই কিছু। যোগেশবাবু বললেন পঞ্চু সে রকম ছেলেই নয়। আমিও বললুম সে কথা। তারপর সবাই-ই একরকম সায় দিলে।

—কথাটা কি আপনি বলে ফেলুন দেখি আগে। নইলে বুকের ধুক্‌-ধুকুনিটা মিটবে না!

মিটবে—মিটবে, ভট্‌চায্‌ হাসিয়া তারপর কৃত্রিম তিরস্কারের সুরে কহিলেন, তুই কি ওদের মত মদ-তাড়ি খাস, না ওসব খেয়ে কুসুমের বাড়ীতে যাস?

শুধু সে কেন, কেউ তো মদ তাড়ি খাইয়া কুসুমের ওখানে যায় না! কিন্তু ভট্‌চায্‌ ততক্ষণে লণ্ঠনের দম বাড়াইয়া দিয়া এমনভাবে তার দিকে তাকাইয়াছিলেন যে পঞ্চু তার কথায় সম্মতি না জানাইয়া পারিল না। সে কহিল, উহুঁ।

তবেই ধর তোর বুকের ধুকধুকুনিটা মিটবে না কেন, ভট্‌চায্‌ তারপর গলার স্বর অপেক্ষাকৃত কমাইয়া কহিলেন, আসলে ব্যাপার কি জানিস এই যে সব লাঠালাঠি হ'ল, এই যে সব ঘরে আগুন দেয়া-দিয়ি কাণ্ডগুলো হয়ে গেল, তা কি অমনি অমনি হয়েছে?

ও পাড়ার লোকের উপর পঞ্চুর রাগ কম নয়। অবশ্য ও-পাড়ার লোক যে ব্যক্তিগতভাবে তার কোন ক্ষতি করিয়াছে তা নয়—সে এ-পাড়ায় বাস করে বলিয়াই উহাদের উপর তার রাগ। তা ছাড়া আজ যে কাণ্ড হইয়া গেল ইহার মূলে তো ওপাড়ার লোকই!

তাই সে ভট্‌চাযের কথার উত্তরে বলিয়া উঠিল, অমনি অমনি হ'তে যাবে কেন?

সেই কথাই তো বলছি, ভট্‌চায্‌ পঞ্চুকে এবার নিজের খপ্পরে ফেলিয়া কহিলেন, একহাতে কি তালি বাজে? কি বলেন চক্রবর্ত্তী মশাই?

গোপাল যেন প্রস্তুত হইয়াই ছিল। সে কহিল, তা তো বটেই।

একহাতে তালি বাজে না, একথা সব সময়েই সত্য। কিন্তু একহাত যদি মানুষকে পীড়া দেয় তবে অপর হাত আপনা-আপনিই সেখানে আসিয়া পড়ে। দাঁতে কাঁটা ফুটিলে জিব যেমন সেখানে নিতান্ত অজানিতভাবে আসিয়া পড়ে, ইহা তেমনি ভাবেই সত্য। পল্লীগ্রামের লোক একথা বিশ্বাস করে। জীবনে তারা স্বতঃসিদ্ধের মত ও সর্ব্বকালীন সত্য হিসাবে যেসব কথাগুলি মানে, ইহা তারই একটি। পঞ্চু ভাবিয়া দেখিল, হ্যাঁ ভট্‌চায্যি মশায়ের কথাতো মিথ্যা নয়। তবু সে ওপাড়ার উপর প্রচলিত বিদ্বেষে বলিয়া উঠিল, কিন্তু তার জন্যে দায়ী কে ঠাকুর মশাই?

ভট্‌চায্‌ এবার পরিপূর্ণভাবে পঞ্চুর কথার সুবিধা নিবার উদ্দেশ্যে আগে খানিকটা হাসিয়া নিলেন। তারপর কহিলেন, দায়ী কে তুই বল্‌চিস্‌ পঞ্চু? ভেবে ছাখ দিকি আগে এক পক্ষ নোংরামি না ক'রলে অপর পক্ষ সেখানে আসে? এই যে গাঁয়ের মধ্যে মদ-তাড়ি খেয়ে মানুষ হল্লা ক'রবে, বউ-ঝিদের দিকে চেয়ে চেয়ে ঠাট্টা-মস্করা ক'রবে, এটা কি ভদ্দরলোকের গাঁয়ে-বাস ক'রে কেউ সহ্য ক'রতে পারে? তুই বুঝে ছাখ, তোদেরই বউ, মানে বউ-মা আর কি, যদি, এইধর জল আন্‌তে পথে বেরুলো—আর পাঁচটা ছোঁড়া তার পেছু লাগল, বউ-মার অবস্থাটাই বা তাহ'লে কি রকম হয়

আর তোর মনটাই বা কি বলে? তখন তুই-ই বল্‌বি, গাঁয়ে কি মানুষ নেই?

নিজের স্ত্রীর পিছু নিবে অপরে—একথা কল্পনা মাত্রেই পঞ্চু ভিতরে ভিতরে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। অবশ্যই এ ক্রোধ ভট্‌চাযের উপর নয়—এ ক্রোধ তাদের প্রতি, যারা তার স্ত্রীর পিছু নিবে। তাই গ্রামে মানুষ নাই, ভট্‌চাযের এই ইঙ্গিতে সে ভাবিল, হ্যাঁ সে তো ইহা বলিতেই পারে! বলিতেই পারে কারণ যারা তার স্ত্রীর পিছু নিবে তাদের সে কিছুই করিতে পারিবে না। স্ত্রীকে রক্ষা করা সম্পর্কে ইহারা অত্যন্ত ভীরু। মনের অন্তস্তলে নিজেদের এই চেতনা ইহারা প্রতিনিয়তই অনুভব করে। তাই ইহারা স্ত্রীর ঘাড়েই বদনামের বোঝাটুকু চাপাইয়া দিয়া নিজেদের সাহসিকতার প্রমাণ দেয়। তবে প্রথম অধ্যায়টায় ইহারা গ্রামে মানুষ নাই, এই অভিযোগই করে এবং সেই মুহূর্ত্তটিতে পাঁচজনের সাহায্যে রক্ষা পাইতেও ইহারা আগ্রহান্বিত। তাই সে কহিল, হ্যাঁ সে কথা তো বল্‌তেই পারি ভট্‌চায্যি মশাই। তবে যদি দেখি ব'য়ের দোষ আছে তা'লে দোষ দূর করে তাড়িয়ে—

আহা-আ সে হ'ল পরের কথা, ভট্‌চায কহিলেন, কিন্তু অতোখানি হ'তে দোব কেন আমরা? আমরা কি মরে গেছি?

—তা কেন?

—তবে! দ্যাখো গ্রামকে শাসন ক'রতে হবে। এই যে মদ তাড়ি খেয়ে মেয়েমানুষ নিয়ে এত কাণ্ড হ'য়ে গেল গাঁয়ে—এর প্রিতিকার ক'রতে হবে। যোগেশবাবু বল্‌ছিলেন, এসব কাজে তোদের প্রয়োজন হবে অত্যন্ত বেশি। এমন কথাও তিনি বলছিলেন যে তোদের যাত্রার দলটাকে যদি একাজে লাগানো যায় তাহ'লে আরও ভাল হয়। তার জন্যে যদি কিছু খরচ ক'রতে হয়, তা-ও তিনি ক'রতে রাজী!

যোগেশবাবু তাকে এতখানি উচ্চে স্থান দিয়াছেন, যোগেশবাবু তাদের যাত্রাদলের জন্য কিছু খরচ করিতেও প্রস্তুত—এসব কথা শুনিয়া ওপাড়ার প্রতি

পঞ্চুর রাগ পড়িয়া গেল এবং এতদিন সে এমনিতরো মানুষদের সংস্পর্শে আসিতে পারে নাই বলিয়া মনে মনে দুঃখ বোধও করিল। এ দুঃখের অপর নাম অনুশোচনা। মানুষ এ অবস্থায় আত্ম-সমর্পণ যে জিনিস তার চেয়েও বেশি কিছু করিয়া বসে। তাই সে কহিল, এ তো ভাল কথা!

ভট্‌চায পঞ্চুর মানসিক অবস্থা খানিকটা আন্দাজ করিয়া নিয়া বলিয়া উঠিলেন, শুধু ভাল নয়—গাঁয়ে যখন এমন কাণ্ড হয়ে গেল তখন এই গরমে গরমে আমাদের কাজ স্থরু ক'রে দেয়া উচিত!

হ্যাঁ, কি ক'রতে হবে বলুন, পঞ্চু একেবারে ধরা দিল।

ভট চায্ যেন একটু গম্ভীরভাবেই কহিলেন, কি ক'রতে হবে বল্‌লেই চল্‌বে না পঞ্চু। তোকে এখুনি একবার আমার সঙ্গে যোগেশবাবুর ওখানে যেতে হবে।

—বেশ আমি রাজী, চলুন—

এতখানি ভট্‌চায আশা করেন নাই। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল মানুষগুলিকে নিজেদের কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে পল্লীগ্রামে উচ্চশ্রেণী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এই বশীকরণ বিদ্যায় ভট্‌চায্ যে এতখানি পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিয়াছেন তা ভাবিয়া তিনি এক অননুভবনীয় আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন। উৎসাহভরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, শুভস্য শীঘ্রং—শুভস্য শীঘ্রং!

সাফল্যের আনন্দে মাতাল হইতে নাই, ইহা ভট্‌চায্ জানেন। তাই মনের আনন্দ তিনি আপাততঃ চাপিয়া রাখিয়া গোপালের উদ্দেশ্যে কহিলেন, তা'লে ঠাকুরমশাই আপনার বায়নাটির কি হবে?

গোপাল কীর্ত্তন গাহিয়াই দিন গুজরাণ করে। সে কহিল, আপনি দিতে চান এখুনি?

ভট্‌চায হাসিয়া কহিলেন, বল্‌লুম তো সবি—শুভস্য শীঘ্রং।

গোপাল হাসিল। ভট্‌চায একখানা কর্‌করে পাঁচ টাকার নোট ফতুয়ার

পকেট হইতে বাহির করিয়া গোপালের হাতে দিলেন। পঞ্চু বিস্ফারিত চক্ষু মেলিয়া নোটখানির দিকে তাকাইয়া কি যেন ভাবিল।

ইতিপূর্ব্বেই এ-ব্যাপারটি ঠিক হইয়া গিয়াছিল। গোপালকে হাতে রাখা তাঁদের প্রয়োজন। তা'ছাড়া তাঁরা যে কীর্ত্তনের বিরোধী নন, গোপালকে বায়না দেওয়াতেই তা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে না কি? এসব কথা আব্ছাভাবে, অস্পষ্টভাবে একবার পঞ্চুর মনের তলদেশে পাক খাইয়া গেল। পঞ্চু ভট্চাযের বশীকরণ বিদ্যার গণ্ডীতে আবদ্ধ!

অতঃপর ভট্চায কহিলেন, তাহ'লে আর দেরী নয়—পা বাড়া পঞ্চু—

পঞ্চু চট্ করিয়া একবার ঘরের ভিতরে স্ত্রী সৌরভের সহিত দেখা করিয়া আসিল।

ইহার পরবর্ত্তী দৃশ্য উঠিল—যোগেশবাবুর বোর্ড-অফিসে।

হলঘরে বোর্ডের অফিস। উত্তরদিক্কার দেয়ালে ভারতের মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের পরিপূর্ণ প্রতিকৃতি। দক্ষিণদিকে একটা বড় জাপানী দেয়াল-ঘড়ি। পূব ও পশ্চিমের দেয়ালে বাংলার গভর্ণর বাহাদুর ও মহকুমা হাকিমের সহিত করমর্দ্দন করা অবস্থায় যোগেশবাবুর নিজের দুইটি প্রতিকৃতি যথাক্রমে টাঙানো। তারপর পানা তোলার ছবি, খাদ্য-প্রাণ ভিটামিনের তালিকা, এ্যাণ্টি-ম্যালেরিয়ার ছবি, যক্ষ্মানিবারণী ও আদর্শ পল্লীগ্রামের পোস্টার প্রভৃতির দ্বারা চারিদিককার দেয়াল ভর্ত্তি। ঘরের মেঝেয় বড় বড় দুইটা পালিশ করা টেবিল, তার চারিদিকে কয়েকখানা চেয়ার। হলঘরের দরজা বাঁচাইয়া দেয়ালের গায়ে গায়ে কয়েকটা আলমারী। একদিককার কোণে কয়েকটা হুকে চৌকিদারদের দু-তিনটা নীল কোর্ত্তা ও ব্যাগ ঝুলিতেছে। আর একদিককার কোণে গোটাকয়েক টিউবওয়েলের মাথা পড়িয়া আছে। ভোটের সময় ওগুলা এক-একটা গ্রামে গিয়া বসে এবং সেই সেই জায়গার ভোটগুলা বাগাইয়া আনে। তারপর ভোটের ব্যাপার মিটিয়া গেলে আবার উঠিয়া আসে। কর্জ্জ দেওয়া টাকার মত ওগুলা সজীব।

ঘরের টেবিলে একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। যোগেশবাবু বসিয়া ছিলেন উত্তরদিককার একটা চেয়ারে। ভট্চায্, পঞ্চু ও গোপালকে নিয়া প্রবেশ করিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, অবশেষে ভট্চায এলে!

হ্যাঁ, বলিয়া ভট্চায যোগেশবাবুর পাশে গিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

পঞ্চু কোমর নোয়াইয়া যুক্তকরে যোগেশবাবুকে নমস্কার করিল। দেখাদেখি গোপাল-ও নমস্কার করিতে ভুলিল না। যোগেশবাবু ঘাড়টা ঈষৎ নাড়িয়া কহিলেন, ব'স পঞ্চু। তারপর গোপালের দিকে চাহিয়া টেবিল চাপড়াইয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

পঞ্চু ও গোপাল বসিলে যোগেশবাবু গোপালের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া এবং ভট্চাযের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এঁকে তো চিন্‌তে পারছি না ভট্চায!

এঁরই তো কেত্তনের দল, ভট্চায কহিলেন।

ও আপনিই, যোগেশবাবু বেশ অমায়িকতার স্বরে কহিলেন, খুব নাম শুনিচি আপনার মশাই। নমস্কার—নমস্কার!

গোপাল প্রতি-নমস্কার করিল। যোগেশবাবু কহিলেন, তা আমাদের যে কাল গান শোনাতে হবে আপনাকে!

সে তো ঠিক হয়ে গেছে, গোপাল গদগদভাবে বলিল, ভটচায্যিমশাই কি আর সে সব ঠিক ক'রতে কিছু বাকী রেখেছেন? মায় বায়না পর্য্যন্ত দিয়ে দিয়েছেন।

বটে! যোগেশবাবু ভট্চাযকে তারিফ করিলেন। তারপর সহসা দৃঢ় হইয়া কহিলেন, হ্যাঁ এদিকে রাত হয়ে যাচ্ছে, কাজের কথাটা সেরে ফেলি, কি বল ভট্চায?

বাস্তবিক রাত অত্যধিকই হইয়াছিল। ঘড়িতে তখন দুইটা বাজিয়াছে। ভট্চায সেদিকে একবার তাকাইয়া নিয়া কহিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ শুভস্য শীঘ্রং—

ভট্চাযের শুভস্য শীঘ্রং-এ যোগেশবাবু কর্ণপাত করিলেন না। তিনি

উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, গ্যাখো পঞ্চু, কাল হয়ত গ্রামে পুলিশ আস্‌বে এন্‌কোয়ারি করতে। কেননা যে জঘন্য কাণ্ড হ'য়ে গেল আজ, এর পর পুলিশ চুপ ক'রে থাক্‌তে পারে না।

যোগেশবাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া পঞ্চু কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ সে তো বটেই!

এবার টেবিলের উপর দুইহাতে ভর দিয়া যোগেশবাবু সাম্‌নের দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়িলেন এবং পঞ্চুর চোখে চোখ রাখিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, তোমাদের সব এন্‌কোয়ারিতে সাক্ষী দিতে হবে। সবাই সব সত্যি কথা বল্‌বে। কেননা, গ্রামের মঙ্গলের কথা, কল্যাণের কথা, আমাদের মা-বোনদের ইজ্জতের কথা এর মধ্যে রয়েছে—

—আজ্ঞে সে তো বটেই।

—কাজেই এই রকম মাতালের কাণ্ডকারখানা আমরা এম্‌নি এম্‌নি ছেড়ে দিতে পারি না, দেয়া উচিত-ও নয়। দারোগা এলে তোমরা সব সোজা ব'লে দেবে যে, এ সব মোদো-মাতালের কাণ্ড। নেশার ঝোঁকে সব মারামারি কাটাকাটি ক'রে মরেছে!

—আজ্ঞে তা বলতে হবে বৈ কি!

এবার যোগেশবাবু গোপালের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, ব্যস্‌ তাহ'লেই বদ্‌মাইস ঢিট্‌ হ'য়ে যাবে, কি বলেন গোপালবাবু?

নিশ্চয়ই, গোপাল সমর্থন করিল। যোগেশবাবু তারপর কণ্ঠস্বর খানিকটা গুরুগম্ভীর করিয়া কহিলেন, কিন্তু এই শুধু আমাদের কাজ নয়। গ্রামকে আমাদের গড়েপিটে ভাল ক'রে তৈরী ক'রতে হবে, দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন ক'রতে হবে। অতঃপর যোগেশবাবু খানিকটা থামিলেন—থামিয়া বোধহয় তাঁর শ্রোতার মনের প্রতিক্রিয়াটুকু লক্ষ্য করিলেন। তারপর আবার বলিলেন, এর জন্যে আমি কি ভেবিচি জানো পঞ্চু—গ্রামের সব যুবককে এক ক'রতে হবে। তা না হলে কোন কাজই হবে না।

যুবকরাই হ'ল দেশের ভবিষ্যৎ। একাজে তোমরা আমাকে সাহায্য ক'রবে ত ?

যোগেশবাবু প্রশ্ন করিলেন বটে কিন্তু পঞ্চুকে উত্তর দিবার কোন সুযোগ না দিয়াই বলিলেন, তা তোমরা সাহায্যই বা করবে না কেন? এতো কংগ্রেস টংগ্রেসের কাজ নয় ?

—সে তো বটেই।

অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরের লোকের কাছে ইহাদের মুখে এক সায় দেয়া ছাড়া অন্য কোন কথা আসে না। তাই 'সে তো বটেই' 'আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু' 'নিশ্চয়ই' প্রভৃতি অনুরূপ কথাগুলির দ্বারাই ইহারা ইহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। তার উত্তর পাইয়া যোগেশবাবু কহিলেন, সেজন্যে আমি ভাবছি তোমাদের যাত্রাদলটাকে এদিকে একটু-আধটু কাজে লাগাবো।

সে তো ভালই, পঞ্চু যেন একটু উৎসাহ সহকারেই বলিল। তার উৎসাহের কারণ আর কিছুই নয়—ইতিপূর্ব্বে কথাটা সে ভট্‌চাযের কাছে শুনিয়াছে এবং ইহাও শুনিয়াছে যে যোগেশবাবু এজন্য কিছু কিছু খরচ করিতেও প্রস্তুত। কাজেই সেই খরচটা অতি সহজেই তার হাতে আসিয়া পড়িতে পারে। এই জন্যই কি তার উৎসাহ নয় ?

যোগেশবাবু কহিলেন, তাহ'লে তোমাদের মত আছে তো ?

—নিশ্চয়ই !

ভট্‌চায এবার শেষ প্যাঁচ দিলেন। নাটকের স্বগতোক্তির মত তিনি আপন মনেই বলিয়া উঠিলেন, ওপাড়ার মধ্যে এই ছেলেটাই যা একটু বুঝদার, তা নাহ'লে—

যোগেশবাবু ভট্‌চাযের কথাটাকে লুফিয়া নিয়া কহিলেন, সে কথা আমার অজানা নেই ভট্‌চায। ওর বাবা যখন বেঁচে ছিল—আহা-আ অমন মানুষ হয় না! সেরকম লোকই আজকাল দেখতে পাই না। দিনরাত বেচারা আমার বোর্ড অফিসেই পড়ে থাকৃতো! বল্‌তাম ঘোষের-পো চাষ-আবাদ

যাবে যে! সে একটু হেসে আকাশের দিকে তাকাতো অর্থাৎ তার ভগবান।

পঞ্চু অভিভূত হইল।

যোগেশবাবু কহিলেন, আর কি এদের বল্‌ব ভট্‌চায ?

ভট্‌চায গোপালকে একটা বিড়ি দিয়া নিজেও একটা ধরাইয়া কহিলেন, না না এদের আবার এত কথা বলা কি! এরা মোদো-মাতাল নয় যে এদের সঙ্গে বক্‌তে হবে।

যা' বলেছ, যোগেশবাবু কহিলেন, তাহ'লে গোপালবাবু মিছিমিছি কষ্ট দিলাম—

—কষ্ট আর কি!

—যাই হোক্‌, কাল পুলিশ যদি আসে, তাহ'লে বল্‌বেন ঐ কথা। আর সন্ধ্যেয় গান শুনিয়ে যাবেন—

—যে আজ্ঞে।

ভট্‌চায উঠিয়া পড়িলেন। গোপাল ও পঞ্চু, ভটচায ও যোগেশবাবুকে নমস্কার করিল। তখনও রক্ষাকালী পূজার ওদিকে মদ্যপায়ীদের কলরব চলিতেছিল। গোপাল জিজ্ঞাসা করিল, ওখানে আবার হল্লা কিসের?

উত্তর দিলেন যোগেশবাবু। বলিলেন, ঐ এক ব্যাপার মশাই! তারপর ইসারায় ভট্‌চাযকে বলিয়া দিলেন, উহাদের সঙ্গে যাইতে। কারণ যোগেশবাবু চান না যে উহারা ঐ কালী পূজার উৎসব দেখুক। কারণ-বারির জন্য অনেকগুলি পয়সা তাঁর খরচ হইয়াছে। খরচ যা' হইবার তা তো হইয়াছেই, তার উপর আবার ফাঁস হইয়া পড়িলে, সবই মাটি হইয়া যাইবে।

রাত্রির এই ঘটনায় পঞ্চু ও গোপাল বিগড়াইয়াছে। গোপালের বিগড়ানোটায় অবশ্য ততখানি যায় আসে না যতখানি যায় পঞ্চুর বিগড়ানোতে। গতরাত্রে যে ছিল দক্ষিণহস্ত, বর্ত্তমানে সে শত্রু! ইহা ভাবিতেও যেন কেমন লাগে! এবং যা' কিছু ক্ষতি শ্রীপতিরই হইবে, এইজন্যই হইবে।

সেই কল্পিত ক্ষতির কথা ভাবিতে ভাবিতে শ্রীপতি যতই উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল ততই সে পঞ্চুকে বাহির করিয়া দিবার জন্য জনতাকে আদেশ করিতে লাগিল।

কিন্তু আদেশ মানিবে কে? লোকের মধ্যে জটলা চলিতে লাগিল।

যত সহজে সে পঞ্চুকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিবার কথা বলিয়াছে, ঠিক তত সহজেই সে গোপালকে বলিতে পারে না। গোপাল এস্থলে পাওনাদার। যেভাবে সে বিগড়াইয়াছে তাতে সে হয়ত ফৌজদারীও করিয়া বসিতে পারে। তাই সে মিনতি করিয়া কহিল, আপনাদের সব দোষ—একটু সবুর ক'রতে হবে। আগে তদন্তটা হয়ে যাক্।

কুসুম দরজার মুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ক্রোধে ফুঁসিয়া উঠিতেছিল। পঞ্চু ও-পাড়ার টাকা খাইয়াছে, বিশ্বাসঘাতককতা করিয়াছে এবং এখন তার নামে অপবাদ রটাইয়া বলিতেছে মেয়েমানুষ নিয়া এই কাণ্ড! রাগে দুঃখে ও অপমানে সে আহতা ফণিনীর মত মনে মনে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

কেহই পঞ্চুকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিয়া আসিল না। সকলে মিলিয়া কেবল হট্টগোল করিতে লাগিল। এমন অনেক লোক আসিয়াছে, যারা শুধু মজা দেখিতেই চায়। তারা পঞ্চু বেশ মজাদার লোক দেখিয়া তার দলে ভিড়িয়া গেল। পঞ্চু বেশ রীতিমত একটা দল পাকাইয়া বাড়ীর বাহিরে দরজার সাম্‌নে পাল চাপা হরিসভার প্রাঙ্গণে ঘোঁট পাকাইতে লাগিল।

বলাই সারারাত কুসুমকে জ্বালাতন করিয়া কোথায় যেন গিয়াছিল, হন্তদন্ত হইয়া আসিয়া সে খবর দিল, দারোগাবাবু আসিতেছেন।

সকলে বাহিরের দিকে ছুটিল।

৬

সেই আদর্শ গ্রামের জমি।

শশী ও বিজয় সকাল হইতেই লাঙ্গল দিতে ব্যস্ত। বিঘা সাতেক জমি ইতিমধ্যেই লাঙ্গল দেয়া হইয়া গিয়াছিল।

আদর্শগ্রামের আবাদী জমির পরিমাণ বড় কম নয়। ইতিমধ্যেই বন-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া যা' দাঁড়াইয়াছে তা-ই প্রায় দুইশত বিঘার মত। এখনও বাহির হইবে প্রায় শ-দুই বিঘা। সর্ব্বপ্রথম বিঘা কুড়ি জমি পাওয়া গিয়াছিল, তাই পরীক্ষামূলক ভাবে আবাদ করিয়া পরবৎসরে তদনুযায়ী চাষ করা হইবে।

এই আদর্শগ্রামের আবাদ প্রভৃতি ব্যাপারের একটা ইতিহাস আছে। ভারতবর্ষে উনিশ-শো পঁয়ত্রিশ সালে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন করিয়া তথাকথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন চালু করা হয়। এই স্বায়ত্বশাসনের অর্থ ভারতবাসী মাত্রেই জানে। প্রভুর হাতের শৃঙ্খলাবদ্ধ সারমেয়ের মত এই স্বায়ত্বশাসনের দৌড়।

সেই দৌড়েরই একহাত খেল এই আদর্শগ্রামের পরিকল্পনা। এদেশের পল্লীগ্রামের নাকি শ্রীছাঁদ নাই এবং পল্লীগুলির ব্যবস্থাও নাকি অত্যন্ত খারাপ। সেজন্য শ্রীছাঁদ ও উত্তম ব্যবস্থা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মন্ত্রিমণ্ডলী এক খসড়া করিয়া বসিলেন। সেই খসড়া প্রধানতঃ এইভাবে স্থির করা হইল—সমস্ত জঙ্গল পরিষ্কার, চষদ জমি ও বসত জমি পৃথক করিয়া বস্তির আকারে সারি সারি লোকে বাড়ী তুলিবে, অনেকটা 'ব্লক-সিস্টেম' অনুযায়ী আধুনিক শহর যেভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, সেইভাবে। তার একদিকে থাকিবে বারোয়ারীতলা, পুকুর, পাঠশালা, ছেলেদের খেলাধূলার মাঠ ইত্যাদি।

এতদুদ্দেশ্যে বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী অজস্র ছবি ছাপিয়া গ্রামে গ্রামে বিলি করিয়া দিলেন। হঠাৎ দেখিলে পরিকল্পনাটা ভালই লাগিবে। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে ইহার অন্তঃসারশূন্যতা বেশ বুঝা যায়। রাতারাতি বন-জঙ্গল সাফ করিয়া, লোকের বাস উঠাইয়া, গ্রাম, পথঘাট সব তছ্‌নছ্‌ করিয়া দিয়া ছবির মত করিয়া আদর্শগ্রাম তৈরী করার কল্পনা এই দরিদ্র দেশে যে কতখানি অবাস্তব তা সহজেই বুঝা যায়।

যোগেশবাবুদের ইউনিয়নবোর্ড এতদঞ্চলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী বোর্ড। তাঁরা এই ব্যাপারটাকে রীতিমতভাবে গ্রহণ করিলেন এবং তদনুযায়ী কিছু পশ্চিমী মজুর লাগাইয়া, গাঁয়ের কিছু লোককে বেগার খাটাইয়া এই আদর্শ-গ্রামের পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে খানিকটা অগ্রসরও হইলেন। বর্ষা আসিল—যদিও বৃষ্টি হইল না—তথাপি প্রথম বৃষ্টির সুযোগেই চাষ-আবাদ করিতে পারিলে জমিগুলা পড়িয়া থাকে না। তা ছাড়া সরকার হইতে গাঁয়ে গাঁয়ে পোস্টার মারা হইয়াছে, 'অধিক খাদ্য শস্য ফলান', 'যদি বাঁচতে চান—ধানের চাষ বাড়ান'; তাই যদি সরকারী প্রচার-পত্রের এই নির্দ্দেশটুকু কিছু-ও পালন করা যায় সেজন্য আবাদের এই ব্যবস্থা।

প্রতিদিন লাঙ্গল বেচায় দেড়টাকা ও মজুরী স্বরূপ একটাকা নিয়া বিজয় ও শশী কাজ করিবার চুক্তি করিয়াছিল—তাই আজও কাজ করিতে আসিয়াছে। অবশ্য শুধু যে তারাই আসিয়াছে তা নয়—উত্তরপাড়ার পরমেশ, জীবন প্রভৃতিরাও আসিয়াছে। তাদের কাজ করিতে আসার হয়ত কোন অর্থ আছে। শশী ও বিজয় কি করে না করে, তার উপর দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন যে যোগেশবাবু, নফর ভট্‌চায প্রভৃতি অনুভব করেন, সে কথা না বলিলেও চলিবে।

প্রথম দিক হইতেই তারা চাপিয়া কাজ করিতেছিল। কথা কহিবার ফুরসুৎ পর্য্যন্ত পায় নাই। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শশীর মেয়ে ধ্বনি এবং বিজয়ের মা-বুড়ী জলপান ও গরুর জাব নিয়া আসিল। গরুগুলাকে খাওয়াইয়া

এবং নিজেরা খাইয়া বিজয় তামাক ধরাইল। তামাক ধরাইয়া বিজয় মাকে প্রশ্ন করিল, হ্যাঁগা কিছু শুন্‌লে ওদিকে ?

—কি-ই ?

—এই কুসুমদের ওখানে ?

—পথে আস্‌তে আস্‌তে শুনন্থ তো দারোগা এসেচে। কুসুমের এজাহার নেয়া হ'চ্ছে।

—খুব লোক জমেছে ?

—উঃ সে আর বল্‌তে—নোকে নোকারণ্য হয়ে গেছে একেবারে।

বিজয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, অথচ কাল রাতে এই লোকগুলো যে কোথায় ছিল, তাই শুধু ভাবি।

এমনিই হয় বাবা, মা ফিরিবার উদ্দেশ্যে শশীর মেয়ে ধ্বনিকে ডাকিয়া কহিল, আয় গো ধ্বনি ! তারপর তাকে নিয়া বুড়ী চলিয়া গেল।

তামাক খাইতে খাইতে গল্প চলিল—গত রাত্রির ভয়াবহ দুর্ঘটনার গল্প। শশী এসব সাতে পাঁচে থাকিতে ভালবাসে না। সে কীর্ত্তন শুনিতে পর্য্যন্ত যায় নাই। তবু গতরাত্রির ব্যাপারে সে-ও মর্ম্মাহত কিন্তু তার দিক হইতে সে কি-ই বা করিতে পারে ? কিছু করিতে পারুক আর না পারুক, ব্যাপারটা যে শোচনীয় সেকথা তো অস্বীকার করা যায় না এবং তজ্জন্য যাদের বিবেক বলিয়া কোনকিছু আছে তাদের কথা কহিতেই হয়। তাই সে বলিল, মানুষ যে মানুষের ওপর এরকম অত্যাচার করতে পারে, এ আমি ভাবতেও পারি না।

কেই বা ভাব্‌তে পারে খুড়ো, বিজয় কহিল, তবু এইসব অমানুষিক অত্যাচার মানুষের ওপর মানুষ করে।

হুঁ, শশী বলিতে লাগিল, এসময় ঘনশ্যামটাও যদি থাকৃত !

—কিন্তু জ্যাঠা কোথায় গেছে বল তো ?

—কি জানি মাঝে মাঝে যে কোথায় যায় !

যেখানেই যাক্ লোকটা যে কোন অসৎকর্ম্মে যায় নাই, একথা ঠিকই। এবং তা যখন নয় তখন নিশ্চয়ই কোন জরুরী দরকারেই গিয়াছে আর যাইবার সময় সে কথা বলিয়া যাইতে পারে নাই। সে জন্য সপ্রশংসভাবে বিজয় কহিল, সে কাজের লোক খুড়ো—সময় পায়নি।

হ্যাঁ তা ঠিকই, শশী কহিল, সে থাক্‌লে আর একাণ্ডটা ঘট্‌ত না!

সেকথা পাঁচশোবার, বলিয়া বিজয় ক্ষেতে নামিল। শশীও হুঁকা রাখিয়া তাকে অনুসরণ করিল। ক্ষেতে নামিতেই বিজয় শুনিতে পাইল পরমেশ ও জীবন গতরাত্রির কথাই চাপাগলায় আলোচনা করিতেছে। পরমেশ বলিতেছিল, ছুঁড়ির কাল অঙ্গে আবরণ পর্য্যন্ত ছেল না—এত বেহেড্ হয়ে গেস্‌লো।

জীবন কহিল, মাইরি!

উহাদের আলোচনার ধারা দেখিয়া বিজয় জ্বলিয়া উঠিল। সে প্রশ্ন করিল, হ্যাঁরে পরমেশ তুই দেখিছিলি?

পরমেশ চম্‌কাইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলাইয়া নিয়া কহিল, আমি আর কি ক'রে দেখ্‌ব—আমি তো যাইনি।

—তুই কোথা ছিলি তবে?

—আমি তো ভাই কালীঠাকুরের সামনে মদ খেয়ে পড়ে রইলুম। ও শালারা আমাকে ফেলে পালালো।

—তাহ'লে ব্যাপারটা ওদের মুখেই শুনিচিস্?

—হ্যাঁ।

—তবে ওসব শোনা কথা ছেড়ে দে না—

কিন্তু ইহা ছাড়িয়া দিতে পল্লীগ্রামের মানুষ পারে না। কারণ ইহাদের অশিক্ষিত মনে, অতৃপ্ত যৌনক্ষুধার চাপ অত্যন্ত তীব্র। সেই তীব্রতার আবেগে ইহারা মেয়েদের কুৎসা, তা সত্য হোক্ বা মিথ্যা হোক্, রটাইতে বড় ভালবাসে। ইহাতে তারা তৃপ্তি পায়। তাই পরমেশ কহিল,

ওসব কথা ছেড়ে আমি দিয়িছি—পাঁচজনে এইসব বলাবলি ক'রছে ব'লেই বল্‌ছি।

ক্ষেতে নামিয়া আবার কাজ সুরু হইল। অনাবাদী জমি কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া নিষ্ফলা হইয়া পড়িয়াছিল। বছরের পর বছর অতিবাহিত হইয়াছে, কখনও আগাছা জন্মাইয়াছে এখানে, কখনও জন্মাইয়াছে গুল্ম-লতা-তৃণ, কত সাপ-খোপ, বন্যজন্তু বাসা বাঁধিয়াছে, নির্ব্বিবাদে করিয়াছে জীবনযাত্রা অতিবাহিত—তাই এ জমি লাঙ্গলের সহিত পরিচিত নয়, আর নয় বলিয়াই লাঙ্গলের কঠিন ফলার আলিঙ্গন তেমন জমে না। শুধু কি তাই—ঠিক্‌রাইয়া পড়ে জমির বুক হইতে। তবু সংগ্রাম করিতে হইবে এই জমির সঙ্গে। কারণ ইহাতেই তাদের ভাত-কাপড়-জীবিকা।

কিন্তু বিজয় আর তেমন করিয়া কাজে মন দিতে পারিতেছে না। মাথার উপরে খাঁ-খাঁ করিতেছে আকাশ। কোথাও এতটুকু মেঘের চিহ্ন মাত্র নাই। রৌদ্র-ঝলসিত দেহটা যেন উত্তপ্ত পাথরের মত তাতিয়া উঠিয়াছে। তবু বিজয়ের যেন সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। এসব কিছু অতিক্রম করিয়া তার চোখের সুমুখে ভাসিয়া উঠিতেছে, গতরাত্রির পৈশাচিক বীভৎসতা, মনে পড়িতেছে কুসুমের গৃহদাহ, মনে পড়িতেছে অসহায় এক নারীকে বিপদের মাঝে ফেলিয়া রাখিয়া আর সব লোকের পলায়নের কাহিনী। ঠিক তারি পাশাপাশি তার মনে পড়িতেছে, অন্যকার ঘটনাবলী। হরিসম্ভ্রম দারোগা আসিয়াছে, কুসুমের এজাহার লওয়া হইতেছে, স্থানটা লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। আর সে লোকগুলা নিশ্চয়ই পরমেশের মত কল্পনা করিতেছে ও বলাবলি করিতেছে—'ছুঁড়ির কাল অঙ্গে আবরণ পর্য্যন্ত ছিল না—এত বেহেড্‌ হ'য়ে গেস্‌লো।' এইসব কথা ভাবিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিতেছিল না—কেবলই তার মনটা কুসুমের ওখানে যাই-যাই করিয়া উঠিতেছিল।

সুযোগও মিলিয়া গেল। দূরে কুসুমের মতই যেন কে আসিতেছিল। অবশ্য বিজয় তাকে দেখিতে পায় নাই—দেখিতে পাইয়াছিল পরমেশ। সে

দেখিতে পাইয়াই নিজের ক্ষেত হইতে বিজয়ের ক্ষেতে আসিয়া কহিল, হ্যাখদিকি বিজয় কুসুমের মত যেন কে আস্‌ছে না ?

বিজয় দূরে তাকাইয়া দেখিল। কর্ম্মান্তে গৃহ-প্রত্যাগত কৃষকের দল বাড়ী ফিরিতেছে, তাদের গরুগুলার ক্ষুরের ধূলায় মাঝে মাঝে একটি স্ত্রী মূর্ত্তি কখনও অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে, কখনো আবার স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকটি যে কুসুম তা বিজয় নিশ্চয় করিয়া ধরিয়া নেয় কি করিয়া ?

পরমেশ উৎসুকভাবে বলিয়া উঠিল, ছুঁড়ি কোথায় যাচ্ছে বলদিকি ? পালাচ্ছে নাকি !

বিজয় এসব কথার কোন উত্তর দিল না। উত্তর দিবার মত তার মনের অবস্থাও নয়। সে ভাবিতেছিল, ঐ স্ত্রীলোকটি যদি কুসুমই হয় তবে সে এই সময়ে আসিতেছে কেন ? সহসা তার মনে হয়—গত রাত্রির বীভৎসতা অপেক্ষাও কি কোন ভয়ানক কাণ্ড ঘটিল নাকি ? হইতেও পারে, অসম্ভব কিছু নয়।

পরমেশ তার নিজের কথার জের টানিয়া বলিতে লাগিল, তা না পালিযে আর করেই বা কি—যে কাণ্ড কাল ক'রেছে ছুঁড়ি !

বিজয় বিরক্তভরে ফুঁসিয়া উঠিয়া কহিল, কাণ্ডটা কি ক'রেছে শুনি ! দল বেঁধে সবাই তার ওপর অত্যেচার করলে—দোষ তাদের হ'ল না, দোষ হ'ল কুসুমের ?

তা আমি জানি না ভাই, পরমেশ কহিল, সবাই বলছে আমি শুনুনু— তাই বলছি।

শোনা কথার আবার দাম কি, বলিয়া বিজয় আবার আগত স্ত্রীলোকটির দিকে তাকাইল। এবার সে স্থির হইল যে সে কুসুম। কুসুম না হইলে অমন হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিবে কেন ? কিন্তু সে আসিতেছেই বা কেন ? একসঙ্গে তার মাথায় অনেক কথা ভিড় করিয়া আসিল এবং চক্ষু দুইটা সজল হইয়া উঠিল। অত্যাচারিতের প্রতি স্বাভাবিক দরদেই মানুষের চক্ষু হয়ত এমনি-ভাবেই সজল হইয়া উঠে। বিজয় বাঁ হাতের কনুইয়ে চোখ দুটা মুছিয়া নিল।

কুসুম কাছে আসিতেই বিজয় কয়েক-পা আগাইয়া গেল। কুসুম ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিজয় কোন কথা বলিতে পারিল না। কুসুম নিজেই বলিয়া উঠিল, তুমি পারো তো এ বদ্‌নাম থেকে আমায় বাঁচাও—তা না হ'লে বেঁচে থাকা আমার মিছে।

বিজয় কহিল, তা আমাকে কি ক'রতে হবে বলো না?

আমাকে দশচক্রে ভূত বানিয়েছে, উচ্ছ্বসিতভাবে কুসুম কহিল, তুমি আমাকে বাঁচাও—

বাঁচাও বাঁচাও তো খালি বল্‌ছ, বিজয় এবার যেন খানিকটা বিরক্তিভরে কহিল, কি ক'রতে হবে তাই বলো না! এটা বাড়ী নয়, মাঠ—এখানে তোমার কান্না শুনে কারো মনে এতটুকু দয়ামায়া আস্‌বে না, লোকে বরঞ্চ এই নিয়ে আরো হাসাহাসি ক'রবে।

বটেই তো, পিছন থেকে পরমেশ কহিল।

বিজয় পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল, পরমেশ কখন পায়ে পায়ে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। শুধু পরমেশ নয়, জীবন ও শশীও আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা পল্লীগ্রামের রীতি। রহস্যজনক কিছু দেখিলে তারা পায়ে পায়ে এমনি করিয়াই পিছনে আসিয়া দাঁড়ায়।

কুসুম এবারে যেন খানিকটা প্রকৃতিস্থ হইল। দুঃখের অপার সমুদ্রে মানুষ সমব্যথীর দেখা পাইলে অতিসহজেই বক্তব্যের মধ্যে আতিশয্যের ভাব আনিয়া ফেলে। কুসুমও তাই করিয়া ফেলিয়াছিল। এবার পরমেশ, জীবন ও শশীকে আসিতে দেখিয়া সে মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া গলার স্বর নীচু করিয়া কহিল, এখনো বাবুদের ওখানে দারোগাবাবু আছেন—তাকে শুধু তুমি জানিয়ে দিয়ে এসো কুসুম আর যাই হোক্—কুসুম মেয়েমানুষ, বদ্‌নাম সে সইতে পারবে না।

তাতে লাভ কি, বিজয় জিজ্ঞাসা করিল।

কুসুম কহিল, লাভ হয়ত তাতে কিছু হবে না কিন্তু একটা জিনিষ লোকে

জান্‌বে, কুসুম অনাথিনী নয়। ঘনশ্যাম জ্যাঠার কাছে গেস্‌লুম কথাটা বল্‌তে —তা' সে বেচারী এই ফিরল, তারও যেন আবার কি সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে।

—জ্যাঠার আবার কি হ'ল ?

—তা ঠিক বল্‌লে না। শুধু বল্‌লে তো মার কাছে আসতে।

হুঁ, বিজয় কি যেন ভাবিতে লাগিল। তাকে এইভাবে চিন্তা করিতে দেখিয়া কুসুম বলিয়া উঠিল, তা সে যাই হোক্‌ —দ্যাখো ভবিষ্যতে আমায় বেঁচে থাকতে হবে। তারপর এইটুকু হবে যে লোকে আমাকে অনাথিনী ভেবে আমার ওপর কোন অত্যেচার ক'রতে পারবে না।

কুসুমের এই কথায় বিজয়ের সুমুখ হইতে একটা পর্দ্দা সরিয়া গেল। মেয়েমানুষ যদি অনাথা হয় তবে আমাদের সমাজের বীর-পুরুষেরা বীরত্ব প্রদর্শনের অপর কোন ক্ষেত্রই আর খুঁজিয়া পায় না। কুসুম হয়ত এই দিকটাতেই ইঙ্গিত করিতেছে। বিজয়কে চিন্তান্বিত দেখিয়া কুসুম কহিল, আমার যা' যাবার তা গেছে কিন্তু এখনো যা' আছে তা রক্ষে করা যাবে; কেননা এখনো তা শুধু কথার ওপরেই আছে, কাজে হয়নি। এরপর যদি দল বেঁধে সত্যিই আমার ওপর কোনদিন হাম্‌লা করে তবে আমার সব যাবে —সব, সব!

বিজয় আর দ্বিরুক্তি করিল না। কহিল, আচ্ছা তুমি যাও—আমি বাবুদের বাড়ী হ'য়ে যাচ্ছি—

তাহ'লে আর দেরী ক'র না, বলিয়া কুসুম ফিরিল।

পরমেশ কহিল, ছুঁড়ির বুদ্ধি আছে বাবু—

হুঁ, জীবন সমর্থন করিল।

বিজয় লাঙ্গল হইতে গরু খুলিয়া, গরুর মুখে জাল্‌তি পরাইয়া দিল। তাকে তাড়াতাড়ি যাইতে হইবে, গরুগুলা কোথায় ঘাসে কি জলে মুখ দিবে, তাই এই জাল্‌তি পরানো। তারপর লাঙ্গল কাঁধে তুলিয়া নিয়া শশীর উদ্দেশ্যে কহিল, খুড়ো আমি এগুলুম—পার তো এসো।

পরমেশ কহিল, চ' আমরাও যাচ্ছি।

জীবন সহসা পুলকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, লে হালুয়া!

ওদিকে তদন্ত শেষ করিয়া দারোগা কনেষ্টবল এবং আরও অনেকে যোগেশ-বাবুর বোর্ড-অফিসে আসিয়া উপস্থিত হইল। পূর্ব্বাহ্ণেই চৌকিদার, দফাদারদের দ্বারা ডাব পাড়াইয়া এবং সাইকেল করিয়া দূর তারকেশ্বর হইতে সন্দেশ ও বরফ আনাইয়া রাখা হইয়াছিল। উহারা আসিতেই ভট্চাষের তত্ত্বাবধানে ডাব কাটা হইতে লাগিল, প্লেটে সন্দেশ সাজানো হইল, কলিকাতা হইতে আনাইয়া রাখা 'ব্যানানা' সিরাপের সহিত ঘোল মিশাইয়া তাতে বরফ দেওয়া হইল। তারপর গ্লাসে গ্লাসে সরবৎ ভরিয়া আলমারী হইতে স্ট্র-পাইপ বাহির করিয়া প্রত্যেক গ্লাসে এক-একটি করিয়া দেওয়া হইল।

যোগেশবাবু ঘটনাস্থলে যান নাই। পল্লীগ্রামে যে-সব লোক নিজেদের দেমাকওয়ালা বলিয়া মনে করে তারা কখনও যাচিয়া ঘটনাস্থলে যায় না, উচ্চপদস্থ কেহ সেখানে আসিয়া তাদের ডাকিলে তবেই তারা যায়। যোগেশ-বাবু যে বিশেষভাবে দেমাকওয়ালা লোক তা ঘরের দেয়ালে লাটসাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর করমর্দ্দনের ছবিগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। তা ছাড়া তাঁর যাইবার প্রয়োজনই বা কি? তাঁর নিজস্ব লোক আছে, আছে ভট্চাষ, টাকার কুমীর অধর কুণ্ডু, ডিঙিবাৎপুরের ইব্রাহিম, আর আছে তাঁর হোমোজিনিয়স্ বোর্ডের অন্যান্য সদস্য। ঐসব লোকেরাই তাঁর কাজ করিয়া দিবে, তাঁর কোন ভাবনা নাই।

দারোগাবাবু প্রভৃতি আসিতেই বাড়ীর ভিতরে যোগেশবাবুকে খবর দেয়া হইল। যোগেশবাবু বাহিরে আসিতেই দারোগা কনেষ্টবল প্রভৃতি সকলেই দাঁড়াইয়া উঠিল। নমস্কার বিনিময় হইবার পর যোগেশবাবু কহিলেন, আপনি এসেছেন তা আমি শুনেছি কিন্তু কাজের ঝঞ্ঝাটে যেতে পারিনি।

কি ব্যাপারই বেধেছে স্যার গ্রামে, বলিয়া দারোগাবাবু হাসিলেন। যোগেশবাবু কহিলেন, আর দিন-রাত্তির এদের নিয়েই আমাকে সময় কাটাতে হয় মশাই!

হরিবল্, দারোগাবাবু বলিলেন।

যোগেশবাবু আসন গ্রহণ করিতেই ভট্‌চায তাঁর লোকজনকে ডাব সন্দেশ প্রভৃতি দিতে নির্দ্দেশ করিলেন। জন দুইকে হাতে পাখা দিয়া দারোগাবাবুদের বাতাস করিতে বলিলেন।

কনেষ্টবল ছিল তিনজন। একজন জমাদার। জমাদার দারোগার পেয়ারের লোক বলিয়া দারোগার পাশে একখানা চেয়ারে বসিয়াছিল। আর কনেষ্টবল তিনজন বসিয়াছিল পিছনের একখানা বেঞ্চে। সন্দেশ খাইতে উহাদের অসুবিধা হইবে বলিয়া ভট্‌চায যোগেশবাবুর কানে কানে সেকথা বলিয়া দিলেন। যোগেশবাবু তদনুযায়ী কনেষ্টবলদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, আপ্‌লোগ কুর্শিপর বৈঠিয়ে—

দারোগা তাদের বড়বাবু। বড়বাবুর সামনে কুর্শিতে বসা রীতিমত একটা বেয়াদপি। সেকথা কনেষ্টবলরাও যেমন বোঝে, তেমনিই বোঝেন দারোগাবাবু। অথচ যোগেশবাবু যখন তাদের চেয়ারে বসিতে বলিলেন তখন তাদের দিক হইতে বসাই উচিত কিন্তু যতক্ষণ না তাদের প্রত্যক্ষ দেবতা বড়বাবু বলেন ততক্ষণ তারা বসে কি করিয়া? জমাদার বড়বাবুর পেয়ারের লোক বলিয়া তাঁর পাশে বসিতে পারিয়াছে, তা না হইলে তার বসা উচিত নয়। দারোগাবাবু তাদের এই অবস্থাটা বুঝিতে পারিয়া এবং যোগেশবাবুর কথার সম্মান রক্ষার্থে বলিয়া উঠিলেন, ব'স না তোমরা।

অতঃপর তারা বসিল। সঙ্গে সঙ্গে সন্দেশের প্লেট ও ডাবের জলের গ্লাস আসিয়া পড়িল। কনেষ্টবলরা এতক্ষণে কুর্শিপর বসিতে বলার অর্থ বুঝিল। তাদের ভাগ্যে কদাচিত এরূপ অভ্যর্থনা ঘটে, কাজেই তারা পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল। দারোগাবাবু বলিলেন, এসব ক'রেছেন কি স্যার?

কি আর সামান্যই একটু জলযোগ, ঈষৎ হাসিয়া যোগেশবাবু কহিলেন, তারপর গাঁয়ের ব্যাপার কি রকম বুঝলেন বলুন তো ?

একটা সন্দেশ তুলিয়া নিয়া দারোগাবাবু বলিলেন, স্রেফ মেয়েমানুষ নিয়ে ব্যাপার স্যার।

আমারও তাই মনে হয়, যোগেশবাবু সমর্থন করিলেন। ভট্‌চায ইত্যবসরে যোগেশবাবুর পাশে একটা চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। গলায় হরিনামের মালা জড়ানো, সতিলক ও মুণ্ডিত মস্তক অধর কুণ্ডু ভিড়ের ভিতর হইতে সহসা যেন উদয় হইল এবং দারোগাবাবু ও যোগেশবাবুকে নমস্কার করিয়া কহিল, এমন না হ'লে দিন—একসঙ্গে আপনাদের দর্শনলাভের সৌভাগ্য !

আরে ব'স ব'স কুণ্ডু, যোগেশবাবু নিজের অপর পাশে তাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। অধর বসিতে বসিতে কহিল, তারপর দারোগাবাবু অনেকদিন পরে যে ইদিকে ?

কি করি বলুন না, দারোগাবাবু কহিলেন, এতবড় এলাকাটায় কাজ কি কম ?

—বেশ ভাল আছেন ?

—তা আপনাদের আশীর্ব্বাদে আছি একরকম।

—বেশ বেশ। গেরামে সব দেখলেন কিরকম ?

—সেই কথাই তো হচ্ছিল এতক্ষণ !

—বটে !

দারোগাবাবু সন্দেশ খাইতে খাইতে বাঁহাতের তর্জ্জনী দিয়া ভট্‌চাযের দিকে ইঙ্গিত করিলেন, ভটচায্যি মশাই ছিলেন তাই বেঁচে গেছি আজ।

—কিরকম ?

—ওঁর জন্যেই তো সব ফ্যাক্টগুলো উদ্ধার ক'রতে পারলাম।

—তাই নাকি ?

ভট্চায কহিলেন, ওকথা বল্বেন না দারোগাবাবু। উদ্ধার আমিও করিনি, আপনিও করেননি।

যোগেশবাবু ভ্রূ কুঁচকাইয়া কহিলেন, এ কি রকম কথা তোমার ভট্চায্?

কি রকম আবার কি, ভট্চায্ কহিলেন, উদ্ধার ক'রেছে দারোগাবাবুর চাপরাশ।

যোগেশবাবু দারোগাবাবু প্রভৃতির হাসিতে ঘর ফাটিয়া পড়িবার জো হইল। ঘরের ভিতর আরও অনেক লোক ছিল, তারাও হাসিয়া ফেলিল। বস্তুতঃ 'চাপরাশ' কথাটি ভট্চায্ এমন ভঙ্গীতে বলিয়াছিলেন যে কারও না হাসিয়া থাকিবার উপায় ছিল না। দারোগাবাবু বলিলেন, একজ্যাক্টলি! আপনি ঠিক বলেছেন। চাপরাশ না হ'লে আমাদের দেশে কোন কাজ হয় না।

যোগেশবাবু বলিলেন, প্রায় তাই—

ভট্চায্ এদিক ওদিক তাকাইয়া নিজে যে সাচ্চা কথা বলিতে পারেন তারই একরকম অভিব্যক্তি দ্বারা কহিলেন, যা' বল্ব—আমার নাম নফর ভট্চায!

ডাবের জলটা একচুমুকে শেষ করিয়া দিয়া দারোগাবাবু রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, আচ্ছা ঐ কুসুম মেয়েটার কি ক্যারেক্টার খারাপ?

শুনি তো নানারকম কথা, যোগেশবাবু কহিলেন, অবশ্য আমার ওসব ব্যাপার জানবারও সময় হয় না—তা ছাড়া ওসব ব্যাপারে আমি ইনটারেস্টেডও নই!

সে তো বটেই, দারোগাবাবু আরও যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু অধর তাঁকে বাধা দিয়া কহিল, ক্যারেক্টার মেয়েটির চূড়ান্ত রকমের খারাপ। তারপর হাই তুলিয়া বলিল, গোবিন্দ বল মন—গোবিন্দ বল!

ভট্চায হাঁকিলেন, ওরে সরবৎ দিয়ে যারে—

হ্যাঁ আমারও সব কিছু শুনে টুনে সেই ধারণাই হ'ল, দারোগাবাবু কহিলেন।

বাবু! সহসা ঘরের দরজায় কার যেন কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইল। সকলে চমকাইয়া উঠিল। 'বাবু' শব্দটা যেন একটু বে-সুরোই মনে হইল। না-রাগ, না-অভিমান, না-মিনতি অথচ রীতিমত দৃঢ়তার সহিতই শব্দটী ধ্বনিত হইয়াছিল। কয়েকটা মুহূর্ত্ত কি রকম যেন এক অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতার মধ্যে কাটিয়া গেল।

টেবিলে স্ট্র-পাইপ দেওয়া সরবতের গ্লাস বসানোর ঠক্ করিয়া শব্দ হইল। বিরক্তিকর এই নীরবতা। যোগেশবাবু বজ্রকণ্ঠে হাঁকিলেন, কেরে?

ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে আসিল বিজয়। স্বেদাক্ত শরীরটা 'আদর্শগ্রামের' জমির মাটিতে কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিয়াছে বলিলেই হয়। তাকে দেখিয়াই যোগেশবাবু ক্রোধে আগুন হইয়া উঠিলেন কিন্তু আপাততঃ তা চাপিতেই চেষ্টা করিলেন। কহিলেন, কি খবর রে?

খবর, বিজয় কুসুমের চরিত্র সম্পর্কে দারোগাবাবু ও অধর কুণ্ডুর মন্তব্যটা শুনিয়াছিল। তা ছাড়া সে এই সম্পর্কেই বলিতে আসিয়াছে। 'ক্যারেক্টার' মানে যে চরিত্র একথা সে জানে, ইংরাজী লেখাপড়া না জানিলেও জানে, সচরাচর কথাটা গ্রামের ছেলেদের মুখে শোনা যায়। তাই সে দৃঢ়ভাবেই কহিল, কুসুমের চরিত্র ভালই—এই কথাটা আর কি!

কুসুমের চরিত্র ভালই, যোগেশবাবু ভ্যাঙ্চাইয়া উঠিলেন, দারোগাবাবু মিথ্যে কথা বল্‌তে এসেছেন না?

তা ছাড়া যে পঞ্চাশটা লোক সাক্ষী দিলে, ভট্চায কহিলেন, তারাও সব মিথ্যে কথা বল্‌লে?

গোবিন্দ বল মন—গোবিন্দ বল, অধর মুখে হাত বুলাইয়া কহিল, কালে কালে কত দেখব!

মিথ্যে কথা কি সত্যি কথা তা নিয়ে তক্কো ক'রব না বাবু, বিজয় দৃঢ়ভাবে

কহিল, কুসুম মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের বদ্‌নাম হওয়া মানে তার মৃত্যু। কাজেই তার সম্বন্ধে এই ভাবে বলা দেশাচার নয়, আর তা ভাল ভাল লোকের মুখে শোভাও পায় না।

হতভাগাটা বলে কি?

দারোগাবাবু লজ্জিতভাবে কহিলেন, আমি ঠিক একথা বলিনি ভাই—এভিডেন্স যদি বলে!

যোগেশবাবু হাত নাড়িয়া দারোগাবাবুকে বাধা দিলেন এবং বিজয়ের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, কাজ শেষ হয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বেশ নাওয়া-খাওয়া ক'রগে যা'—

—এই যে এবার যাব। হ্যাঁ দারোগাবাবু, আর একটা নিবেদন—

দারোগাবাবু জিজ্ঞাসুভাবে তার দিকে তাকাইলেন। বিজয় কহিল, কুসুমের নামে এই বদ্‌নামটা দেয়া হবে ব'লে কাল পুন্নুমের রাতে কালীপূজো ক'রে লোককে মদ খাওয়ানো হ'য়েছে। অবিশ্যি তারা কুসুমের কিছুই ক'রতে পারেনি, শুধু বদ্‌নামটাই যা' দিয়েছে। এসব আমি স্বচক্ষে দেখিচি আর তাই ব'লেও গেলুম—

'বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ'। অতএব ভট্‌চায্‌ কহিলেন, তুই স্বচক্ষে দেখেচিস্‌?

হ্যাঁ আপনিই তো পূজো ক'রছিলেন। তা ছাড়া বিশ্বাস না হয়, ঐ পরমেশ এসেছে, ওকে জিগ্যেস্‌ করুন, ও-ও কাল পূজোয় মেতে মদ খেয়েছিল, বলিয়া বিজয় সোজা চলিয়া গেল। তার এই চলিয়া যাওয়ার দিকে তাকাইয়া ভট্‌চায বলিয়া উঠিলেন, ব্যাটা যেন দিগ্বিজয়ী আলেকজন্দর!

ভট্‌চাযের এই সস্তা রসিকতায় ঘরের প্রতিবাদপূর্ণ আবহাওয়া একটুকু লঘু হইল না। দারোগাবাবু শুধু ম্লানভাবে একটু হাসিলেন। তারপর বেশ

চিন্তিতভাবে যোগেশবাবুর দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু কালীপুজোর কথাটা আমি ওপাড়াতেও শুনেছি—ব্যাপার কি বলুন তো ?

যোগেশবাবু তখন অন্তরে অন্তরে জ্বলিতেছিলেন। তিনি অন্তর্দাহ হইতে সহসা যেন জ্বলিয়া উঠিয়া দারোগাবাবুর দিকে তাকাইলেন। এই তাকানো ভট্চাযের বশীকরণ-বিদ্যা অপেক্ষাও উন্নত ধরণের বিদ্যা। শুধু ইহাতেই যেন দারোগাবাবুর আক্কেল হইয়া গেল। তিনি ঘাড় নীচু করিলেন।

৭

বিজয়ই সেদিনকার বিজয়ী বীর।

যোগেশবাবু ও দারোগাবাবুর সুমুখে অমন বুক ফুলাইয়া সত্য কথা বলা আর কেহ হইলে নিশ্চয়ই পারিত না। বিজয় বলিতে পারিয়াছে এবং সেইজন্যই সে সকলের ধন্যবাদের পাত্র। পল্লীবাসীদের হৃদয়ে গুপ্ত-কোঠায় যেখানে সত্যকারের মানুষ অনেক অত্যাচারে অবিচারে বিষ-জর্জ্জরিত হইয়া মরিতে মরিতে আজও বাঁচিয়া আছে, সেখানে সকলেই বিজয়ের প্রতি সপ্রশংস ও সহানুভূতিসম্পন্ন। এবং সেইজন্যই অপরাহ্ণের দিকে ধীরে ধীরে দু-একজন করিয়া তার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিজয় চেটাই পাতিয়া সকলকে বসাইল। সর্ব্বপ্রথম তাকে অভিনন্দন জানাইতে আসিয়াছিল শ্রীপতি এবং তারপর আসিয়াছিল পরমেশ, জীবন, শশীর ছেলে দীনু।

শ্রীপতি কহিল, তুই আমার মুখ রেখিচিস্ ভাই—আমি যা' পারিনি তুই তা পেরেচিস্। কি ব'লে যে আমি তোকে আশীর্ব্বাদ ক'রব!

আশীর্ব্বাদের কথায় বিজয়ের দুইচক্ষু সজল হইয়া উঠিল। তবু সেই অবস্থায় সে ঘরের দিকে একবার অপাঙ্গ দৃষ্টিতে তাকাইল। ঘরে বনমালা ছিল—নিশ্চয়ই সে এই আশীর্ব্বাদের কথায় গর্ব্ববোধ করিবে! বাস্তবিক তাই। বনমালার উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত মুখখানির উপর তার দৃষ্টি পড়িল। বিজয় যা' ভাবিয়াছিল, তাই হইল। বনমালার সমর্থনপূর্ণ দৃষ্টিতে তার মন ভরিয়া উঠিল।

পরমেশ শ্রীপতির কথার জের টানিয়া বলিল, মাইরি বল্‌ছি বেজা—তুই যে অমন ক'রে বল্‌তে পারবি তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

বেড়ে বলা হয়েছে, জীবনও সায় দিল। দীনু কহিল, এমনি ক'রে না বললে ওদের আক্কেল হয় ?

পরমেশ, জীবন ও দীনু বিজয়েরই সমবয়সী। আজ বিজয় অসম সাহসিকতার কাজ করিয়া আসিয়াছে বলিয়া তাদেরও বুকখানা যেন গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিয়াছে। তারা পল্লীগ্রামের যুবক, যে ক্ষমতা তাদের মধ্যে নাই, অপরের মধ্যে সে ক্ষমতা দেখিলে স্বভাবতঃই তারা তার কাছে মাথা নোয়ায়, তাকে শ্রদ্ধা জানায়।

পল্লীগ্রামে মানুষের এই সশ্রদ্ধ অভিনন্দনকে গ্রহণ করিবার পদ্ধতিও অতি-সাধারণ। নিতান্ত সাদাসিধা দু-চারটি কথায় কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। বিজয় কহিল, ঠাকুর মশাই এম্‌নিভাবে চিরকাল যেন মাথা উঁচু ক'রে চলতে পারি—এই আশীর্ব্বাদই আপনারা করুন।

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, উচ্ছ্বসিতভাবে শ্রীপতি বলিয়া উঠিল।

পরমেশ বিস্ময়মুগ্ধ ভাবে অথচ অনুতপ্ত কণ্ঠে কহিল, আরে ভাই আমি কি জানতুম এর ভেতরে এত ব্যাপার! তা যদি জানতুম তা'লে কখনো নেশা ক'রতে যেতুম না। ও ব্যাটাদের ফাঁদে আর কোন্ শালা পা দেয়।

শ্রীপতি পরমেশের ব্যাপারটা জানিত না। সে তার কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিল, তুইও তাহ'লে ছিলি নাকি কাল রাতে ?

অবিশ্যি আমি এখানে আসিনি, পরমেশ কহিল, তবে ওখানে ছিলুম।

হায় ভগবান, শ্রীপতি কহিল, তবু ওরা দিনকে রাত ক'রলে এনকোয়ারিতে! আমাকে বললে তোমার অভিযোগ সব ফল্‌স্!

এবার কথা কহিল জীবন। সে বলিল, অধর্ম্মের জয়ই তো আগে হবে ঠাকুরদা'!

—হ্যাঁ তাই দেখলুম।

দীনু কহিল, কিন্তু চিরদিন তা হবে না।

পরমেশ কহিল, সেই যা' ভরসা।

কিন্তু, শ্রীপতি কহিল, পঞ্চাটার কি কাণ্ড বলদিকি—সে সোজাসুজি ওদের দলে যোগ দিলে!

তাই নাকি, বিজয় চমকাইয়া উঠিল।

হ্যাঁরে, বলিয়া শ্রীপতি একে একে পঞ্চুর কাহিনী বিবৃত করিল। তা শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইল। বিজয় কহিল, এমনিই হয় ঠাকুর মশাই।

—হ্যাঁ, হাতী যখন পাঁকে পড়ে তখন চামচিকেতেও লাথি মারে।

তাইতো, পরেশ কথাটা সমর্থন করিল।

এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল আশু ডাক্তার লাঠি খট্ খট্ করিতে করিতে একেবারে বিজয়ের দাওয়ার কাছে আসিয়া পড়িল। বিজয় ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল—ডাক্তারকে কোথায় বসিতে দিবে, কি বিছাইয়া দিবে, সে যেন কিছু ভাবিয়া পাইল না। আশু তার এতদবস্থা লক্ষ্য করিয়া এবং তাকে অথবা আর কাকেও কোন কিছু বলিবার সুযোগ না দিয়া বলিয়া উঠিল, জিন্দা-রহ বেটা। এই তো চাই!

বিজয় ডাক্তারের এই উচ্ছ্বাসে অভিভূত হইয়া গেল। শুধু সে-ই নয়, ঘরের ভিতর আরও একজন বোধ করি। কিন্তু এবার আর বিজয় ঘরের দিকে তাকাইতে পারিল না। ডাক্তারবাবু কেমন যেন দ্রুতবেগে আসিয়া পড়িয়াছেন এবং হয়ত এমনি দ্রুতবেগেই চলিয়া যাইবেন, তাঁকে বাড়ীতে বসানো যাইবে না। তাই সে অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, উঠে আসুন ডাক্তারবাবু।

না আমি বস্‌ব না, আশু বলিয়া উঠিল, শুনে অবধি আমি আস্‌ব আস্‌ব ভাবছিলুম। তা সময় আর পাইনি—

মদের তীব্র গন্ধে সমস্ত বাড়ীটা যেন ভরিয়া উঠিল। কাচ-পোকার মত সোনালি দীপ্তিপূর্ণ সবুজ রঙের বড় বড় মাছিগুলা দাওয়ার দিকে ভন্ ভন্ করিয়া ছুটিয়া আসিল। আশু কহিল, চল্‌লুম—যাব একবার ডিহিবাৎপুর। যাবে নাকি শ্রীপতি খুড়ো—

কথাগুলা বলিতে আশুর যতটুকু সময় লাগিয়াছিল—শ্রীপতি আসিবে কি না আসিবে তা না শুনিয়াই সে যেমন ক্ষিপ্রপদে আসিয়াছিল, তেমনি ক্ষিপ্রপদেই নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

লোকটা যেন সমস্ত বাড়ীটাকে কেমন 'থ' করিয়া দিয়া গেল।

তখন অপরাহ্ণ পার হইয়া গিয়াছিল। অস্ত-সূর্য্যের পরিত্যক্ত রঙ লাগিয়া পশ্চিমাকাশ রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। তারই দীপ্তি ছড়াইয়া পড়িয়াছে বনে বনে, গাছের ডালে, দূর তালবনের মাথায়। গাছে গাছে সুরু হইয়াছে নীড়-প্রত্যাগত পাখীদের একটানা কলরব, ঋতুভ্রষ্ট পথ-হারা শারদ কোকিলের কুহুধ্বনি। জয়ের নেশা যে-মানুষের মনকে মাতাল করিয়াছে, প্রকৃতির এম্‌নিতরো রঙ-বৈচিত্রে সে-মানুষ স্বভাবতঃই ভাব-প্রবণ হইয়া উঠে। বিজয়ের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল, বাহির দুয়ারে প্রতীক্ষা-রত একটি যুবতীর মূর্ত্তি। সে শোনে নাই তার এই বিজয়বার্ত্তা, বা শুনিলেও, যার নিকট হইতে তার মন শুনিতে চায়, তার কাছে এখনও শোনে নাই। বিজয়ের মনটা হু হু করিয়া উঠিল। যাকে কেন্দ্র করিয়া আজ এই গোধূলি-লগ্নে তার এই অভিনন্দন, এখনও তাকেই আসল কথাটা বলা হয় নাই। বিজয় রীতিমত চঞ্চল হইয়া পড়িল।

কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে পড়িয়া গেল ঘনশ্যামের কথা। কুসুমের কাছে সে শুনিয়াছিল—লোকটার কি যেন একটা সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। সেখানে তো তারই যাইবার কথা আগে। তাই সে কহিল, ঠাকুরমশাই শুনেছেন ঘনশ্যাম জ্যাঠার কি হ'য়েছে?

না, শ্রীপতি কহিল, তার আবার কি হ'ল?

কি যেন একটা হয়েছে, বিজয় কহিল, তাই একবার যাব মনে ক'রছি।

যাবি, শ্রীপতি কহিল, তার কাছে আমাকেও যেঁতে হবে একবার। তবে কেত্তন ওলাদের পাওনা-থোওনা না মিটিয়ে তো যেতে পারছি না—

আজই ওদের সব মেটাতে হবে, বিজয় কহিল। শ্রীপতি কহিল, আর বলিস্ কেন। ওস্কানি পেলে তারাই বা চুপ ক'রে থাকবে কেন? তা ছাড়া শুনলুম আজকে ওরা ওপাড়ায় নাকি গাওনা-ও ক'রবে।

হুঁ, বিজয় কথাটা ভাবিয়া দেখিল। তারপর সে উঠিয়া পড়িয়া ঘরের ভিতর ফতুয়া আনিতে গেল। শ্রীপতি, পরমেশ, জীবনও উঠিয়া পড়িল। বিজয়ের মা কোথায় ছিল, শ্রীপতির কাছে আসিয়া বুড়ী কহিল, বাবাঠাকুর একটু দেখো বাবা ওকে—লোকজনের সঙ্গে ঝগড়া না ক'রে ফেলে। ওরা সব বড়লোক, ওদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কি গাঁয়ে বাস করা যাবে?

না না ওসব কথা, শ্রীপতি কহিল, তুমি মনেও স্থান দিও না। ছেলে তোমার খারাপ কিছু করেনি।

তা নয়, বুড়ীর কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া আসিল। তারপর কহিল, ঐ আমার শিবরাত্তিরির সল্‌তে।

পরমেশ বুড়ীকে আশ্বাস দিয়া কহিল, ভয় কি খুড়ী আমরা আছি ওর সঙ্গে। কে কি করে দেখাই যাক্ না।

তাহ'লেই হ'ল বাবা, খুড়ী যেন আশ্বাস পাইল।

শ্রীপতি পরমেশ ও জীবন উঠানে নামিয়া যেন বিজয়ের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। একসঙ্গেই পথে বাহির হইবে। কিন্তু বিজয় কি করিবে ঠিক করিতে পারিতেছিল না। প্রথমতঃ ঘরে বনমালা চোখ টিপিয়া বাহিরে যাইতে নিষেধ করিতেছিল, দ্বিতীয়তঃ বাহিরে উহারা অপেক্ষা করিতেছিল—তাই দোটানার মধ্যে তার পক্ষে কর্তব্য স্থির করা মুস্কিল হইয়া পড়িতেছিল। তবু এ অবস্থা বেশিক্ষণ চলিতে দেওয়া ভাল দেখায় না—উহারা ভাবিবে কি? তাই সে বনমালার দিকে তাকাইয়া অল্প একটু হাসিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

বনমালা হাসিয়া তার পথরোধ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু নাছোড়বান্দা

লোকটা বাহিরে চলিয়া গেল দেখিয়া সে অনুযোগের ভঙ্গীতে ও বেশ চেঁচাইয়া অথচ চাপাকণ্ঠে কহিল, তাড়াতাড়ি ফিরো কিন্তু—

হ্যাঁ হ্যাঁ, বিজয় উঠানে নামিয়া বলিয়া উঠিল, চলুন ঠাকুরমশাই।

পথে আসিয়াই যে-যার গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে পা বাড়াইল। বিজয় ঠিক করিয়া নিল প্রথমে সে ঘনশ্যামের ওখানে যাইবে, ফিরতি-পথে একেবারে কুসুমের নিকট হইয়া বাড়ী ফিরিবে।

যদিও কুসুমকে কথাটা ঘনশ্যাম বলে নাই কিন্তু সত্য-সত্যই ঘনশ্যামের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছিল।

অষ্টম প্রহরের দিন ভোরেই শহর হইতে বড়ছেলে কিঙ্কর আসিয়া ঘনশ্যামকে খবর দেয়—মেজছেলে হরিহর গুপ্ত ঘাতকের হাতে খুন হইয়াছে। অবশ্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সে মরে নাই। আহত অবস্থায় হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে। খবরটা শুনিবামাত্র ঘনশ্যাম আর স্থির থাকিতে পারে নাই, কিঙ্করের সহিত শহরে ছুটিয়া গিয়াছিল।

হাসপাতালে গিয়া সে যা' দেখিল তাতে সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। শয়তানেরা পিঠে উপর্য্যুপরি ছুরিকাঘাত করিয়াছে। পাশ ফিরাইয়া হরিহরকে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছে। ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। কখনও তার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিতেছে, কখনও আবার সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িতেছে।

হাসপাতালের ডাক্তারেরা বলিয়াছেন, ভয় নাই—বাঁচিয়া যাইবে। ঘনশ্যাম তাতে খানিকটা আশ্বস্ত। কিন্তু কেন এই খুন, কেন এই হত্যা প্রচেষ্টা? এই প্রশ্নই ঘনশ্যামের মনে বার বার উদিত হইয়াছে।

অবশ্য প্রশ্নের জবাব সে পাইয়াছে। হরিহরের সহকর্ম্মীরা সব কথা তাকে জানাইয়াছে। হরিহরদের কারখানার একদল শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিতে উদ্যত হইলে, হরিহর তা'তে নাকি বাধা দেয় এবং সেই বাধা দেওয়ার ফলেই এইরূপ প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

কিন্তু এ কিরকম প্রতিশোধ ?

যা' হউক, হরিহরের অবস্থা ভালর দিকে দেখিয়া এবং সে প্রস্তুত হইয়া যায় নাই বলিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে—দু-একদিন গ্রামে থাকিয়া তারপর আবার যাইবে। তাই কিছু পয়সা কড়ি নিয়া যাইবার জন্যও তার ফিরিয়া আসার দরকার ছিল।

গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া তার শরীর যেন আর বহিতেছিল না। সারা-দিন হরিহরের জন্য উদ্বিগ্নচিত্তে কাটাইয়া, তার বিছানার পাশে সারারাত জাগিয়া সে এমনই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, গ্রামে ফিরিয়া সোজা-সুজি সে শশীর বাড়িতে উঠিয়াছিল—অন্য কোথাও যাইতে পারে নাই। তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া সে নিজের মাঠের মাচাটিতে আসিয়া শুইয়া পড়ে।

সারাদিন ঘুমাইয়া সন্ধ্যার সময় ঘনশ্যাম উঠিয়া বসিল। মুখ-হাত ধুইয়া সে ভাবিল বিজয়ের ওখানে যাইবে কিনা, গ্রামে কিসব ব্যাপার ঘটিল তা'তো জানা দরকার। আবার ভাবিল, না বিজয়, শ্রীপতি বা অন্য কেউ নিশ্চয়ই আসিবে। তা ছাড়া না আসুক, সে তো শশীর ওখানে যাইবেই।

মাঠে তখন সন্ধ্যা নামিতেছিল—দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠের মাঝে সন্ধ্যা, গোধূলির বিদায়-আলোকে উদ্ভাসিত। আকাশে একটি-দুটি করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে নক্ষত্র। ঈষৎ বাতাসও বহিতেছে এলোমেলো ভাবে। গ্রামের ওদিকে গৃহবধূদের শঙ্খধ্বনি মাঠ পার হইয়া গ্রামান্তরের দিকে ছুটিয়া যাইতেছে। ঘনশ্যাম মাঠের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া কি যেন দেখিতে লাগিল। বোধ করি সেই ঘনায়মান অন্ধকারের পটভূমিতে ফুটিয়া উঠিল হরিহরের মুখখানি—যন্ত্রণায় হয়ত সে ছট্‌ফট করিতেছে। তাই বোধহয় চক্ষুদুটা হইতে ফোঁটা দুই জল ও বুক হইতে একটা দীর্ঘশ্বাস আছড়াইয়া পড়িল। তার কি মনে হইল সে আলো জালিয়া প্রতিদ্বিন্দ্বিতার

অভ্যাস মত সেই পুরানো পাতা-ছেঁড়া মহাভারতখানা সুতা বাঁধা চশমা চোখে দিয়া সুর করিয়া পড়িতে লাগিল :—

সমুচিত ভাগ দিতে উচিত যে হয়।
তাহা দিয়া প্রীত কর পাণ্ডুর তনয় ॥
ভাই ভাই বিরোধেতে নাহি প্রয়োজন।
অনুমতি দেহ আনাইতে পঞ্চজন ॥
সেই ইন্দ্রপ্রস্থে পুন দেহ অধিকার।
তাহার সহিত দ্বন্দ্বে কি কাজ তোমার ॥
দুর্য্যোধন বলে ইহা নহে ত বিচার।
আমার পরমশত্রু পাণ্ডুর কুমার ॥
বিনাযুদ্ধে ছাড়িয়া না দিব রাজ্যধন।
ক্ষত্রধর্ম্ম শাস্ত্রমত আছে নিরূপণ ॥

ছত্রকটি পড়িয়া ঘনশ্যামের মনের ভাবই যেন কেমন হইয়া গেল। মহাভারত শুধু মহাভারতই নয়—তার চেয়েও কিছু বেশি। ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ভিত্তির মূলে এতবড় অবদান আর কিছু নাই। রামায়ণ-ও তাই। মানুষ তার প্রাত্যহিক সংসারযাত্রার আড়ালে মনে মনে কল্পনা করিয়াছে আর এক দ্বিতীয় সংসার। সেই দ্বিতীয় সংসার প্রাত্যহিক সংসারযাত্রার মতই এক অদৃশ্য-বাস্তব। মানুষের শান্তিপ্রিয় মন—স্নেহ, দয়ামায়া, শ্রদ্ধা, সুখ-দুঃখের অনুভূতিতে গড়া জীবন—তারই মত নির্ব্বিবাদী আদর্শপূর্ণ মানুষ খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে চিরদিন চিরন্তন। রামায়ণ মহাভারত মানুষকে তার সন্ধান দিয়াছে রাম-রাবণ ও কুরু-পাণ্ডবের কাহিনীর ভিতর দিয়া। তাই মানুষ নিজ-সংসারের সংগ্রাম-মুখর জীবনের আড়ালে এই দ্বিতীয় সংসারের অনবদ্য কাহিনীর স্নিগ্ধ বটতরুতলে আপনাকে বসাইয়া রাখিতে ভালবাসে। এই ভালবাসা হইতেই হয়ত শিল্প-সাহিত্য, সভ্যতা-সংস্কৃতির উৎপত্তি। ভারতবাসী নিরক্ষর বটে কিন্তু সে অশিক্ষিতও নয়,

অসভ্যও নয়—ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে ভারতবাসী অসামান্যরূপে সংস্কৃতিবান।

মহাভারত পাঠে ভিতরকার এই সংস্কৃতিবান মনই ঘনশ্যামকে কেমন যেন নাড়া দিয়া উঠিল। গ্রামে এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় বিবাদ; শহরেও তাই। গ্রামে কুসুমের ঘর পুড়িয়াছে, শহরে হরিহর ছুরিকাহত হইয়াছে। অথচ কেন? মানুষগুলার কি মনে পড়ে না কাশীরাম দাসের এই পয়ারে লেখা ছত্র কটা—'সমুচিত ভাগ দিতে উচিত যে হয়' কিম্বা 'ভাই ভাই বিরোধেতে নাহি প্রয়োজন?'

তার মনের যখন এম্‌নিতরো অবস্থা তখন কে যেন তার মাচার নীচে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং 'জ্যাঠা' 'জ্যাঠা' বলিয়া ডাকিল। ঘনশ্যাম ভাবিল নিশ্চয়ই বিজয় আসিয়াছে। তাই হাঁকিল, কে বিজয়?

হ্যাঁগো জ্যাঠা, বিজয় কহিল, আলোটা ধরদিকি—

ঘনশ্যাম আলোটা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিল। বিজয় মাচার উপরে উঠিয়াই বলিল, জ্যাঠা ব্যাপার কি বলদিকি?

ব্যাপার বড় সাঙ্ঘাতিক রে বাবা, বলিয়া ঘনশ্যাম আলোটাকে একপাশে রাখিয়া মহাভারতখানাকে গুছাইয়া নিল। বিজয় পুনরায় বলিয়া উঠিল, হঠাৎ গেছলেই বা কোথায়?

গেছলুম কিঙ্কর এসেছিল, ঘনশ্যাম চশমাটা খুলিতে খুলিতে বলিল, তারই সঙ্গে।

সে এল—তুমি গেলে, বিজয় কোন দুর্ঘটনা সম্বন্ধে একরূপ প্রায় নিশ্চিন্ত হইয়াই বলিল, তাহ'লে ব্যাপার একটা সেই রকম কিছু ঘটেছে বলো?

হ্যাঁ, ঘনশ্যামের কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া আসিল। কণ্ঠস্বর তার ভারী হইতে দেখিয়া বিজয় আর কোন কথা বলিতে পারিল না—কি জানি কি ভয়াবহ সর্ব্বনাশ ঘটিয়া যাওয়ার কথা বলিবে, যাতে তার কথা সেই অনুষ্ঠিত দুর্ঘটনার কাছে অত্যন্ত হাল্কা ধরণের মনে হইতে পারে; তাই

সে শুধু নির্ব্বাকভাবে ঘনশ্যামের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

ঘনশ্যাম বলিয়া উঠিল, হরিহর খুন হ'য়ে গেছে—

বল কি জ্যাঠা, বিজয় চমকাইয়া উঠিল।

তবে ভগবানের দয়া, ঘনশ্যাম অধিকতর ভারী কণ্ঠস্বরে কহিল, একেবারে প্রাণে মারা যায়নি।

—কিন্তু হঠাৎ এরকম কাণ্ডর কারণটা কি?

কারণ আর কি, ঘনশ্যাম একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, যেখানেই গরীব মানুষ দল বাঁধছে সেখানেই এই জুলুম। গেরামেও যে ব্যাপার চলেছে, সেখানেও তাই—

বিজয় সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, গেরামের মত ব্যাপার?

—হ্যাঁ ঠিক অবিকল। ওদের কারখানায় জনকতক লোক, তারা এর আগে কখনো মজুরদের তরফে থাকেনি, বরাবর মজুরদের বিপক্ষে—হয় মালিকের, না হয় পুলিশের দলে গেছে—তারা হঠাৎ কারখানায় ইসট্রাইক করবার তরে উঠে পড়ে লাগে। হরিহরেরা তাতে বাধা দেয়, সেইজন্তে রাতে যখন সে বাসায় ফিরছিল তখন তাকে পেছন থেকে ছুরি মারে।

—ওরা ইসট্রাইকে বুঝি যোগ দিতে চায়নি?

—না।

কিন্তু বিজয় যেন কেমন ঘুলাইয়া ফেলিল। স্ট্রাইক সম্বন্ধে তার বরাবরই ভাল ধারণা। অবশ্য সে শহরের কোন স্ট্রাইক কখনো দেখে নাই। তবে তা কিভাবে হয় তা শুনিয়াছে। কিন্তু গ্রামের স্ট্রাইক সম্বন্ধে তার জ্ঞানও আছে, অভিজ্ঞতাও আছে। মনে পড়ে তেরশো আটত্রিশ উনচল্লিশ সনের কথা। ছত্রিশ সালে কংগ্রেসের প্রচণ্ড আন্দোলন হইলে পর সর্ব্বপ্রথম কৃষকরা সংগ্রামের আস্বাদ পাইল। সংগ্রামের সেই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আটত্রিশ উনচল্লিশ সনে সমগ্র মহকুমার কৃষকগণ একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। সকলে মিলিয়া খাজনা

দেওয়ার বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করিয়া বসিল। দীর্ঘ দুই বৎসর ধরিয়া এই ধর্ম্মঘট চলিল।

কৃষকরা কিছুতেই মাথা নত করিবেনা। দমন নীতির স্টীম রোলার কৃষকের উপর দিয়া বহিয়া গেল। অনেক জমিদার কৃষকদের সায়েস্তা না করিতে পারিয়া অফিসিয়াল রিসিভারের হাতে জমিদারী তুলিয়া দিল। কিন্তু কৃষকগণ কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করিলনা।

পশ্চিমপাড়া, চকগোবর্দ্ধন, বৈঠা প্রভৃতি গ্রামগুলিতে আজও কৃষকের সেই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের চিহ্ন খুঁজিলে দেখিতে পাওয়া যায়—আজও এখানকার বহু জমিদারী অফিসিয়াল রিসিভারের হাতে। তা ছাড়া সেদিনের আরও অনেক চিহ্ন এখনও বিদ্যমান—আজও লোকের ঘর-বাড়ীর দেয়ালে দেয়ালে টিনকাটা প্লেটের ছাপ দেখা যায় "খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করো।"

যা'হউক সেদিন পশ্চিমপাড়া গ্রামগুলিতে যত অত্যাচার, উৎপীড়নই হইয়া থাকুক, শেষ পর্য্যন্ত কৃষকদের কল্যাণই হইয়াছিল। যদিও তারা নেতৃত্বের দোষে পরাজিত হইয়াছিল তবুও সেই সময় হইতে কারণে-অকারণে জমিদারী অত্যাচার চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

স্ট্রাইকের যে একটা ভাল ফল আছেই, সে কথা বিজয় কিছুতেই ভুলিতে পারেনা।

এই প্রসঙ্গে আরও মনে পড়ে বর্দ্ধমান জেলার কথা। বর্দ্ধমান জেলার হাটগোবিন্দপুরে তার শ্বশুরবাড়ী। সেই যে বছরটায় যুদ্ধ আরম্ভ হয় সেই বছরে হাটগোবিন্দপুর অঞ্চলটায় যে কি হইয়াছিল! ঐ অঞ্চলে চাষের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য দামোদর হইতে ক্যানাল কাটা হয় এবং সেজন্য কৃষকদের নিকট হইতে একটা করও আদায় করা হয়। প্রথমে সেই কর দু-টাকা ন-আনা ধার্য্য হইয়াছিল কিন্তু ক্যানাল করা হইয়াছে এই অজুহাতে যদি কিছু কর বেশি আদায় করা যায় সেজন্য তৎকালীন মন্ত্রিসভা কর্ত্তৃক ঐ দু-টাকা ন-আনাকে ধাপে ধাপে সাড়ে পাঁচ টাকায় তুলিয়া ফেলা হইল।

তা ছাড়া ক্যানালের একটা মস্ত বড় ফাঁকি ছিল। বর্ষার সময়ে ক্যানালে জল থাকিত বটে কিন্তু অন্যসময়ে রীতিমত জলের অভাব ঘটিত এবং তার জন্য কৃষকের দিক হইতে কোন কর দেওয়া যায় না। তাই কৃষকরা সমগ্র ক্যানাল অঞ্চল জুড়িয়া আওয়াজ তুলিল—"অতিরিক্ত ক্যানাল-কর বন্ধ করো।"

ডাঃ বিজয়ের মনে আছে—সমগ্র ক্যানাল অঞ্চলে কি ঝড় বহিয়া গেল সে সময়। গ্রামের পর গ্রাম রুখিয়া দাঁড়াইল। হাটগোবিন্দপুর গ্রামের পাশাপাশি গ্রামগুলিতে কৃষকরা সত্যাগ্রহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। মনে পড়ে আউসগ্রামে কৃষক রমণীরা পর্যান্ত ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া সত্যাগ্রহ করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিল। হাজার হাজার গ্রামবাসী নর-নারীর মুখে কঠিন প্রতিজ্ঞা ফুটিয়া উঠিল—'ওদের আঁখি যত রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে।"

একদিকে কৃষকদের যেমন এই অটুট সঙ্কল্প তেমনি অন্যদিকে আমলা-তান্ত্রিক নায়কগণেরও কুৎসিৎ জিদ্—কৃষকদের তারা কোনক্রমেই রেহাই দিবে না।

কৃষক প্রজার মঙ্গল করিবেন বলিয়া 'কৃষক-প্রজা' না কি একটা দল হইতে প্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী মৌলভী ফজলুল হক সাহেব বাংলার প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন। তিনি এবং তাঁরই দোসর তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব মুসলিমলীগপন্থী খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন—তাঁদের শাসনকালের এই সময়টায় তাই কৃষক-প্রজার মঙ্গলার্থে গ্রামে গ্রামে পুলিশ মোতায়েন হইল, ফৌজের গাড়ী আসিল এবং গ্রামের পর গ্রামে তাদের গৌরবময় অভিযান চলিল। বলপূর্ব্বক 'ক্যানাল-কর' আদায়ের চেষ্টা হইল, দলে দলে কৃষকদের গ্রেপ্তার করা হইল—ক্রোক, গরু-বাছুর খুলিয়া আনা, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা, নোটিশ, ১৪৪ ধারা জারী প্রভৃতি কিছুই বাকি রহিলনা।

অন্যদিকে কৃষকরাও চুপ করিয়া রহিলনা। বর্দ্ধমানের সেই ধর্ম্মঘটী হাজার হাজার কৃষক অতুলনীয় বীরত্বের সহিত লড়াই করিল। সশস্ত্র পুলিশ গ্রামে আসে—গ্রামকে গ্রাম গৃহস্থালীর জিনিসপত্র নিয়া ভিন্নগ্রামে সরিয়া যায়।

রাত্রিতে রাত্রিতে কর্ম্মীদল গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া গ্রামবাসীদের মনোবল অটুট রাখিবার চেষ্টা করে।

কারও গরু-বাছুর জিনিসপত্র ক্রোক করিলে কেহ নিলাম ডাকেনা, কাকেও গ্রেপ্তার করিয়া নিয়া গেলে কেউ ভয় পায়না—শহরে গিয়া মামলা তদ্বির করে। মনে পড়ে নিতাই সামন্তের গরু নিলামে বিক্রয় করিতে গেলে সারা বর্দ্ধমান জেলায় কেহ সে গরুগুলিকে ডাকিয়া লয় নাই। আদালতে মামলা চলিলে কৃষকের বিরুদ্ধে কেউ সাক্ষ্য দেয় নাই। বর্দ্ধমানের কৃষক সেদিন এমনই ঐক্যবদ্ধ ধর্ম্মঘট-সংগ্রামে নামিয়াছিল!

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে তার শ্বশুর বাঁশরীর কথা। গ্রামে তখন গাড়ীর পর গাড়ী করিয়া ফৌজ আসিতেছে। যাতে সেই ফৌজেরা গ্রামে আসিয়া কোনরকম উৎপাত না করিতে পারে তজ্জন্য বাঁশরী এক অদ্ভুত ফিকির বাহির করিল। বুড়া জানিত কেমন করিয়া প্রতিপক্ষের সহিত লড়িতে হয়। গ্রামের পথে সামরিক যান চলাচল করা এমনিই খুব শক্ত। তার উপর বাঁশরী করিল কি—যে সব জায়গায় পথের দুইপাশে পুষ্করিণী আছে সে সব জায়গায় কোদাল চালাইয়া খানা কাটিয়া দিল, দুই পুষ্করিণীতে যোগাযোগ হইয়া গেল, পথ পুষ্করিণীতে পরিণত হইল। ফৌজের গাড়ী আর গ্রামের মধ্যে ঢুকিতে পারিল না।

এমনি করিয়া বর্দ্ধমানের কৃষক অতিরিক্ত ক্যানাল-কর কমাইবার জন্য স্ট্রাইক করিয়াছিল। আর সে স্ট্রাইকে তাদের জয়ও হইয়াছিল। ক্যানাল-কর আবার দুটাকা ন-আনায় নামিয়া আসিয়াছিল।

এই ঘটনা দুটি হইতে সে জানে যে স্ট্রাইকের একটা শুভ ফল আছেই। অথচ হরিহররা যে কেন স্ট্রাইকের বিপক্ষে গিয়াছিল তা সে বুঝিতে পারেনা। ঘনশ্যাম জ্যাঠা বলিয়াছে, যারা মালিক ও পুলিশের লোক তারাই স্ট্রাইক করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিল। হয়তো সে কথা সত্য কিন্তু তাই বলিয়া স্ট্রাইক তো আর খারাপ ব্যাপার নয়। কাজেই

কেউ যদি তার বিরুদ্ধে যায় তবে সে স্ট্রাইকের মত একটা মহান ব্যাপারেরই বিরুদ্ধে যাইবে এবং সেজন্য সে যত বড় মহৎ লোকই হোক্, সকলের ঘৃণার পাত্র হইতেই বাধ্য।

অবশ্য বিজয়ের পক্ষে এখনই কোন মতামত প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ভিতরকার ব্যাপার সে কিছুই শোনে নাই। কাজেই সে কেমন দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থার মধ্যে পড়িয়া চুপ করিয়া গেল।

শুধু কি সেইজন্যই সে চুপ করিয়া গেল? না তা-ও ঠিক নয়। আরও কারণ আছে। একজন মানুষ ছুরিকাহত হইয়াছে এবং সে মানুষটা তার একান্ত শ্রদ্ধার পাত্র ঘনশ্যাম জ্যাঠার ছেলে—ইহাঁ তার কাছে একটা দুঃসংবাদ এবং দুঃখের ব্যাপার। সেই দুঃখের ব্যাপারের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া মানুষের কি করা উচিত, বিজয় তা জানিলেও বলিতে পারেনা। তার উচিত ঘনশ্যামের এই দুঃখে সান্ত্বনা দেয়া। কিন্তু এতবড় দুঃখে সান্ত্বনা দেয়া বড় সহজ কথা নয়। কি বলিতে গিয়া কি বলিয়া ফেলিবে—এ ভয় হওয়া আদৌ অস্বাভাবিক নয়। তাই নীরবে সহানুভূতি জানানো ছাড়া আর কোন পথ থাকেনা। তা ছাড়া আরও একটা বড় কথা এই যে এই দুঃখের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক করাও শোভা পায়না। বেশি কথা বলিলে দুঃখ-পীড়িত মানুষকে বেশি সহানুভূতি জানানো হয় না বরং যে ব্যক্তি এইভাবে সহানুভূতি জানাইতে চায় তার অন্তঃসার-শূন্যতাই প্রকাশ হইয়া পড়ে।

ঘনশ্যাম বিজয়ের অভিভূত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, অবিশ্যি ভাববার কিছু নেই। সে যাদের জিম্মায় আছে তারা বড় কেউ-কেটা নয়—সবাই ভালবাসে হরিহরকে।

তবু দুঃখের মাঝে সেইটুকুই যা' ভরসা, বিজয় এবার যেন কথা কহিতে পাইয়া হাঁফ ছাড়িল। সে কহিল, আমি তো শুনে কেমন ঘাবড়ে গেছি।

না ঘাবড়াবার কিছু নেই, ঘনশ্যাম কহিল, তা সে যাক্ এতক্ষণ তো আমার কথাই হ'ল—গাঁয়ের সব কি ব্যাপার বলদিকি?

আর কি ব্যাপার ! বিজয় একে একে সেই কীর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া ওপাড়ার কালীপূজা করা, কুসুমের ঘরে আগুন দেওয়া, পঞ্চুর বিশ্বাসঘাতকতা, দারোগার তদন্ত, যোগেশবাবুর বোর্ড অফিসে বসিয়া ইনাইয়া-বিনাইয়া কুসুমের কুৎসা রটানো—সবকিছু কথাই বলিল।

ঘনশ্যাম সব শুনিয়া কেমন যেন চঞ্চল হইয়া পড়িল এবং বলিয়া উঠিল, সেই জন্যেই কুসুম তখন এসেছিল নয় ?

—হ্যাঁ।

—তা আমার তখন এমনি অবস্থা যে আমি আর দাঁড়াতে পারছিলুম না। আমি তোর কাছেই পাঠিয়ে দিলুম। তা কি হ'ল বলদিকি ?

—গিয়ে যোগেশবাবু আর দারোগাবাবুকে দিলুম আচ্ছা ক'রে শুনিয়ে !

এই তো চাই, ঘনশ্যামের মনের মধ্যে এমনি একটা ভাব খেলিয়া গেল। বিজয় উহাদের কি শুনাইয়া আসিয়াছে বুড়ার বোধ করি তা জানিবারও অবসর হইলনা—শুনাইয়া আসিয়াছে ইহাতেই বুড়ার আনন্দ এবং ঠিক সেই জন্যই এই ছেলেটির উপর তার স্বতঃ উৎসারিত আশীর্ব্বাদ-ধারা যেন ঝরিয়া পড়িল।

এমন সময় শশী আসিয়া ডাকিল, ঘনশ্যাম আছো নাকি হে ?

কে, ঘনশ্যাম হাঁকিল।

আমি শশী, শশী কহিল, বেশ লোক তো যা'হোক—এই আসো এই আসো ব'লে আমি সবাইকে বসিয়ে রেখে এসেছি আর তোমার কিনা যাবার নামটি নেই ?

ঘনশ্যাম ও বিজয় মুখ চাওয়াচায়ি করিল। কাদের বসাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে শশী ? ঘনশ্যাম কহিল, এই যে এবার যাব—

বিজয় কহিল, কাদের সবাইকে বসিয়ে রেখে এসেছ গো খুড়ো ?

বিজয় এখানে আছে শশী বুঝিতে পারে নাই। তাই সে কথা কহিতেছে শুনিয়া শশী বলিয়া উঠিল, তুইও আছিস এখানে ? তারপর অনুযোগ এবং

তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলিল, আচ্ছা লোক তো তোরা—তোরা মনে করিস্ তোদের জন্যে আর ভাববার কেউ নেই, নয় ?

এই একটি কথাতেই শশীকে বোঝা যায়। বিজয় লজ্জিত হইয়া পড়িল। তবু কথাটাকে চাপা দিয়া সে ভিন্ন কথায় যাইবার উদ্দেশ্যে কহিল, কারা এসেছে সব বলো না ?

শশী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আস্‌বে আর কারা—এসেছে ডিহিবাৎপুর থেকে ইয়াসিন আর শরৎ তাঁতী, রণবাগপুরের হারাণ কামার, কেষ্টবাটীর দশরথ জেলে। কথাগুলি বলিয়া শশী বোধ হয় আকাশের দিকে তাকাইল। তারপর কহিল, এখন তোমরা দয়া ক'রে পা চালিয়ে এসো—উদিকে আকাশে মেঘ ক'রেছে।

মেঘ ক'রেছে, বিজয় যেন লাফাইয়া উঠিল। তারা গল্প-গুজবে টের পায় নাই আকাশে কখন মেঘ জমিয়াছে। আকাশের মেঘ এখানকার মানুষের যে কত প্রিয় তা ইহারাই জানে। মেঘ দেখিয়া ইহাদের 'তন্বী শ্যামা শিখর দশনার' কথা মনে পড়েনা—ইহাদের মনে পড়িয়া যায় 'এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে'-র সেই নয়নরঞ্জন মনোমুগ্ধকর দৃশ্যটুকু। তাই বিজয় আনন্দ ও উৎসাহে বলিয়া উঠিল, জ্যাঠা আর নয়—চলো।

তুই যাবি আমাদের সঙ্গে, ঘনশ্যাম প্রশ্ন করিল।

বিজয়ের চোখের সুমুখে ভাসিয়া উঠিল প্রতীক্ষারত কুসুমের মূর্ত্তি। এ অবস্থায় বিজয় ঘনশ্যামের সহিত যায় কি করিয়া ? কুসুম হয়ত এখনও তার জন্য দাওয়ায় বসিয়া বসিয়া অপেক্ষা করিতেছে! তাই সে বলিয়া উঠিল, না।

ঘনশ্যাম কহিল, তাহ'লে আর দেরী ক'রে লাভ কি, তুই এসো—আমি আর শশী যাচ্ছি।

সেই ভাল, বিজয় মাচা হইতে নামিয়া পড়িল। নামিয়া প্রথমেই শশীকে প্রশ্ন করিল, ওরা এসেছে কেন গা ?

কাগজ বিলিয়ে কাল সব ফুট্-কমিটির মিটিং ডেকেছে বাবুরা, শশী কহিল, সেইজন্যেই ওরা এসেছে।

ও, বিজয় কহিল, তা আমাদের কি ক'রতে হবে?

ক'রতে হবেনা কিছু, শশী কহিল, সেই সেবারে লোকের ধান চাল লেখবার জন্যে যে কমিটিগুলো হয়েছিল সেগুলোকেই ওরা ফুট-কমিটি বলে চালাবে ঠিক করেছে। কিন্তু ইদিকে গাঁয়ের যা' আবস্থা চাল চাল ক'রে—তাতে সেইসব কমিটিগুলো ফুট্-কমিটি হ'লে তো খুব হবে। বাবুদের দাপটে গরীব আর খেতে পাবেনা—

তা নিশ্চয়, বিজয় বলিল।

শশী কহিল, তাই ওরা এসেচে, কাল যাতে আমরা সব দল বেঁধে মিটিঙে যাই সেকথা বল্‌তে।

হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের সব যাওয়া দরকার বৈকি, বলিয়া বিজয় নিজের গন্তব্য স্থলের উদ্দেশ্যে পা বাড়াইল।

কিরে, শশী কহিল, দুকুরে কি হ'ল কৈ তা তো বল্‌লি না।

—জ্যাঠার কাছ থেকে শুনে নিও।

আরে শুনে কি আমি নিইনি, শশী কহিল, তোরা এমনিই। কে যে কি চায় তা তো তোরা বুঝলি না।

বিজয় বেশ বুঝিল শশী অভিমান করিয়াছে। তার নিকট হইতেই সে দুপুরের ব্যাপারটা শুনিতে চায়—অথচ বিজয় তাকে তা শোনায় নাই বলিয়া তার তো অভিমান হইতেই পারে।

বিজয় ঘুরিয়া দাঁড়াইল। অবশ্য শশীর উদ্দেশে নয়—ঘনশ্যামের উদ্দেশে। সে কহিল, ভালকথা মনে পড়েছে জ্যাঠা—

—কিরে?

—আকাশে দেবতা যেভাবে ঘনিয়ে আস্‌ছে তাতে বাবু কাল আর ও আদর্শগ্রাম-ট্রামে যাচ্ছিনা—আমি মনে করছি কাল রুইব।

কথাটাকে সমর্থন করিয়া শশী কহিল, তা নয়ত কি—তৈরী জমি আমরা ফেলে রাখব?

সেই জন্যেই বল্‌ছি, বিজয় কহিল, আমাকে ডেকো কিন্তু—

আচ্ছা আচ্ছা, ঘনশ্যাম কহিল।

বিজয় নিশ্চিন্ত মনে পথ চলিতে লাগিল।

৮

আগে হইতে মানুষ যা' ভাবিয়া রাখে তা বদলাইতে সম্ভবতঃ বেশি দেরী লাগেনা। বিজয় কুসুমের ওখানে না গিয়া সোজাসুজি বাড়ীতে আসিয়াই উঠিল।

পথে আসিতে আসিতে যেন রাজ্যের চিন্তা তার মাথায় ভিড় করিয়া আসিল। সে যেন কেমন আত্মহারা হইয়া গেল। কুসুমের ওখানে যাইবার জন্য সেই বৈকাল হইতে তার মনটা যাই-যাই করিতেছিল কিন্তু এমনই মজা যে, ঠিক যাওয়ার মুহূর্ত্তটিতেই তার সব ইচ্ছাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া না যাইবারই ইচ্ছা প্রবল হইয়া দাঁড়াইল এবং সেজন্য শেষ-পর্য্যন্ত সে যাইতেও পারিল না।

কুসুমকে ঘিরিয়া গ্রামের মধ্যে দুদিন ধরিয়া যে ব্যাপার ঘটিয়া গেল, সে ব্যাপারে যখন কারও কিছুই মাথাব্যথা নাই, তখন তারই বা অতো মাথাব্যথা কেন? দিনরাত্রি কুসুমের বাড়ী না হইলে যাদের চলিত না তারাই যদি এমন করিয়া সরিয়া থাকিতে পারে, তবে সেই বা পারিবেনা কেন? যেখানে অত্যাচারিতকে রক্ষা করা দরকার, সমবেদনার অমৃত-প্রলেপ নিয়া যেখানে সেই মানুষটার পাশে আসিয়া দাঁড়ানো দরকার—সেখানে বিজয় তো পিছাইয়া নাই। সে তার যথাসাধ্য করিয়াছে। সে কুসুমের ঘরের আগুন নিভাইয়াছে, তার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে সম্পদ সেই সম্পদকে লোকনিন্দার কুটিল উৎস হইতে সে বাঁচাইয়াছে, পরিশেষে তার দ্বারা সে তাকে আশ্বাস দিয়াছে—ভবিষ্যতের আশ্বাস, সম্মুখের অনন্ত জীবনপথের সুদৃঢ় আশ্বাস। সে আর কি-ই বা করিতে পারে?

তা ছাড়া পল্লীসমাজকে সে চিনে। মানুষ সব করুক—স্ত্রীলোক গোপনে

গণিকাবৃত্তি করিয়া বেড়াক, পুরুষ লম্পটগিরি করুক কিন্তু উপরে সিংহ-চর্ম্মাবৃত থাকিলেই হইল! এখানকার মানুষ তাকে মানিয়া নিবে! কিন্তু যা' মহৎ ও মহান্ তা যদি প্রকাশ্যে পালিশ করা না হয় অর্থাৎ দৃষ্টি-কটু বা বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হয় তা হইলে পল্লীসমাজের রক্তচক্ষু শাসকবর্গ তাকে কোনদিনই ক্ষমা করিবে না, তার বিরুদ্ধে অভিযান করিবার মহৎ অনুপ্রেরণায় আগ্নেয়গিরির মত তারা জ্বলিয়া উঠিবে। একথা বিজয় জানে।

অবশ্য শুধু যে সেই ভয়েই কুসুমের ওখানে যাইবেনা তা নয়—অনেক তো সে করিয়াছে, আর কেন তার বাড়াবাড়ি? ইহার পর তার আর কিছু করিবার যুক্তিই বা কোথায়?

কিন্তু কুসুম অত্যাচারিত।

ঠিক কথা। কিন্তু এইমাত্র ঘনশ্যাম জ্যাঠার মুখে তার যে সর্ব্বনাশের কথা শুনিয়া আসিল, সেও কি একটা অমানুষিক অত্যাচার নয়? গুপ্ত-ঘাতকের হাতে হরিহরের ছুরি খাওয়াটা নিশ্চয়ই অত্যাচারের একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

কিন্তু তবু যেন এ ব্যাপারটার মধ্যে কোথায় একটা ফাঁক রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিজয় সেই সব কথাই ভাবিতে থাকে। স্ট্রাইক সম্বন্ধে তার ধারণা খুব উঁচু। অথচ হরিহর সেই স্ট্রাইকেরই বিরুদ্ধে গিয়াছিল। কাজেই তাকে যারা মারিয়াছে তারা যে নিছক অত্যাচারই করিয়াছে এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। তাই হরিহরকে ঠিক কুসুমের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না।

অবশ্য ঘনশ্যাম তাকে বলিয়াছে যে লোকগুলা স্ট্রাইক করিতে চাহিয়াছিল সে লোকগুলা মজুরদের আপন-লোক নয়—তারা মালিক ও পুলিশের লোক। কাজেই তা যদি সত্য হয় তবে হরিহর স্ট্রাইকে বাধা দিয়া সম্ভবতঃ কোন অন্যায় করে নাই। তবে কে জানে আসল ঘটনাটা কি! এসব সত্য হইলে অবশ্যই হরিহর অত্যাচারিত। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তার প্রতি

সেই বা কতটুকু সহানুভূতি কার্য্যকরী ভাবে প্রকাশ করিয়াছে? ইহাতে আর কারও না হউক ঘনশ্যাম জ্যাঠার তো মনে হইতে পারে—বিজয়ের ওসব অত্যাচারিতের প্রতি সমবেদনা সহানুভূতি বাজে কথা, আসলে কুসুম স্ত্রীলোক বলিয়াই তার প্রতি অত দরদ। সত্যই তো—ঘনশ্যাম জ্যাঠা যদি এ রকম কিছু ভাবে তবে সে কি খুব অন্যায় করিবে? বিজয় যেন মনে মনে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

পথ চলিতে চলিতে যখন তার মনের অবস্থা এইরূপ তখন সহসা আকাশে মেঘ-গর্জ্জন করিয়া উঠিল, গুম্—গুড়-গুড়-গুর্-র্-র্-র্…

চিন্তাভারে বিজয়ের মাথাটা যেন কেমন ভারী হইয়া গিয়াছিল। মেঘ-গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সে যেন তা উপলব্ধি করিল। আর পারে না সে। এখন সোজা কোন একটা নিরাপদ ও নির্ভরশীল আশ্রয়ে পৌঁছাইতে পারিলে যেন বাঁচে। সহসা তার মনে পড়িয়া গেল বনমালার কথা। বৈকালে স্বামীর প্রশংসা শুনিয়া তার সেই গর্ব্ব-দৃপ্ত মুখখানি, সেই বিজয় বাহিরে আসিবার আগে ঘরের ভিতর হাসিতে হাসিতে পথরোধ করিয়া দাঁড়ানো, সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলে চাপাগলায় অথচ রীতিমত জোরে 'তাড়াতাড়ি ফিরো কিন্তু' আদেশ—এ সবই একে একে মনে পড়িয়া গেল। অনেক দিন বাদে সে যেন বনমালাকে এমন ভাবে দেখিতে পাইয়াছে। তাই সে আর কোনদিকে দৃক-পাত না করিয়া সোজাসুজি বাড়ীতে আসিয়া উঠিল।

কিন্তু বাড়ীতে পা দিয়াই সে শুনিল, কুসুম এতক্ষণ তারই জন্য অপেক্ষা করিয়া এইমাত্র চলিয়া গেল। কথাটা আবার শুনিল বনমালার নিকট হইতে। তাই সে হাসিয়া বলিল, কুসুমের ওপর তাহ'লে আর রাগ নেই দেখছি।

বোকো না, বনমালা কহিল, এত দেরীও ক'রতে পারো! আকাশ ডাকতে সুরু ক'রেছে আর সে থাকতে পারে, তাই চ'লে গেল।

—হঠাৎ তার ওপর এত দরদ কেন?

বিজয়ের গা ঘেঁষিয়া আসিয়া বনমালা কহিল, পোড়ারমুখিকে সতীন ক'রব বলে—

—তা'লে ভাল লেগেছে দেখছি।

সত্যিই কুসুম ভাল মেয়ে, বলিয়া বনমালা রান্নাঘরে চলিয়া গেল। পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, বাদল নাববে, খেতে দিই—তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।

হ্যাঁ, বলিয়া বিজয় কুসুম সম্পর্কে বনমালার ধারণার পরিবর্ত্তন দেখিয়া কি যেন ভাবিল। ভালই হইয়াছে সে কুসুমের ওখানে যায় নাই—গেলে সে নিশ্চয়ই আসিতনা; আর না আসিলে কুসুম সম্পর্কে বনমালার ধারণাও বদ্‌লাইতনা। যাক্ এ যেন শাপে বর হইয়াছে। ভগবান যা' করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।

বিজয় আনন্দিত মনেই আহার সারিয়া আসিল। বনমালা স্বামীকে তামাক দিয়া শ্বাশুড়ীকে খাইতে দিবার জন্য ডাকিল।

বিজয় দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে মায়ের উদ্দেশ্যে কহিল, মাগো ঘনশ্যাম জ্যাঠার বড় সর্ব্বনাশ হয়ে গ্যাছে—

রান্নাঘর হইতে মা বলিয়া উঠিল, কি সর্ব্বনাশ রে?

জ্যাঠার মেজছেলে, বিজয় মুখ হইতে একরাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিল, হরিহর খুন হ'য়ে গ্যাছে।

তারপর, সবিস্ময়ে মা প্রশ্ন করিল।

অবিশ্যি প্রাণে মারা যায়নি, বিজয় যেমন শুনিয়াছিল তেমনি ভাবেই কহিল, এখন হাঁসপাতালে আছে।

—বাঁচবে তো?

—হ্যাঁ বেঁচে যাবে।

—আহা-আ ভগবান রক্ষে করুন। কিন্তু হঠাৎ এরকম হবার কারণ?

বিজয় একে একে সব কথাই বলিল। মা শুনিয়া কহিল, বিজয় ঐজন্যেই আমি কল-কারখানায় তোকে যেতে দিইনি। কত লোক আমায় বলেছে—

এই তো গেরামের অবস্থা তা যাওনা শহর-বাজারে। কিন্তু আমি কিছুতেই রাজী হইনি। তা বুড়ো এখন কি ক'রছে ?

—কি আর ক'রবে। গেস্‌লো ছেলেকে দেখতে। তারপর ফিরে এসেছে আবার যাবে ব'লে।

—আহা-আ ছাখদিকিনি এই বুড়ো বয়সে মানুষটার কি জ্বালা!

আকাশ আবার গুড়্‌গুড় করিয়া উঠিল। বিজয় খাওয়া হইতেই আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিল অজস্র মেঘের সমাবেশে আকাশ কালো হইয়া উঠিয়াছে—সম্ভবতঃ ভোর রাত্রির দিকেই বৃষ্টি নামিবে। তাই অভ্যাসমত সে গরুগুলাকে একবার দেখিয়া নিয়া তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িবার চেষ্টা দেখিল।

মায়ের খাওয়া হইয়া গিয়াছিল। বুড়ী উঠানে আসিতেই বিজয় কহিল, দেবতা বোধ হয় আজ দয়া ক'রবে গো মা। তুমি কিন্তু ডেকে দিও—

—আচ্ছা।

বিজয় শুইয়া পড়িল। বনমালাও খানিক বাদে আসিল। ঘরে ঢুকিয়াই বনমালা বলিয়া উঠিল, মেয়েমানুষ শক্ত না হ'লে সোয়ামী জব্দ হয় ?

বিজয় কহিল, তার মানে ?

ও মা তুমি এখনও জেগে আছো, বনমালা খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ও ভারী আমার ইয়ে রে, বিজয় কহিল, আমি জেগে আছি না জেনেই কি তুই ওকথা বলিচিস্‌ ?

বনমালা আবার হাসিয়া উঠিল। কহিল, এবার যাওনা কুসুমের ওখেনে—দিয়েচি এক প্যাঁচ লাগিয়ে।

কি, কৌতূহলভরে বিজয় প্রশ্ন করিল। বনমালা বলিল, সে আর তোমার দিকে হাত বাড়াবেনা।

—ঐ সব কথা তুই বল্‌লি নাকি তাকে ?

কেন ভয় হ'চ্ছে নাকি, বনমালা কহিল। বিজয় কহিল, ভয় নয়—সে কি মনে ক'রবে বলদিকি ?

মনে আবার ক'রবে কি, বনমালা হাসিতে হাসিতে কহিল, মেয়েমানুষ হাতছানি না দিলে পুরুষ মানুষের সাধ্যি কি যে সে তার দিকে এগোয়।

—তুই কি ওরকম করিস নাকি ?

বনমালা বিজয়ের পিঠে গুম্ করিয়া একটা কিল বসাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, ভ্যাখো মুখ সামলে কথা বল্‌বে।

বিজয় দুই হাতে বউকে জড়াইয়া ধরিয়া টানিয়া নিয়া কহিল, নে আর খুনসুড়ি নয়—একটু ঘুমুতে দে। বিষ্টি এলেই উঠ্‌তে হবে। বীজ নিড়ুবো। ডাকলে তুই-ও উঠিস্ বাপু।

উত্তরপাড়ায় তখন গোপাল চক্রবর্ত্তীর কীর্ত্তনগান হইতেছিল। তারই সুর ভাসিয়া আসিতেছিল এপাড়ায়।

বনমালা বলিল, কোথায় কেত্তন হচ্ছে বলদিকি ?

—ওপাড়ায়।

—হঠাৎ ?

—বৈকেলে শুন্‌লি না ঠাকুরমশায়ের কাছে।

শ্রীপতি কি বলিয়াছিল বনমালা শোনে নাই। তাই সে কহিল, দলটাকে বুঝি ওরা বায়না ক'রে নিয়ে গেছে !

হ্যাঁ, বিজয় ঘুমাইবার চেষ্টা করিল।

রাত তখন কত কে জানে।

আকাশ ভাঙিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে। শুধু বৃষ্টিই নয়, তার সঙ্গে ঝড়ও উঠিয়াছে। আকাশে চলিয়াছে মেঘের সমারোহময় কোলাহল। মাঝে মাঝে বজ্র পতনের শব্দ হইতেছে। বিদ্যুৎ চমকাইতেছে মুহুর্মুহুঃ। সহসা বিজয়ের ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া আলো জ্বালিল। বনমালা অঘোরে ঘুমাইতেছিল, তাকে ঠেলা দিয়া সে বলিয়া উঠিল, এই ওঠ্ ওঠ্—দেবতা নেবেছে।

বনমালা উঠিয়া বসিল বটে কিন্তু আবার শুইয়া পড়িল। বাহিরে বর্ষার প্রচণ্ড সুর, ঝড়ের মাতামাতি, বজ্রপতন আর বিদ্যুতের ইসারা—সবকিছু মিলিয়া যেন মায়া-মুখর করিয়া তুলিয়াছে প্রকৃতিকে। এরকম রাতে তার জাগিয়া থাকিবারই কথা কিন্তু জাগিয়া থাকিবে সে কি নিয়া—স্বামী ঘুমাইবার আগে বলিয়াছে, 'আর খুনসুড়ি নয়।' ঘুমের ঘোরে তার বীজ নিড়ানোর কথা মনে পড়ে নাই—মনে পড়িয়াছে খুনসুড়ি না করার কথা। হয়ত হতভাগিনী ঐকথা মনে করিতে করিতেই ঘুমাইয়াছিল।

বিজয় বলিয়া উঠিল, আবার যে শুয়ে পড়লি রে?

'এঁ্যা, বনমালা চোখ মেলিল।

বিজয় কহিল, ওঠ্ ওঠ্—বীজ নিড়ুতে হবে যে।

ইহা মানুষের ঘুম-ঘোরে স্বপ্ন-মধুর আলস্য-যাপনের কথা নয়—পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার, সাংসারিক জীবনকে বাঁধিয়া রাখিবার আবিষ্কৃত অতি-সত্য বাস্তব কথা। বনমালা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল। বিজয় কহিল, শাবলটা নে দিকি—কে জানে জমি হয়ত শক্ত হয়ে আছে।

হইবেও বা। জল নাই কতকাল ধরিয়া। বীজে বীজে গাঁট হইয়া গিয়াছে। আর তারই শিকড়ে শিকড়ে জমিও কুঁদো-মিছরীর দানার মত জমিয়া জমাট হইয়া গিয়াছে। দাওয়ার এক কোণে শাবল ছিল। বনমালা কহিল, চলো দাওয়া থেকে নিয়ে যাচ্ছি শাবল।

কিন্তু টোকাটাও তো নিতে হয়—লণ্ঠনটা টোকার নীচে বসিয়ে রাখব, বলিয়া বিজয় ঘরের দরজা খুলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। বনমালাও বাহির হইয়া পড়িয়া কহিল, হ্যাঁগা শুধু শাবলই—কোদাল নোব না?

হ্যাঁ হ্যাঁ কোদালটাও নে, বিজয় কহিল, খানা খুঁড়ে জল জমাতে হবে—বীজের গোড়াকার মাটি গুলো না ধুলে গোছগুলো ন-মণ ভারী হয়ে থাক্‌বে।

অতঃপর বনমালা শাবল ও কোদাল নিল—বিজয় নিল টোকা ও লণ্ঠন। বাড়ীর পিছনে ভিটার সংলগ্ন একটু জমিতেই বীজ ছড়ানো হইয়াছিল।

প্রতি বছর বিজয় এইখানেই বীজ তৈরী করে। এবারেও সময় মত বীজ বুনিয়াছিল কিন্তু বৃষ্টির অভাবে বীজ আর তুলিতে হয় নাই। বহু চারার মধ্যভাগ মোটা হইয়া গিয়া সেখান হইতে যেন একটা শাখা বাহির হইয়া গিয়াছে। এসব চারা রোপণ করিলে গাছ বেশি বড় হইবেনা এবং ইহাতে একটি দুটির বেশি শিষও বাহির হইবেনা। কাজে কাজেই ধানের ফলন যে স্বাভাবিক ভাবেই কমিয়া যাইবে, তা জানা কথা।

তবু ইহা ছাড়া আর সম্বল কোথায়? গত আশ্বিনের ঝড়ে ও আগষ্ট হাঙ্গামার দিনে বহু চাষী ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল—সেই ক্ষতির পরে বীজধান রীতিমত একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এমতাবস্থায় বীজে গাঁট হইয়াছে বলিয়া তা নষ্ট করিয়া দিয়া পুনরায় বীজ ছড়াইবার সামর্থ্য কারও ছিলনা। তাই এই বীজেই সকলকে রোপণ কার্য্য সমাধা করিতে হইবে।

টোকাটা একটা কঞ্চির ঠেকনো দ্বারা আড়া-আড়ি দাঁড় করাইয়া দিয়া তার নীচে লণ্ঠনটা রাখিয়া বিজয় কোদাল হাতে বীজ-জমির একপাশটায় খানা খুঁড়িয়া ফেলিল। ইতিমধ্যেই জমিটায় বেশ জল জমিয়াছিল। খানা পাইয়া সে জল গড়াইয়া আসিয়া সেখানেই জমা হইল।

বিজয় বনমালাকে কহিল, ছ্যাখ্ আমি যেখানে যেখানে বলব তুই অম্‌নি সেখানে সেখানে শাবলের চাড়া লাগাবি।

বনমালা শাবল হাতে বিজয়ের কাছাকাছি গিয়া দাঁড়াইল। কতকগুলি চারাকে একসঙ্গে ধরিয়া বিজয় সওয়াইয়া সওয়াইয়া টান দিতে লাগিল। কেননা এভাবে না টানিলে চারাগুলি মাঝখান হইতে ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। তাই প্রতিবারই সে অত্যন্ত সন্তর্পণে টান দেয় আর চারাগুলি উঠিয়া আসে। কিছু কিছু জায়গায় জমি শক্ত ছিল—সেখানে বনমালা শাবলের চাড়া দেয় আর ধান চারাগুলি উঠিয়া পড়ে। চারাগুলি তুলিয়া তুলিয়া গোছা বাঁধিয়া বিজয় সেগুলাকে, সেই খুঁড়িয়া রাখা খানার জলে ফেলিয়া দেয়।

মাথার উপরে বর্ষণ-মুখর অজস্র মেঘ, বিদ্যুতের হানাহানি, বনে-বনান্তরে

বিপর্য্যস্ত বৃক্ষশাখার নিরবচ্ছিন্ন একটানা হাহাকার, বৃষ্টির ফোঁটা মুক্তাধারার মত বিদ্যুতের আলোয় উদ্ভাসিত—এমন সময় এম্‌নিভাবে বীজ নিড়ানোয় রত তারা দুটি প্রাণী, স্বামী ও স্ত্রী।

ঝড়ের ঝাপটায় বৃষ্টির চাবুক অনবরত তাদের সর্ব্বাঙ্গে আসিয়া পড়ে। হাড়ের মধ্যেও যেন তার আঘাত গিয়া পৌঁছায়। তবু জীবন ধারণের জন্য, সংসার যাত্রার জন্য, মানুষের জয়যাত্রাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য দুর্য্যোগময়ী নিশীথিনীর এই মহাভয়ঙ্কর শ্মশান-অট্টহাসির আবেষ্টনীর মধ্যে নীলকণ্ঠের মত তাদের এম্‌নিভাবে কাজ করিয়া যাইতে হয়। জীবনের পক্ষে ইহা তাদের অনতিক্রমণীয়।

বিজয় কহিল, ইঃস্ এরকম বাদল যে এবারে একদিনও হয়নি রে!

তাই তো দেখ্‌ছি, বনমালা কহিল।

দুর্য্যোগের এই রাত যত ভয়ঙ্করই হোক্ তবু তারা পরস্পরের কাছাকাছি থাকিতে পারিয়াছে, এই যেন তাদের পরম সান্ত্বনা।

বিজয় কহিল, কেমন লাগ্‌ছে তোর বলদিকি?

—আমার কিন্তু ভয় ক'রছে বাপু!

—ভয় কিরে! আমি তো রয়িচি!

বিজয় কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই এমন একটা কড়্-কড়্-কড়াৎ করিয়া শব্দ হইল যে বনমালা লাফাইয়া একেবারে বিজয়ের কাছে সরিয়া আসিল এবং পরক্ষণেই দেখা গেল অদূরে একটা তাল গাছের মাথা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে।

বিজয় বনমালার রকম দেখিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল ও বলিল, ধ্যেৎ ভীতু কোথাকার—

হ্যাঁ ভীতু বৈকি, বনমালা জ্বলন্ত-মস্তক তাল গাছটার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, ভ্যাখো দিকিন—

—তা ওতে কি হয়েছে?

—যদি ওটা আমার মাথায় পড়ত ?

তুইও জল্‌তিস্‌ অম্‌নি ক'রে, বিজয়ের মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি খেলিয়া গেল। তাই সে কহিল, অবিশ্যি তোর মাথায় না পড়ে আমার মাথায়ও তো পড়তে পারতো ?

হ্যাঁ পড়ত, বনমালা একেবারে ফুঁসিয়া উঠিয়া বলিল, ওরকম ওলুক্ষুণে কথা বোল না কিন্তু।

বিজয় বীজের গোছা বাঁধিতে বাঁধিতে কহিল, ওরে হাজার হোক তুই মেয়ে ছেলে—তোর চেয়ে বুদ্ধি আমার অনেক বেশি। কেমন দিলুম তো উল্টো চাপ ?

—তোমাদের স্বভাবই তো ঐ। পুরুষমানুষগুলো ভারী পাজী।

ভেংচি কাটিয়া বিজয় কহিল, শুধু কাজের বেলায় কাজী—না ?

—হ্যাঁ তো।

তা না হয় হ'ল, বিজয় কহিল, কিন্তু কাঁপুনি ধরে গেল যেরে !

বনমালাও কাঁপিতেছিল। কিন্তু সে কহিল, তুমি-আর মুখ নেড়ো না।

—কেন ?

—সেই সন্ধে থেকে বলে আমি—

—যাক্‌ আর বল্‌তে হবে না।

—তবে আর বলছ কেন কাঁপুনি ধরে গেছে। ইচ্ছে ক'রলেই তো গরম হতে পারো।

—পোড়ারমুখি একটু সামলে বল না—ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছো। পাশের ঘরেই মা রয়েছে শুনতে পাবে যে। লজ্জাও করে না !

—আমি তো আর ষাঁড়ের মত চেঁচাই নি।

—হুঁ। এখন ওসব কথা রেখে শাবলের একটা চ্যা—ড়া লাগা দিকি ?

বনমালা চ্যা—ড়া কথাটা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল। বিজয় কহিল, আচ্ছা মেয়ে জন্মেছিলি বাবা; কথাগুলা বলিয়া এমন এক ভঙ্গীতে সে

বনমালার দিকে তাকাইল যে বনমালা না হাসিয়া পারিল না। কিন্তু সে স্ত্রীলোক, লজ্জা তার জন্মগত বস্তু। সে কহিল, ওরকম ক'রবে তো আমি পালাবো কিন্তু—

কিন্তু নিজেই বা বাকী রেখেছ কতটুকু, বলিয়া বিজয় বীজের গোছাগুলি বাগাইয়া ধরিল।

একটা না হয় বেফাঁস কথা বলেই ফেলেছি, বলিয়া বনমালা বিজয়ের হাতের মুঠায় বীজগুলির তলদেশে মাটির ভিতর শাবল চালাইয়া দিল। বিজয় চট্‌ করিয়া বাঁ-হাতে তার গালে একটা টোকা মারিয়া বলিয়া উঠিল, বারে কিরসেননি!

এমনি করিয়া হাস্য-পরিহাসের ভিতর দিয়া তাদের স্বামী-স্ত্রীর কাজ চলিতে লাগিল। জীবন এখানে যেমনি, ঠিক তেমনি ভাবেই ইহাদের কাটাইতে হইবে। তবু তারি মাঝে মানুষকে খুঁজিয়া নিতে হইবে আনন্দ, জীবনের অনুপম ঐশ্বর্য্য।

অনেকগুলি গোছা ইতিমধ্যেই গর্ত্তের জলে পড়িয়াছে। ঐ গোছাগুলি ভোরবেলা বিজয় কাঁধে ফেলিয়া তার জমিতে যাইবে। তারপর মাটির নীচে যতখানি হাত যায় ততখানি হাত চালাইয়া চারাগুলির গোড়া গুলিকে পুঁতিয়া দিবে। এমনিতরো ভাবে একটি একটি করিয়া চারাগুলি রোপণ করিতে তার সারাদিন কাটিয়া যাইবে।

অবশ্য সে পরিশ্রম ইহাদের কাছে কিছুই নয়। সমগ্র মাঠ যদি হাসিয়া উঠে কচি ফসলের সবুজ শোভায়, তবেই এই পরিশ্রম সার্থক হইবে, তা না হইলে কেহই ইহার দাম দিবে না—এমন কি অতিপ্রিয় আত্মীয় স্বজনও নয়।

তারপর একটি একটি করিয়া দিন যাইবে, গাছগুলি বাড়িয়া উঠিবে, গাছে গাছে শিষ জন্মাইবে ধানের ফসলে মাঠ ভরিয়া উঠিবে। মানুষের মনে মনে জীবনের চারিভিতে জাগিয়া উঠিবে সেই ফসলের সাড়া!

ওদিকে তখনও সেই বজ্রদগ্ধ তালগাছটা টিম-টিম করিয়া জ্বলিতেছিল। বিদ্যুৎও চমকাইতেছিল ঘন ঘন। বর্ষণেরও বিরাম নাই। ঝড় ক্রুদ্ধ আক্রোশে গর্জ্জন করিতেছে তো করিতেছেই।

বিজয় ও বনমালার যেন ভ্রূক্ষেপই নাই। কাজ, কাজ—জীবন সংগ্রামে টিঁকিয়া থাকিবার অসম্ভব প্রয়াস, কঠিন অথচ সুন্দর কাজ।

৯

পরদিন বৈকালে ফুড কমিটির সভা। তাই সকাল হইতেই গ্রামগুলিতে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। 'চাল' 'চাল' করিয়া যাদের ভাবনার অন্ত নাই কিম্বা ইতি-মধ্যেই যারা চাল কিনিতে পারে নাই তারা ভাবিতেছে সম্ভবতঃ ফুড কমিটির সভাটা হইয়া গেলেই, ব্যবস্থা একটা হইবেই। তাই তারা সকাল হইতেই ইউনিয়ন বোর্ড অফিসের সুমুখে ধর্ণা দিতে সুরু করিয়াছে।

অবশ্য শুধু যে গ্রামবাসীরাই আসিয়াছে তা নয়—বোর্ড অফিসের মধ্যে যোগেশবাবুর সাঙ্গোপাঙ্গরা আসিয়াও জুটিয়াছে। ভট্‌চায, টাকার কুমীর অধর কুণ্ডু, ডিহিবাৎপুরের ইব্রাহিম প্রভৃতি কেউই বাকী ছিল না। এমন কি পঞ্চু বলাই প্রভৃতিও আসিয়াছে।

বৈকালে সভায় যাতে নিজস্ব লোকজন বেশি থাকে এবং কমিটি গঠন করিতে গিয়া যাতে কোনরকম বেগ না পাইতে হয়, তারই আলোচনা চলিতেছিল। যোগেশবাবু এক-একজনকে ইউনিয়নের এক-একটি গ্রামে গিয়া নিজেদের লোকজনকে বুঝাইয়া সভায় আনিবার জন্য পরামর্শ দিলেন।

ভট্‌চায্ কহিলেন, সব জায়গাকার লোককে পার আছে—শুধু পার নেই দক্ষিণপাড়ার লোককে আর ইব্রাহিমের গাঁয়ের লোককে।

পঞ্চু বলিল, তা যা' বলেছেন—

ইব্রাহিম বৃদ্ধ মুসলমান। মুখে একমুখ দাড়ি। পাজামা ও চাপকান পরা, মাথায় ফেজ টুপি। একটা চোখ কানা। সে বলিয়া উঠিল, দেখুন আমার গাঁয়ের লোক ঠিক খারাপ নয়—তবে ব্যাপার কি জানেন কংগ্রেস-টংগ্রেস, কৃষক সমিতি-টমিতি, এইসব নানান্ দলের টানা-পোড়েনে ঐরকম হয়ে উঠেছে।

ভট্‌চায্‌ কহিলেন, তুমিতো তাদের বাগ মানাতে পারো না?

—না বাগ মানানো তাদের অসম্ভব।

তা হ'লেই, ভট্‌চায্‌ নিজের কথার সমর্থনের ভঙ্গীতে হাসিয়া উঠিলেন। তারপর চিন্তিতভাবে কহিলেন, তা না হয় হ'ল কিন্তু আমায় যে এখন উঠতে হয় একবার!

যোগেশবাবু প্রশ্ন করিলেন, কেন হে?

আমি যাব বিজয়-টিজয়ের কাছে, ভট্‌চায কহিলেন, রাতে অমন জলটা হয়ে গেছে, মাটি নরম হয়েছে—এ অবস্থায় জমিতে লাঙ্গল না পড়লে আর কখন লাঙ্গল পড়বে। তাছাড়া এস্‌-ডি-ও, সার্কেল অফিসার আসছে, লাঙ্গল পড়াটা একবার তাদের দেখাতেও তো হবে। তা না হ'লে আদায় হবে কেন?

ঠিক, যোগেশবাবু বলিলেন, এইজন্যেই তো তোমায় তারিফ করি ভট্‌চায।

ভট্‌চায আত্মগর্ব্বে হাসিলেন।

ইব্রাহিম কহিল, আমিও উঠি—লোকগুলোকে আবার নিয়ে আসতে হবে তো?

হ্যাঁ, যোগেশবাবু কহিলেন, কিন্তু যারা বাগ মানবে না তাদের কাউকে নিয়ে এসো না যেন—

না না, ইব্রাহিম উঠিয়া পড়িল।

অধর হাই তুলিয়া বলিয়া উঠিল, গোবিন্দ বল মন—গোবিন্দ বল। আমিও উঠি—

তা না হয় উঠলে কুণ্ডু, যোগেশবাবু কহিলেন, কিন্তু টাকার থলি রেডী রেখ—গভর্ণমেণ্ট কখন চাল দেয় বলা তো যায় না।

সে আর বলতে হবে না, অধর কহিল, আগে আপনার গভর্ণমেণ্ট চালই দিক।

পঞ্চু, বলাই প্রভৃতি হাসিয়া উঠিল।

ভট্চায্, ইব্রাহিম, অধরকুণ্ডু প্রভৃতি সব একে একে চলিয়া গেলে যোগেশবাবু পঞ্চুর উদ্দেশ্যে কহিলেন, পঞ্চু বাবা তোমাদের এখন একটু ভাল করে লাগতে হয়। বুঝতেই পারছ তো ফুড্ কমিটির ইলেকশন নিয়ে কি হবে। ফুড্ কমিটি আমাদের হাতে না থাকলে দেশের ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে। সেইজন্যে বলছিলুম কি তুমি, বিশেষ করে পশ্চিমপাড়া গ্রামের দক্ষিণ পাড়াটা, নিমডাঙী, তকীপুর, হন্সেখালী, গ্রামগুলোর ভার নাও—এইসব জায়গা থেকে বেছে বেছে লোক নিয়ে আসবে।

সে আমায় বলতে হবে না, পঞ্চু কহিল, কালই সব আমি বলে রেখে দিয়িছি।

বেশ ক'রেছ কিন্তু, যোগেশবাবু বলিলেন, ওদের মানে, আমাদের বিরুদ্ধ দলকে বিশ্বাস নেই। ওরা হয়ত রাত দুপুরে গিয়ে আবার তাদের ভুল বুঝিয়ে এসেছে।

তা অসম্ভব কিছু নয়, পঞ্চু কহিল, কালই রাত্তে আমি লক্ষ্য করিছি শশীখুড়োর বাড়ীতে। আচ্ছা আমি এখুনি বেরুচ্ছি।

সকলে চলিয়া গেলে যোগেশবাবু একাকী অফিস ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে লাগিলেন। তাঁর ললাটে পড়িয়াছে চিন্তার রেখা, মনেও যেন কিসের আন্দোলন সুরু হইয়াছে।

ঐ পায়চারী করা মানুষটিই হইতেছে যোগেশবাবুর আসল মূর্ত্তি। ঐ মূর্ত্তিতেই যেন যোগেশবাবুকে ঠিক ঠিক চেনা যায়। রাশভারী, দেমাকওয়ালা লোক—ইহাই যোগেশবাবুর আসল পরিচয় নয়।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। ছেলেবেলায় মা-বাপ হারাইয়া যোগেশবাবু সামান্য জমি-জমার উপর নির্ভর করিয়া নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখিয়া সেক্রেটারিয়েট-দপ্তরে সরকারী চাকুরী করেন। বিশ বৎসর একাদিক্রমে

চাকুরী করার পর গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া তিনি এই গ্রাম্য-রাজনীতিতে আত্ম-নিয়োগ করেন।

যোগেশবাবু যে-যুগে মানুষ সে যুগে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযাত্রার মধ্যে দুইটি ধারা ছিল। একটি ধারা ছিল—লেখাপড়া শিখিয়া চাকুরী ইত্যাদি করা এবং অবসর সময়ে দেশসেবা করা। দেশসেবা মানে এই নয় যে, কংগ্রেসে যোগ দেওয়া বা বক্তৃতা করা বরং ঠিক তার বিপরীত। সে যুগে এই ধারার আওতার মধ্যে যাঁরা পড়িতেন, তাঁরা গ্রামের বিদ্যালয়, পাঠাগার, সেবাশ্রম, দরিদ্রভাণ্ডার স্থাপন, অথবা গ্রামের খালবিল, দেবালয়, বারোয়ারীর সংস্কার-সাধন ইত্যাদি নিয়া নিজেরা তো মাতিয়া উঠিতেনই এবং আরও পাঁচজনকে মাতাইয়া তুলিতেন। এক কথায় বাংলাদেশে যে সামাজিক শাসন-অনুশাসন ও সাংস্কৃতিক স্রোত-প্রবাহ অবিচ্ছিন্নভাবে বহিয়া চলিয়াছে, ইহা তাঁদেরই একনিষ্ঠ সাধনার ফল। যদিও ইঁহারা ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন কিন্তু তা হইলেও স্বদেশী-জীবনে যে গণতান্ত্রিক দিকটা অর্থাৎ বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রভাব ইঁহাদের উপর ছিল—ইঁহারা তা হইতে বিচ্যুত হন নাই।

অন্যদিকে যে দ্বিতীয় ধারা বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের মধ্যে ছিল তা হইতেছে ঠিক ইহার উল্টা। তাঁরা ইংরাজী শিখিয়া ইংরাজের অফিস আদালতে চাকরী করিয়া ইংরাজী আমলাদের মত স্বভাবলাভ করিতেন। শঙ্করাচার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া ভট্টপল্লী পর্য্যন্ত যে সাংস্কৃতিক প্রবাহ তার সহিত এই ইংরাজী আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের যথেষ্ট মিল আছে। এই দুয়ের প্রভাবে এই ধারার লোকেরা দেশের লোককে ঘৃণাই করিতেন আর সবকিছুর চেয়ে বেশি। এবং ঘৃণা যেখানে জীবনযাত্রার পথ-প্রদর্শক সেখানে মানুষের উপর এক-নায়ক-তান্ত্রিক শাসনের কথাই আসে সবচেয়ে আগে। দেশের লোক কিছু জানে না, তাদের জানিবার বুঝিবার মত কোন ক্ষমতা নাই—সর্ব্বজ্ঞ পরিচালকই শুধু তাদের চালাইয়া নিয়া যাইতে পারে—এই ধারণা তাদের

মনে বদ্ধমূল। তা ছাড়া আরও একটা ধারণা এই ধারার লোকেদের মনে থাকে এবং তা হইতেছে 'ছোটলোকদের' শাসনে না রাখিলে চলে না।

যোগেশবাবু এই শেষোক্ত ধারার আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ। তা ছাড়া তাঁর জীবনের আরও একটা দিক ছিল—তিনি স্বয়ংগঠিত মানুষ। বাল্যকালে মা-বাপ হারাইয়া নিজে দুঃখ-কষ্ট করিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, নিজের চেষ্টায় পথ কাটিয়া জীবনের সুমুখ পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেজন্য গভীর আত্ম-বিশ্বাসে তিনি অনমনীয়।

সংসার-যাত্রার পথে একদা তিনি সবই পাইয়াছিলেন। কিন্তু এক ধন-দৌলত ছাড়া আর কিছু তাঁর ভাগ্যে স্থায়ী হয় নাই, সবকিছুই জীবনপথের অলিতে-গলিতে হারাইয়া আসিতে হইয়াছে।

যোগেশবাবু বিবাহ করিয়াছিলেন এবং একটি পুত্রসন্তানও হইয়াছিল। কিন্তু পুত্র যখন বছর পাঁচেকের তখন স্ত্রী গেলেন ইহলোক ত্যাগ করিয়া এবং পুত্র গেল তিনি যখন গ্রামে আসিয়া পল্লী-স্বায়ত্বশাসনের প্রাণকেন্দ্রে বেশ জাঁকাইয়া বসিয়াছেন, তখন। পুত্রটিকে পড়াইয়া শুনাইয়া তিনি প্রায় নিজের মত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ডিগ্রীটুকু পর্যন্ত-ও সে হস্তগত করিয়াছিল। কিন্তু জনশ্রুতি এই যে, ইউনিয়ন বোর্ড দলাদলিতে একদা নাকি যোগেশবাবু আশু ডাক্তারের ভাইকে গুম-খুন করিয়াছিলেন—তাই আশু ডাক্তারের সমর্থকেরা তাঁর সেই উপযুক্ত পুত্রকে জলে ডুবাইয়া হত্যা করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

পুত্রের এই হত্যাকাণ্ডের পর হইতে যোগেশবাবু যেন দিন দিন কেমন ভাঙিয়া পড়িতেছেন। অবশ্য তিনি এসম্বন্ধে রীতিমত সচেতন। তিনি জানেন যে তিনি ভাঙিয়া পড়িতেছেন। কিন্তু মুস্কিল এই যে তিনি ইহা জানেন বলিয়াই তাঁর কেমন যেন ভয় হয়। এবং এই ভয়ের দরুণই তিনি গভীর আত্মবিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও যার পর নাই কঠিন ও নির্দ্দয় হইয়া উঠেন।

এই কাঠিন্ত ও নির্দ্দয়তার মাত্রা যে সময় সময় বহুদূর-বিস্তৃত হইয়া পড়ে তা বলা বাহুল্য। কেননা সংসারে তাঁর পিছন-টান বলিয়া কিছু নাই।

একাধারে তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বার, মহকুমা আদালতে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট। কাজেই তাঁর জীবনপথে যে-কোন বাধা উত্তীর্ণ হইতে খুব বেশি সময় লাগে না।

তবু ভয়, জনতার ভয়। জনতা তাঁর ছেলেকে ডুবাইয়া মারিয়াছে, জনতা তাঁকে সবচেয়ে বড় আঘাত দিয়াছে এবং তাদের ক্ষমতাও আছে।

কেমন করিয়া যেন তাঁর মনে হয় জনতা বুঝি তাঁরই উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। কে জানে ফুড-কমিটির সভায় কি হইবে! এবং ঠিক সেইজন্যই তাঁর ললাটে পড়িয়াছে রেখা, মনে উঠিয়াছে আন্দোলন!

মাঠে রোপণের কাজ চলিয়াছে।

ভোরে আসিয়া ঘনশ্যাম ও শশী বিজয়কে ডাকিয়া নিয়া গিয়াছিল। বিজয় নিড়ানো বীজের তাড়া মাথায় করিয়া মাঠে আসিয়াছিল। শশীও তাই করিয়াছিল। শুধু বীজ নিড়ায় নাই ঘনশ্যাম—সে শশীর বীজেতেই আবাদ করিবে।

রাতে বৃষ্টিটা ভারীই হইয়াছিল। সারা মাঠ জলে জলময় হইয়া গিয়াছে। শুধু ঘাসে ভরা সবুজ আলগুলি মাঝে মাঝে সরল রেখার মত চোখে পড়ে। অবশ্য হাঁটুভোরের বেশি জল হয় নাই মাঠে। কিন্তু তা হইলেও সেই জলেই সারা মাঠখানাকে দিগন্তহীন সমুদ্রের মত মনে হয়। জলের যে এতরূপ তা না দেখিলে বোঝা যায় না। শ্যাম-ধরিত্রীর বক্ষাঞ্চলের মত বিস্তৃত জলরাশির শ্বেত-সুন্দর রূপ মানুষের দৃষ্টিকে কেমন করিয়া যেন আকর্ষণ করে—দূরে, আরও দূরে।

মাথার উপরে নির্ম্মেঘ আকাশ। রৌদ্র-প্লাবনের অজস্রধারা ছড়াইয়া পড়িয়াছে মাঠে। দেশাচারের রীতি অনুসারে শুভদিন দেখিয়া বপন-রোপণ

ইত্যাদি করিতে হয় কিন্তু এবারে কোন নিয়মই খাটে নাই। প্রতিটি শুভদিনকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে নির্ম্মম ও নির্দ্দয় অনাবৃষ্টি।

তবু রাতে বৃষ্টি হইয়াছে, দিনে উঠিয়াছে প্রশান্ত সূর্য্য। সৌর-জগতের নিয়মানুসারে ইহা শুভ লক্ষণ। খনার বচনে বলে, 'দিনে রোদ রাতে জল— তাতে বাড়ে ধানের বল।' সমস্ত কৃষকই প্রায় একথা জানে। তাই সবাই যেন আশায় বুক বাঁধিয়া ধান রুইতে আরম্ভ করিয়াছে।

হাঁসের মত উপুড় হইয়া, বিজয় জলের ভিতর মাটির মধ্যে হাত চালাইয়া চালাইয়া বীজ রুইতেছিল। পরনে তার একখানি গামছা মাত্র, কাপড়টা মাথায় বাঁধা। মনে আশার আনন্দ নিয়া প্রাণপণে সে কাজ করিয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে কাজ থামাইয়া তামাক খাইয়া নিতেছে। শশীও আসিয়া মাঝে মাঝে ঘুরিয়া যাইতেছে।

ইতিমধ্যে ভট্‌চায্‌ আসিয়া বিজয়কে বলিয়া গিয়াছেন—তাকে দুপুরে আদর্শ গ্রামের জমিতে লাঙ্গল দিতে যাইতে হইবে।

লোকটা কি নির্লজ্জ! গতকল্য দারোগার সাম্‌নে অমন করিয়া যাকে খিঁচাইয়াছিল, আজ আবার তার কাছে আসিয়াই কাজের কথা বলিতে এতটুকু লজ্জা করিল না? কাজ নিবার বেলা উহারা সবই করিতে পারে।

এস-ডি-ও, সার্কেল অফিসার গ্রামে আসিবেন। পতিত জমি কি ভাবে আবাদ করা হইতেছে তা তাদের দেখানো হইবে। কাজে কাজেই কাল যখন বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে তখন আজ একবার লাঙ্গল পড়া দরকার বৈ কি! তা না হইলে তাঁরা বুঝিতে পারিবেন কেন?

অবশ্য বিজয় প্রথমটায় রাজী হয় নাই। পুরানো মজুরীগুলি মিটাইয়া দিবার সর্ত্তে সে রাজী হইয়াছে। কেননা তার টাকার দরকার। ঘরে একদানাও চাল নাই এবং চাল কিনিবার পয়সাও প্রায় তদ্রূপ—সেজন্য তাকে আগে হইতেই প্রস্তুত হইতে হইবে।

এম্‌নি করিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বেলা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তামাক

খাইতে আসিয়া শশী জিজ্ঞাসা করিল, তা হ'লে তুই চষ্‌তে যাচ্ছিস্ ওদের জমি ?

হ্যাঁ যাই, বিজয় কহিল, পুরোনো দামগুলো পাওয়া যাবে যখন।

—কই কাল রাতে তো তা বলিস্ নি।

—তখন তো আর পুরোনো দামের কথা হয় নি।

—আরে পুরোনো দাম কি আর আদায় হ'ত না! তার জন্যে রোয়া বন্ধ রাখবি ?

রোয়া বন্ধ রাখছি, বিজয় কহিল. এ তো আর একদিনের কাজ নয়। কিন্তু ওদের কাজে না গেলে আর পুরোনো দামগুলো পাওয়া যাবে না।

—পাওয়া যাবে না মাগ্‌নাই। তা হ'লে আর কোনদিন এই শম্মা কাজে যাবে ভেবেছ ?

—তুমি না কাজে গেলে ওদের কি, পশ্চিমা কিরষেণ লাগিয়ে দেবে।

—হ্যাঁ পশ্চিমী কিরষেণ খুব সস্তা কিনা! পাবে কোথায় তাদের ? সব গিয়ে মিলিটারীতে কাজে লেগেছে—

কিন্তু তা না হয় হ'ল, বিজয় কহিল, আমার যে আজকেই টাকার দরকার।

শশী কহিল, সে কথা আলাদা তা'লে। আমি কিন্তু আজ আর কোথাও যাচ্ছি না—

না গেলে বিজয়ের চলিবে না সে কথা বিজয় আগেই বলিয়াছে। কাজেই তাদের কথাবার্ত্তা আর বেশিদূর অগ্রসর হইল না।

এক সময়ে বিজয় মাঠ হইতে বাড়ী চলিয়া গেল। আহারাদি সারিয়া সে আদর্শ গ্রামের জমি চষিতে যাইবে।

বোর্ড অফিসের ওখানে ভিড় তখনও কমে নাই।

যে লোকগুলা ইতিপূর্ব্বে 'চাল' 'চাল' করিয়া বোর্ড অফিসের সম্মুখে বসিয়া ছিল, তাদের কেউ কেউ চলিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু অনেকেই এখনও যায় নাই। কি যেন এক আশায় তারা বসিয়া আছে। যোগেশবাবু

ঘর হইতে অপাঙ্গে একবার তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁর মাথায় মতলব খেলিয়া গেল—সভার সময় ইহাদের বেশ ভালভাবে ব্যবহার করিতে হইবে। যাতে লোকগুলা তাঁদের স্বপক্ষে থাকে, সে জন্য তিনি জমি তৈরী করিতে লাগিলেন।

সকলের সম্মুখে আসিয়া তিনি বলিলেন, কিগো সব সকাল থেকেই যে বোর্ড অফিসে ?

অপেক্ষমান লোকগুলির ভিতর হইতে অনেকেই একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, কি করি বাবু চালের তরে তো আমরা আর ভাবতে পারি না !

হুঁ, যোগেশবাবু বলিলেন, ব্যবস্থা একটা শিগ্‌গিরই হবে। আর সেই জন্যেই আজ মিটিং ডাকা হয়েছে। মিটিংএ কমিটিটা তৈরী হয়ে যাক। কমিটি হ'লেই চাল এসে পড়বে।

শশীর ছেলে দীনু সে-ও আসিয়াছিল ইহাদের মধ্যে। সে বলিল, চাল এলে সবাই পাব তো ?

অন্য লোকগুলা দীনুর বেয়াকুবিতে রাগিয়া উঠিয়া কহিল, আহাম্মুখ আর কোথায় আছে ? চাল যদি গাঁয়ে আসে তবে সবাই পাবে না ?

দীনু আবার বলিয়া উঠিল, পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ আছে। কাল চাঁপাডাঙাতে শুনে এলুম—চাল ওখানে এসেছে বটে কিন্তু সে ভাবী-সাবী লোকদের ঘরে গিয়েই উঠছে, আমাদের মত মজুর-কিষেণরা একটি দানাও পাচ্ছে না—

সারা জীবনের মধ্যে মানুষ কখনো চালের জন্য এরূপ হাহাকার করে নাই। তাই ব্যাপারটা প্রকৃত প্রস্তাবে কিরূপ দাঁড়াইবে তা কেহই জানে না। দীনু চাঁপাডাঙায় গিয়াছিল—ভুক্তভোগী লোকদের কাছে শুনিয়া অসিয়াছে তাই সে বলিতে পারিল, কিন্তু আর সকলের সে অভিজ্ঞতা নাই, সেজন্য তারা তার কথাটাকে রীতিমত বেয়াদবি বলিয়া

মনে করিল এবং একসঙ্গে প্রায় ডজন খানেক লোক প্রতিবাদ করিয়া উঠিল। ওহে এটা চাঁপাডাঙা নয়—ডিহিবাৎপুর ইউনিয়ন।

হঠাৎ দীনুরও সমর্থক জুটিয়া গেল। বোর্ডের সিঁড়ির একপাশ হইতে বিষ্ণুর ভাইপো পরাণ বলিয়া উঠিল, চাঁপাডাঙা নয় বটে—তবে দেখো চাঁপাডাঙাকে ছাড়িয়ে না যায়।

হেঁ হেঁ, দীনু হাসিয়া উঠিল।

যোগেশবাবু দেখিলেন, ইহাদের কথা অন্য খাতে বহিয়া চলিতেছে এবং এইভাবে বহিয়া গেলে বিতর্কমূলক অবস্থার মধ্যে গিয়া পড়িতে হইবে, আর সেরূপ হইলে লোকের মনে একটা খট্‌কা লাগিয়া থাকিবে। তারপর সেই খট্‌কার মধ্যে পুরাপুরি সমর্থন না পাইয়া বৈকালে ফুড-কমিটির নির্ব্বাচনে হারিয়া যাইতে হইবে। তাই তিনি কথাটাকে ঘুরাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, আরে চাঁপাডাঙা, তাকে তো আমরা ছাড়িয়ে যাব নিশ্চয়ই। চাঁপাডাঙার চেয়ে এখানে ভাল ভাল লোক তো আছে—তারা সব কমিটিতে থাকলে একটা ভাল বন্দোবস্ত যে হবেই, সেকথা কে না জানে। কাজেই ডিহিবাৎপুর ইউনিয়নের চাঁপাডাঙাকে ছাড়িয়ে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

অনেকেই একসঙ্গে পরাণের উদ্দেশে বলিয়া উঠিল, বটেই তো।

পরাণ সম্ভবতঃ বে-কায়দায় পড়িয়া গেল। কিন্তু দীনু সমস্ত ব্যাপারটাকে মানাইয়া নিয়া কহিল, তা যদি হয় তো ভালই কিন্তু—

এবার যোগেশবাবু কারও কিছু বলিবার আগে দীনুর 'কিন্তু' হইতে কথা আরম্ভ করিয়া বলিলেন, এর মধ্যে আর কিন্তু-টিন্তু নেই। এস-ডি-ও, সার্কেল অফিসার আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে আমি ফুড-কমিটিতে যেন প্রেসিডেণ্ট থাকি। আমি বলেছিলাম যে, ওসব পারব না। তাতে তাঁরা ক্ষুণ্ণ হ'য়ে লিখ্‌লেন, এসব কাজে আর কাউকে তো আমরা বিশ্বাস ক'রতে পারি না।

সমবেত লোকগুলার ভিতর হইতে আওয়াজ উঠিল, ঠিক কথা।

আমিও ভাবলাম সত্যিই তো, যোগেশবাবু সকলের মুখের দিকে এক-একবার করিয়া তাকাইতে তাকাইতে বলিলেন, এসব ব্যাপারে সব কাজ ফেলে রেখেও মাথা দেয়া দরকার। তবে কথা কি জানো, আমি না হয় ফুড-কমিটির প্রেসিডেণ্ট রইলাম কিন্তু আর যারা থাকবে তারা যদি আমার মত না হয় তা হ'লে আমার হাজার সদিচ্ছা থাকলেও আমি কোন ভাল কাজ ক'রতে পারব না। তাই আমি এস-ডি-ও, সার্কেল অফিসারকে আবার লিখলাম যে, মশাই—এই আমার মত। তাতে তাঁরা জানালেন—বেশ আপনি আপনার নিজের মনের মত লোকজন নিয়ে কমিটি তৈরী করবেন। আমি সোজাসুজি তাই করছি—যে আমাকে যাই বলুক মনের মত লোক না হ'লে আমি কাজ ক'রতে পারব না।

চালের জন্য যারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এত মার-প্যাঁচের ব্যাপার তারা বোঝে না, বুঝিতেও চাহে না। শুধু চাল পাইবার আশ্বাস পাইলেই হইল। কিন্তু দীনু ও পরাণ যেন একটু অন্য রকম। সম্ভবতঃ উহারা দক্ষিণ পাড়ার লোক বলিয়াই হয়ত অন্য রকম। দীনু উহাদের ভিতর হইতে প্রশ্ন করিয়া বসিল, তা হ'লে কমিটিতে আর কে কে থাকছে?

এই প্রশ্ন শুনিয়া যোগেশবাবু কেমন যেন একটু চিন্তিত হইলেন অর্থাৎ এই রকম প্রশ্ন যখন উঠিয়াছে তখন কথাটা এখনই ভাঙিয়া দেওয়া কি যুক্তিসঙ্গত হইবে? অথচ প্রশ্নটার উত্তর চাপিয়া যাওয়াও ঠিক হইবে না—অন্য লোকগুলা সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিবে। তা ছাড়া যে উদ্দেশ্য নিয়া তিনি এইসব কথা সকলকে শুনাইতেছেন তারও তো একটা সুদূর-প্রসারী ফল আছে! তাই তিনি কমিটির সকলের কথা উল্লেখ না করিয়া বলিলেন, কমিটির সবলোকের কথা আমার মনে নেই, তবে আমি প্রেসিডেণ্ট, আর নফর ভট্চায সেক্রেটারী—এই আর কি!

দীনু বলিয়া উঠিল, তা হ'লে সেই ধান-চাল লেখালিখি করার কমিটিটাই ফুট্-কমিটি হচ্ছে বলুন?

প্রায় তাই, যোগেশবাবু বলিলেন।

তা সে যাই হোক্, সমবেত জনতা উঠিতে উঠিতে বলিল, যাই করুন বাবু, আমরা যেন চাল পাই—

আরে চাল পাওয়া যাবে, চাল পাওয়া যাবে, যোগেশবাবু শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, গভর্ণমেণ্ট কত চাল দেবে দিক্ না—এতো পশ্চিমপাড়ার চন্দোর কিম্বা ডিহিবাৎপুরের রাখহরির ব্যবসা নয় যে গভর্ণমেণ্ট দিতে চাইলেও পুঁজির অভাবে গাঁয়ে চাল আসবে না! আমরা যে সেদিকেও গোড়া বেঁধে নেমেছি। গভর্ণমেণ্ট চাল দিতে চায়, সোজা অধর কুণ্ডুকে দেখিয়ে দেব। লাখ লাখ টাকা দেবে গুণে।

জনতা আশ্বস্ত হইয়া ফিরিতে লাগিল। ফিরিবার আগে সকলেই যেন বলিতে চাহিল, 'দেখবেন বাবু।' যোগেশবাবুও যেন তাদের সেই কথাই বলিতে চাহিলেন: বৈকালে তোমরা আমাকে দেখিও—আমিও তোমাদের দেখিব।

সকলকে উঠিতে দেখিয়া পরাণ ও দীনু উঠিয়া পড়িল।

দুপুরে আহারাদি সারিয়া বিজয় আদর্শগ্রামের জমিতে লাঙল দিতে আসিয়াছিল। সে শুধু একাই আসে নাই, তার আগের দিনের সঙ্গী পরমেশ ও জীবনও আসিয়াছিল।

জমি চষিতে চষিতে তাদের গল্প হইতেছিল। বৈকালে ফুড-কমিটির সভা হইবে—গল্প হইতেছিল সেই সম্বন্ধেই। পরমেশ কহিল, ফুট-কমিটি হ'লে কি রকম ভাবের কি ব্যবস্থা হবে চালের?

শুনতে পাচ্ছি তো, বিজয় কহিল, ফুড-কমিটি টিকিট দেবে আর সেই টিকিট দেখালেই চাল পাওয়া যাবে।

—কার কার দোকানে চাল পাওয়া যাবে?

দোকানে দোকানে চাল পাওয়া যাবে না, দুপুরে বাড়ী ফিরিয়া বিজয়

দীনুর কাছে কথাটা শুনিয়াছিল—তাই সেইরকম ভাবেই বলিল, চাল পাওয়া যাবে এবার অধর কুণ্ডুর কাছে।

পরমেশ, জীবন উভয়েই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, অধর কুণ্ডুর কাছে ?

—হ্যাঁ।

পরমেশ কহিল, এ রকম হবে কেন ?

গভর্ণমেণ্ট একসঙ্গে অনেক চাল দেবে, বিজয় বলিতে লাগিল, অতো চাল একসঙ্গে আর আর দোকানদারদের কেনবার পুঁজি কোথায় ? অধর কুণ্ডুর টাকা আছে, তাই সে-ই চাল কিন্‌বে।

তা হ'লেই হয়েছে, পরমেশ কহিল।

হ'ল আর কি, জীবন কহিল, গরীব লোক সব মারা পড়বে। কেউ একটি দানাও পাবে না।

ব্যাপারটায় সকলেই যেন কেমন একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল। চুপ-চাপ সকলেই লাঙ্গল দিতে লাগিল।

মাথার উপরে উত্তপ্ত আকাশ। আগের দিনে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, মাটি তাই জলসিক্ত। কিন্তু প্রখর সূর্য্য সেই জলসিক্ত মাটিকে নির্ম্মমভাবে শোষণ করিয়া নিতেছে। সূর্য্যদেবের এই শোষণের ফলে সারা প্রকৃতি জুড়িয়া সৃষ্টি হইয়াছে এক বিশ্রী উষ্ণতার আবহাওয়া। এ আবহাওয়ায় মানুষের বুকের রক্তও যেন জল হইয়া উঠে। দরদর-ধারে ঘাম ঝরিতেছে বিজয় প্রভৃতির গায়ে।

গ্রামে এস-ডি-ও, সার্কেল অফিসার আসিতেছেন। কি ভাবে অধিক খাদ্য শস্য ফলানোর ব্যবস্থা করা হইতেছে তা তাঁদের দেখানো হইবে।

লাঙ্গল দিতে দিতে হঠাৎ একটা জায়গায় আসিয়া বিজয় দেখিল, জমিটা যেন ভিতর দিকে ঢুকিয়া গিয়াছে এবং সেখানে কিছুটা জলও জমিয়া আছে। পতিত জমি, হয়তো কোনকালে কেহ সেখানে গর্ত্ত খুঁড়িয়াছিল তাই জমিটা নাবোল ভাবিয়া বিজয় কোনকিছু ভ্রূক্ষেপ না

করিয়া লাঙ্গলের-মুঠি শক্ত করিয়া গরুদুটাকে তাড়া দিল। গরুগুলা দৌড়ের ভঙ্গীতে পা ফেলিতেই মনে হইল কে যেন তাদের টানিয়া ধরিল।

ব্যাপারটা কি হইল? বিজয় জমিটা ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। জমিটার এই অধোগতির নিশ্চয়ই একটা অর্থ আছে। লাঙ্গলের ফলা যেন কিসে আটকাইয়া গিয়াছে। লাঙ্গলের মুঠি ছাড়িয়া দিয়া সে ফলাটার কাছে গিয়া টানিতে লাগিল।

জায়গাটার একটা বিশেষত্ব আছে। কবরে যেমন খুব উঁচু করিয়া মাটি দিলেও কিছুদিন পরে তা নীচের দিকেই নামিয়া যায়, এখানটাও প্রায় তেমনিই। ফলাটা জোর করিয়া টানিতেই একটা কঙ্কালের একাংশ বাহির হইয়া পড়িল। বিজয় আপন মনেই বলিয়া উঠিল, কিরে বাবা কবরে লাঙ্গল দিচ্ছি নাকি? তারপর এক রকম বিস্মিত অবস্থায় সে পরমেশ ও জীবনকে ডাকিয়া বলিল, এই আয় আয় ইদিকে আয়—মানুষের কঙ্কাল দেখে যা'—

সে কিরে, পরমেশ ও জীবন বিস্ময় প্রকাশ করিয়া ছুটিয়া আসিল।

বিজয় কহিল, দাঁড়া গরু দুটোকে খুলি—খুলে আমি ফলাটা চেপে ধরি আর তোরা দুজনে জোরে টান, তা হ'লে কঙ্কালটা উঠে আসবে।

পরমেশ কহিল, তা না হয় হ'ল কিন্তু জায়গাটা কি কবরস্থান ছিল?

—কে জানে হতেও পারে।

আরে রাম, রাম, পরমেশের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। হিন্দুর সংস্কার তার রক্তের সহিত মিশিয়া আছে এবং হিন্দুদের কবর দেওয়া রীতি নাই। অথচ এমনিতরো একটা স্থানেই সে আসিয়া পড়িয়াছে! শুধু তাই নয় সেই কবর হইতে আবার একটি কঙ্কালও তাকে ছুঁইতে হইতেছে! ভিন্ন ধর্ম্মাচারীর প্রতি বিজাতীয় ঘৃণায় এমনিই যেন কেমন তার মনে হয়, তার উপর আবার মৃতদেহ কিম্বা কঙ্কাল—সে তো কথাই নাই। পরমেশ জীবনের দিকে তাকাইল। তারও তদ্রূপ অবস্থা।

বিজয়েরও যে সে রকম কিছু হয় নাই তা বলা যায় না। তবে লাঙ্গল

আটকাইয়াছে তারই। লাঙ্গলটা তাকে টানিয়া নিতেই হইবে। তার সংস্কারে আঘাত লাগিলেও সে নিরুপায়।

বিজয় কথামত গরুদুটাকে খুলিয়া লাঙ্গলের ফলার দিকটা চাপিয়া ধরিল। পরমেশ ও জীবন নেহাৎ যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেই লাঙ্গলের গোড়ার দিকটা ধরিয়া টান মারিল। একটানেই মাটির ভিতর হইতে গোটা কঙ্কালটা উঠিয়া পড়িল।

কিন্তু আশ্চর্য্য কঙ্কাল!

কঙ্কালটা উঠিতে না উঠিতেই বিজয়ের মনে কি যেন একটা খট্‌কা লাগিয়া গেল। মানুষের কঙ্কাল মানুষ জাতির বলিয়া ধরা যায় কিন্তু কোনো একটি বিশেষ মানুষের, ইহা বুঝিবার মত ক্ষমতা কারও নাই। কিন্তু বিজয়ের মনে ঠিক সেই রকমেরই একটা কথা যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে খেলিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে তার আরও মনে হইল—জায়গাটা যদি কবরভূমিই হইবে, তবে কয়েকদিন ধরিয়া তারা তো লাঙ্গল দিতেছে, কই এরূপ ঘটনা আর একটিও তো ঘটে নাই? তা ছাড়া এমনতরো কঙ্কাল না উঠুক, জমিটার মধ্যে আরও কিছু কিছু উঁচু-নীচু কি দেখা যাইত না? নিশ্চয়ই এ জায়গাটা কবরভূমি নয়। তা ছাড়া এ জায়গাটা কবরভূমিই বা হইবে কি করিয়া—এখানে মুসলমান তো বাস করে না? আর সাহেবরাও যে এই অজ-পাড়াগাঁয়ে কবর দিতে আসিবে, তাও তো নয়! অবশ্য যদি বহুযুগ আগেকার ব্যাপার হয়, তা হইলে এক হইতে পারে। কিন্তু তাই বা হয় কি করিয়া? বহু বছরের পুরানো কবরের মধ্যে মানুষের কঙ্কাল কি এমনিই টাট্‌কা-তাজা থাকে? কে জানে সেকথা!

একথা মনে হইতেই সহসা তার কঙ্কালটার বাঁ-হাতখানার দিকে নজর পড়িল। ও কি! কঙ্কালটার বাঁ হাতটা ওরকম অর্দ্ধেকখানা কেন? ডান হাতখানা তো ঠিকই রহিয়াছে—এমন কি আঙুলের হাড়গুলা পর্য্যন্ত! অথচ—

বিজয় ঝপ্ করিয়া কঙ্কালটার সামনে বসিয়া পড়িয়া ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। পরমেশ তাকে ঐভাবে বসিয়া পড়িতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, ও কিরে অমন ক'রে কি দেখছিস্ ?

বিজয় চিন্তিতভাবে কহিল, ইদিকে আয় দিকি—গ্যাখ্‌তো কঙ্কালটার বাঁ-হাতখানা ওঠবার সময় ভেঙেছে, না ওমনিই ছিল ?

পরমেশ কাছে গিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া কহিল, হাতখানা' কনুইয়ের কাছ থেকে নেই দেখ্‌ছি।

ঠিক তো, উৎসুকভাবে বিজয় জিজ্ঞাসা করিল।

তা যদি না হবে তো, পরমেশ কহিল, টাট্‌কা ভাঙার একটা দাগ থাক্‌বে তো ?

হুঁ তা হ'লেই হয়েছে, বলিয়া বিজয় দাঁড়াইয়া উঠিল। উঠিতে উঠিতে তার দুইচোখ ফাটিয়া· অশ্রুর বন্যা ছুটিয়া গেল। পরমেশ ও জীবন তার এই অবস্থা দেখিয়া কেমন যেন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া গেল। তবু পরমেশ ক্ষণকাল পরেই প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি বল্ দিকি !

বিজয় বাঁ-হাতের কনুইয়ে অশ্রুধারা মুছিতে মুছিতে বলিল, রামায়ণ পড়িছিস্ পরমেশ ?

রামায়ণের সহিত এ ঘটনার কি সামঞ্জস্য আছে পরমেশ তা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া বিজয়ের দিকে তাকাইয়া রহিল।

রামায়ণে আছে, বিজয় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, জনক-নন্দিনী সীতাকে পাওয়া গেছলো, এমনিধারা হালের ফলায়। লোকে সেই থেকে ফসলকে বলে সীতা। কিন্তু আমিও আজ সীতাকে পেয়েছি, তবে এ সীতা নয়—সীতার কঙ্কাল !

বিজয়টা বলিতেছে কি ?

বিজয় তেমনি ভাবেই বলিতে লাগিল। আদর্শ গ্রামের পতিত জমি আবাদ ক'রে বাবুরা অধিক খাদ্য শস্য ফলাবে। কিন্তু অধিক খাদ্য শস্য

উঠ্‌বে কোত্থেকে? মানুষের মাঝখানে এতদিন ধরে যে সীতা-হরণের পালা চলেছে তাতে সীতার কঙ্কালই উঠবে। আর আজ উঠেছেও তাই!

শেষ কথা কয়টা বলিবার সময় বিজয় এক প্রকার হাসি হাসিল। পরমেশ কহিল, কিন্তু আসলে কি ব্যাপার বল্‌দিকি?

—আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারিস্ নি?

—না।

সে কিরে—এখনো বেশিদিন হয় নি, বিজয় কঠিন অথচ অশ্রুসজল ভাবে কহিল, এই সেদিনের কথা! মনে পড়ে তোদের, একরাত্তে হত-ভাগিনী আমার বোনটাকে কারা মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে ধ'রে নিয়ে গেস্‌লো?

—হ্যাঁ এই তো সেদিনের কথা।

—সেই আমার বোন সীতার ব্যাপার! আমি সেদিন বাড়ীতে ছিলুম না। এসে শুনলুম সীতাকে যখন ধরে নিয়ে যায় সে তখন ভট্‌চাযিয় মশায়ের নাম ক'রে চেঁচিয়েছিল। আমি সেকথা বল্‌তে গেসলুম ভট্‌চাযিয়কে তা সে আমাকে যা-তা ব'লে গালাগালি দিয়েছিল। গ্রামের লোক তার বিচার পর্য্যন্ত করে নি।

পরমেশ কহিল, হ্যাঁ তাই নিয়ে কি একটা গোলমাল হয়েছিল বটে।

সেই থেকে হতভাগিনী বোনটাকে কত খুঁজেছি, বিজয় উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, কিন্তু পাই নি। আজ পেলুম—এই মাটির ভেতরে।

তা হ'লে এ তোর বোন সীতার কঙ্কাল, সবিস্ময়ে পরমেশ জিজ্ঞাসা করিল।

হ্যাঁ, বিজয় কহিল, নিজেদের কলঙ্ক চাপা দেবার জন্যে এই কাণ্ড করেছে! খুন ক'রে এমনি করে পুঁতে রেখেছে!

এতক্ষণ একটা ভিন্ন ধর্ম্মাচারী মানুষের কঙ্কাল ভাবিয়া উহারা কেমন যেন একটা বিজাতীয় ঘৃণায় ও সংস্কারবশে মনের মধ্যে কি রকম একটা অস্বোয়াস্তি অনুভব করিতেছিল কিন্তু এখন তা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়া সহানুভূতির প্রচণ্ড আবেগে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। পরমেশ কহিল, চল্ শালাদের

কাজ ফেলে গাঁয়ে যাই চল—কঙ্কালটা নিয়ে গিয়ে সবাইকে দেখাই শালাদের অত্যেচার।

জীবন ঘৃণাভরে কহিল, আবাদ করে শালারা ফসল ফলাবে! এই যে ফসল উঠছে—

অত্যাচারের চিহ্ন, পরমেশ কঙ্কালটাকে দেখাইয়া বলিল, এই ফসল!

পারিলে বিজয় হয়ত বলিত—মহাকবি বাল্মিকী সীতার কাহিনী নিয়া একদিন তুমি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলে! তার সুখ-দুঃখ, জীবনের অজস্র বেদনাকে তোমার লেখনী-মুখে তুমি মানুষের ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলে! তাই আজও সেই মর্ম্মস্পর্শী মহাকাব্যের অনুপ্রেরণায় মানুষ ক্ষুব্ধ-বিক্ষুব্ধ চঞ্চল হইয়া উঠে, দুই নয়নের উচ্ছ্বসিত অশ্রুর বিচ্ছুরিত আলোকে অপার দুঃখ-সমুদ্রে জীবন-পথের নিশানা খুঁজিয়া বেড়ায়। হে মহাকবি, আজ কি আর একবারও তোমার লেখনী গর্জ্জিয়া উঠিতে পারে না—তুমি আর একটিবারও মানুষের উপর মানুষের এই কল্পনাতীত অত্যাচারের কাহিনী নিয়া অনাগত কালের উদ্দেশ্যে নূতন করিয়া নব-রামায়ণ রচনা করিতে পার না? তোমার মিথিলা, অযোধ্যা, স্বর্ণলঙ্কার অমর কাহিনী এযুগে কি শুধুই ভাষাহারা মূক হইয়া থাকিবে?

গ্রামের মধ্যে কঙ্কালটা আনিতেই হুলস্থূল পড়িয়া গেল। লোকজন ছুটিয়া আসিল মেলা দেখিবার মত করিয়া। বিজয় বাড়ী যাইতে না যাইতে বিজয়ের মা-বুড়ী আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল কন্যার কঙ্কালের উপর। বনমালা হতবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল। —কান্না বুঝি তাদের আর বারণ মানে না।

অত্যাচারের এতবড় নিদর্শন বুঝি মানুষ আর কখনো দেখে নাই।

সারা বাড়ীটা ভিড়ে ভিড় হইয়া গেল। ঘনশ্যাম, শশী, আশু ডাক্তার শ্রীপতি প্রভৃতি সবাই ছুটিয়া আসিল। মেয়েদের মধ্যেও দাওয়ার উপরে দেখা গেল

কুসুম, পঞ্চুরমা, পঞ্চুর বউ সৌরভ, শশীর বউ ও শশীর মেয়ে ধ্বনি—আরও দেখা গেল বিষ্ণুর বোন মাধবী, হরিপদর ভাইঝি মতি। সকলে দাওয়ায় 'থ' হইয়া বসিয়া রহিল।

কে যেন একটা মাদুর আনিয়া দিল। বাড়ীর উঠানে সেই মাদুরে শোয়ানো হইল কঙ্কালটি। বিজয় বসিল তার একদিকে। মা ও বনমালা বসিল আরেক দিকে।

কারও অশ্রু বারণ মানে না।

আশু ডাক্তার কহিল, আরে বিজয় তুই না পুরুষ মানুষ? তুই কেঁদে ভাসাবি?

না ডাক্তারবাবু, বিজয় কহিল।

এই তো চাই, আশু কহিল, মনে মনে এর হিসেব-নিকেশ ক'রে নে—হিসেব-নিকেশ!

চোখ মুছিতে মুছিতে বিজয় কহিল, তাই ক'রব ডাক্তারবাবু।

বেলা তখন যাই-যাই করিতেছে। পশ্চিম-আকাশে কুটিল কালো মেঘের জমাট বিস্তৃতি। অস্ত-যাওয়া সূর্য্যের অগ্নিবর্ণ আলোকরেখা মেঘের বেষ্টনী ভেদ করিয়া পূর্ব্ব-আকাশে বর্শা-ফলকের মত সূচগ্র হইয়া ছুটিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বদিক হইতে দিনান্তের উষ্ণ-বাতাস বিষাক্ত ফণিনীর ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাসের মত বহিয়া আসিতেছে। হয়তো প্রকৃতি মাতিয়া উঠিবে রুদ্রাণীর মত।

শ্রীপতি আকাশের দিকে তাকাইয়া কহিল, এখন ওসব কান্নাকাটি রেখে ব্যবস্থা করো। অপঘাত মৃত্যু হ'লেও লাস যখন পাওয়া গেছে তখন দাহ ক'রতে হবে। ভিন্ন গোত্তর যখন ও লাস—তখন ওষুধ আর হবে না। তবে শুধু যে মুখাগ্নি ক'রবে তার তেরাত্তির হবে। কিন্তু লাস পেরাচিত্তির ক'রতে হবে—

এতক্ষণে যেন মায়ের সম্বিৎ ফিরিল। মা প্রায়শ্চিত্তের যাবতীয় ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইল। প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেলে কঙ্কাল শ্মশানে নিয়া গিয়া পোড়াইতে হইবে।

আশু কহিল, আমাদের আবার ফুড-কমিটির মিটিঙে যেতে হবে, চলি—

ঘনশ্যাম কহিল, সন্ধ্যের পর আসব'খন বিজয়।

আচ্ছা জ্যাঠা, বিজয় কহিল।

অতঃপর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। প্রায়শ্চিত্ত সারা হইলে বিজয় পরমেশ ও জীবন তিনজনে মিলিয়া হরি বোল ধ্বনি দিতে দিতে কঙ্কালটাকে শ্মশানে নিয়া গেল।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ফুড কমিটির সভা শেষ হইলে লোক ভাঙিয়া পড়িয়াছিল গ্রামের পথে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আকাশও যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। "ভাদুরে মেঘ বিপরীত বায়—সেদিন ঝড় বৃষ্টি হয়।" একে ভাদ্রমাস তার উপর পশ্চিমাকাশে মেঘ করিয়াছিল এবং বাতাস উঠিয়াছিল পূবদিক হইতে। কাজেই বৃষ্টি যে হইবে, তা একরকম জানা কথা।

অন্ধকারে যে যেদিকে পারিল ছুটিয়া গেল। কাছাকাছি বাড়ীগুলার দাওয়ায়, স্কুলে পাঠশালায় সব দলে দলে আশ্রয় নিল।

এক-একটা আশ্রয়ে এক-একদল লোক। সব দলের মধ্যেই ফুড-কমিটির ব্যাপার নিয়া আলোচনা চলিতেছে।

বহুদিন হইল এইরূপ সভা-সমিতি এতদঞ্চলে হয় নাই। লোকের মনে পড়ে সেই খাজনা বন্ধ আন্দোলনের সময় মাঝে মাঝে এইরূপ গরম গরম সভা-সমিতি হইত। কিন্তু তা মিটিয়া যাইবার পর আর কখনো এরকমটা দেখা যায় নাই।

সভায় আশু ডাক্তার, শ্রীপতি, ঘনশ্যাম একটা অদ্ভুত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রত্যেকটি লোক দেখিয়াছে এই তিনটি লোক কি না করিতে পারে। কি অদ্ভুত ক্ষমতা লোকগুলার! এস-ডি-ও, সার্কেল অফিসার, যোগেশবাবু, ভটচাযের সমগ্র বাহিনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আশু ডাক্তার ঘনশ্যাম ও শ্রীপতি এরকম ভাবে লড়িতে পারে, ইহা কারও জানা ছিল না। যোগেশবাবু সুকৌশলে ফুড-কমিটিতে শুধু নিজস্ব লোকই রাখিতে চান। উদ্দেশ্য—তা হইলে ফুড কমিটিতে বসিয়া গ্রামে একচ্ছত্র-শাসন চালাইয়া যাইতে পারিবেন। ঐ লোক তিনটা প্রাণপণে তার বিরুদ্ধে লড়িয়াছে।

শেষ পর্য্যন্ত ফুড-কমিটিতে যোগেশবাবুরই জয়-জয়কার হইয়াছে। কমিটিতে যারা ঢুকিয়াছে সবাই যোগেশবাবুর নিজস্ব লোক। ইহা নিয়ম বহির্ভূত কাজ। সরকারী নির্দ্দেশেই আছে সকল দলের প্রতিনিধি নিয়া ফুড-কমিটি গঠন করিতে হইবে কিন্তু সোজাসুজি যোগেশবাবুরা তা অস্বীকার করিয়াছেন।

ডাক্তার ইহার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ তুলিয়াছিল। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। কিন্তু তবু কথাটা সকলের কানে এখনও লাগিয়া আছে।

রাস্তার পাশে একটা কুঠুরীর দাওয়ায় অন্ধকারে বসিয়াছিল ডিহিবাৎপুরের ইয়াসিন আর শরৎ তাঁতী, রণবাগপুরের হারাণ কামার, কেষ্টবাটীর দশরথ জেলে এবং তাদের সঙ্গে ছিল পশ্চিমপাড়ার দীনু, পরাণ ইত্যাদি। আরও কয়েকজন লোক একদিকে জোট্ পাকাইয়া বসিয়াছিল। সম্ভবতঃ তারা হরিণাখালি, নিমডাঙী, বৈঠা, চক্-গোবর্দ্ধন প্রভৃতির লোক।

পঞ্চু ও বলাই আসিতেছিল আলো হাতে ও ছাতা মাথায় দিয়া। কুঠুরীর দাওয়ায় অনেকগুলা লোক আছে দেখিতে পাইয়া সে হাতের আলোটা তুলিয়া ধরিয়া কহিল, কারা গো? তারপর ইয়াসিনকে দেখিতে পাইয়া পঞ্চু প্রশ্ন করিল, কি গো চাচা সভা কেমন শুন্‌লে?

ইয়াসিন বৃদ্ধ মুসলমান। চুলগুলা পাকিয়া সাদা হইয়া গিয়াছে। সাদা ভ্রূ, সাদা দাড়িগোঁফ। চোখে সুতা-বাঁধা নিকেলের চশমা। পরনে মোটা মার্কিনের লুঙী আর মের্জ্জাই, কাঁধে গামছা, খালি পা। সে পঞ্চুকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া নিয়া কহিল, এ রকম হবে তো জানাই ছিল।

কেন, পঞ্চু জিজ্ঞাসা করিল।

নিজেদের দলকে নিয়েই শুধু কমিটি হবে—আর কারো সেখানে জায়গা থাকবে না, ইয়াসিন বলিতে লাগিল, এ খবর তো আমরা আগেই দীনু-মারফৎ শুনেছিনু।

পঞ্চু কহিল, দীনু ভুল খবর দিয়েছিল।

পঞ্চু সম্ভবতঃ দেখে নাই, দীনু আছে কিনা। ইয়াসিন কহিল, এই তো দীনু রয়েছে—জিগ্যেস্ করো ওকে—

কই দীনু আছে নাকি, পঞ্চু চারিদিকে তাকাইতে তাকাইতে প্রশ্ন করিল।

দীনু কহিল, ওরে পঞ্চা না জেনে এসেই কি আমি বলিচি এদের। তা ছাড়া শুধু শুধু ভুল খবর দিয়ে লোককে আমার লাভটা কি?

তা নয়, পঞ্চু কহিল, শুধু নিজেদের দলের লোক নিয়ে কমিটি হ'ল কোথায়?

বটে, এবার ইয়াসিন বলিয়া উঠিল, তুমিও তো একজন মেম্বর হয়েছ?

পঞ্চু কহিল, হ্যাঁ।

তা আমরা যতই বলি তুমি কি আর আমাদের পক্ষ টেনে বল্‌বে, ইয়াসিন কথা কয়টা বলিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল। তারপর কহিল, নীচে দাঁড়িয়ে রইলে কেন—উঠে এসো না?

বেশ আছি, পঞ্চু কহিল, তবে কি জানো, ন্যায্য কথা হলে নিশ্চয়ই বলব।

এবার কথা কহিল দশরথ। দামোদর ও বেগুয়ায় মাছের ডিম ধরিয়া জীবন কাটায় দশরথ। জাতিতে সে জেলে। বয়স হইয়াছে তার। কালো পাঙাস্ মত গায়ের রঙ দশরথের। বেশ শক্ত চেহারা। মাথায় ছোট ছোট চুল। পরনে হাত-আষ্টেক একখানা ধুতি। গায়ে মের্জ্জাই। সে কহিল, তা একটা দল নিয়ে যে কমিটি তৈরী হ'ল, সে কি একটা লেজ্য কথা নয়?

কিন্তু একটা দল নিয়ে কমিটিটা হ'ল কোথায়, পঞ্চু পথ হইতে কুঠুরীটার দাওয়ার দিকে সরিয়া আসিয়া বলিল, দেখলে তো সব এক-একটা দল থেকে এক-একজনকে নিয়ে কমিটি হ'ল।

দশরথ উপহাসের ভঙ্গীতে কহিল, খু-উ-ব!

কেন, পঞ্চু কহিল, হিসেব করো—

করো হিসেব, দশরথ কহিল।

হ্যাঁ এই প্রথমে ধরো, পঞ্চু বলিল, যোগেশবাবু—তিনি হিন্দুমহাসভা; তারপর ভট্‌চায্যি মশাই—পল্লীমঙ্গল সমিতি, ইব্রাহিম চাচা—মুস্‌লিম লীগ…

তা ওরকম ক'রে হিসেব ক'রলে হবে না কেন, দশরথ কহিল সেকথা সভায় আশু ডাক্তার বলেছিল। বিশ বোর্ডে একসঙ্গে কাজ করছে—আলাদা আলাদা নামে এলেই রা আলাদা ভা হবে ? শোনো—শুনে চটে যেও না এ যা' হয়েছে এ তো ধানচাল লেখা কমিটির মত ?

না ঠিক তা নয়, পঞ্চু কহিল, কমিটিতে দু-তিনজন লোক তো নতুন রয়েছে—আমি, কান্তবাবু আর ধীরেনবাবু।

অয় ত্যাখো, দশরথ কহিল, ঐ দুটি লোক—ওদের কমিটিতে নেয়া হল কিন্তু ডাক্তার, ঘনশ্যাম কিম্বা শ্রীপতি ঠাকুর, এদের কাউকে নেওয়া হ'ল না। অথচ ওরা গেরামের কেউ নয়—

কেন, পঞ্চু কহিল, কে বললে ওরা কেউ নয় ?

ত্যাখো আমাদের আর ন্যাকা বুঝিও না, দশরথ কহিল, লোকগুলোকে আমরা খুব ভাল ক'রে চিনে নিয়েছি। সেই কলকাতায় বোমা পড়বার সময় ওরা গাঁয়ে এল। এসেই নবাবীর কি লম্বাই-চওড়াই ব্যাপার। মনে ক'রলে গাঁয়ের লোকগুনো মানুষ নয়। কীর্ত্তি শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়।

ওসব শোনা কথা ছেড়ে দাও না, পঞ্চু কহিল, কমিটিতে যখন ওদের নাম উঠল—শুনলে না ওদের বিশিষ্ট ভদ্দরলোক বলে নেয়া হচ্ছে।

ওরা ভদ্দরনোক, দশরথ রুখিয়া উঠিয়া বলিল, কমিটিতে নিয়েছো লোককে ধোঁকা দিয়ে—তা নাওগে। কিন্তু ওদের ভদ্দরনোক বলে চালাতে যেও না। ভদ্দরনোকরা গাঁয়ে এসে তালগাছ কাটিয়ে নিত্যি তাড়ির বন্দোবস্ত করে না। তবু যদি এইখানেই শেষ হ'ত তা হ'লেও না হয় বাঁচতুম !

পঞ্চু কহিল, তোমরা জানো এসব কথা ?

জানি জানি খুব জানি, দশরথ কহিল, শুধু তাই নয়। আমরা জেলেমালা মানুষ কিন্তু ওদের গুণপনা জানতে আমাদের আর বাকী নেই। গরীব পাড়ায়

মেয়েদের আব্রু নেই সবাই জানে কিন্তু ওরা কেমন ভদ্দরনোক যে, গরীব ঘরের মেয়েদের কলকাতার ইস্‌টাইলে ইসারা-মস্করা করে ?

এইসব কথায় পঞ্চু কেমন যেন একটু কোণঠাসা হইয়া পড়িল। হইবারই কথা। দশরথ ঠিকই বলিয়াছিল। কলিকাতায় জাপানী বোমা পড়ার সময় শুধু কান্তবাবু আর ধীরেনবাবুই নয়—এমনিতরো অনেক বাবুই কলিকাতা ছাড়িয়া গ্রামের দিকে আসিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রামে আসিয়া তাঁরা গ্রাম্য-জীবনকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারেন নাই। অন্যদিকে শহরের নাগরিক জীবনের উপরেও ছিল তাঁদের একটা বিতৃষ্ণা। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার প্রাণ ভরিয়া কখনও শহরকে আপনার বলিয়া ভাবিতে পারে নাই। কেন না যে অর্থ-স্বাচ্ছল্য থাকিলে নগর-শহরকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করা যায় তা তাঁদের ছিল না। অপরদিকে শহর-জীবনে অভ্যস্ত মানুষের পল্লীজীবনকে ভাল লাগে না। মনের কোণে যেন তাঁদের এই কথাটাই লুকাইয়া আছে যে গ্রাম-বাসীরা তাঁদের চেয়ে নিম্ন স্তরের মানুষ। তা ছাড়া আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিবার মত। বোমার ভয়ে এইসব লোকগুলি যখন গ্রামে চলিয়া গেলেন, তখন শহর-জীবনের যে সভ্যতাপূর্ণ আবেষ্টনী, সেই আবেষ্টনী হইতে মুক্তি পাইয়াই গেলেন। কোন রকম পিছন টান আর রহিল না। তাই শহরের বঞ্চিত আত্মা এবং যুদ্ধকালের অনিশ্চয়তার জীবনযাত্রা এইসব মানুষ-গুলিকে, গ্রাম্য-জীবন যাত্রার মধ্যে যে নিম্ন স্তর, সেই স্তরের মধ্যে ফেলিয়া এক অস্বাভাবিক জীবনপথে টানিয়া নিয়া গেল।

কান্তবাবু তো গ্রামে আসিয়াই তালগাছ কাটাইলেন। বন্ধু জুটিলেন ধীরেনবাবু। তিনিও এমনিতরো যেন কিছু একটা খুঁজিতেছিলেন। ভদ্রলোক দুইজনেরই বিরাট পরিবার। গ্রামে আসিয়াই সকলে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে। ওঁরা কলিকাতায় চাকুরী-বাকুরী করেন। শনিবারে গ্রামে আসেন আবার সোমবারে চলিয়া যান। লোকগুলা গাঁয়ে আসিয়া এমন দেখিয়া চাকর রাখিয়াছেন যে স্ত্রীলোক জুটাইয়া দিবার জন্য যার খ্যাতি আছে।

লোকটার নাম সতীশ। বাগ্দীঘরের ছেলে, ছেলেবেলায় ভাল গলার দরুণ 'যাত্রাদলে' শ্রীকৃষ্ণ সাজিত। এখন বয়স হইয়াছে, গলা মোটা হইয়া গিয়াছে আর গান গাহিতে পারে না। কিন্তু যাত্রার দল হইতে দু-এক বন্ধুর কাছে শিখিয়া আসা নষ্টামিটা নিয়া আসিয়াছে ঠিক। দু-একবার দশরথদের পাড়ায় এই সতীশকে নিয়া কান্তবাবু ও ধীরেনবাবু ঢুঁ মারিয়াছিলেন। তবে ফিরিয়াও আসিয়াছিলেন এবং সে ফিরিয়া আসা হয়ত তাঁদের মনে আছে। জেলেরা গরীব হইলেও এম্নি-এম্নি ফিরাইয়া দেয় নাই।

পঞ্চু সম্ভবতঃ এসব কথা জানে না। অবশ্য জানিলেও দুঃখ ছিল না। কিন্তু দশরথ জানে। শুধু তাই নয় এইসব চরিত্রের লোকগুলাকে ফুড-কমিটিতে লওয়া হইয়াছে বলিয়া সে একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছে।

ইয়াসিন কহিল, যাক্‌গে ওসব কথা। কমিটি যা' হয়েছে তা তো আমরা বুঝছি। কিন্তু আমি যে কথাটা বল্‌ছি তার উত্তর দাওদিকি পঞ্চু। ধানচাল লেখা কমিটি না হয় হয়নি বলছ—কেন না তোমরা তিনজন লোক নতুন আছো। কিন্তু তোমরা তিনজনে ওদের মতলবে বাধা দিতে পারবে, এমন ক্ষমতা তোমাদের আছে?

পঞ্চু কহিল, বল না কি বল্‌ছ?

ঐ তো নয় বাপু, এবার কথা কহিল শরৎ তাঁতী। সে এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। রোগা ম্যালেরিয়া জীর্ণ শরীর। সারা জীবন তাঁত ঠেলিয়া আসিতেছে। বয়স হইয়াছে প্রায় ষাটের কাছাকাছি। কালো লম্বা চেহারা। মাথার চুলগুলা সামনের দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাকা। লোকটা ভাল তাঁতের কাপড় তৈরী করিতে পারে বলিয়া সুনাম আছে। পরনে মিলের ধুতি, গায়ে কোট জামা। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা। 'ঐ তো নয় বাপু' বলিয়া সে পঞ্চুর উদ্দেশে কহিল, উত্তরটা এড়িয়ে গেলে! তা যাও—কিন্তু আমি জানি তোমরা পারবে না। আর না পারলে কি হবে জানো? সেবারে ধানচাল তল্লাস করা সুরু হ'ল—সবাই জানে অধর কুণ্ডুর বাড়ীতে

একশো-দেড়শো ধানের মরাই। তার ধানে হাত পড়ল না কিন্তু বেচারী হারাণ, বেচারী লোকের লাঙলটা আরটা, কাস্তেটা-কাটারীটা ওর কামার-শালায় ঠিক ঠাক ক'রে দেয়, আমিও কতবার তাঁতের সানা ঠিক ক'রে নিয়ে এসিছি ওর কাছে—তাইতে ওকে ভালবেসে ধানচাল অনেকেই দেয়, যারা ওর মজুরী দিতে পারে না তারাও ধানচাল দিয়ে শোধ করে। এমনি ক'রে ওর ঘরে মণ দশেক ধান জমেছিল। কমিটি তল্লাস ক'রতে গিয়ে সেগুলো 'সিল' ক'রে দিয়ে এল। মিথ্যে বলছি কি সত্যি বলছি জিগ্যেস করো ওকে—

দশরথ হাসিয়া উঠিল।

ইয়াসিন হাসিয়া কহিল, তা হ'লে বাপু এই কমিটিই তো লোককে চাল দেবে! এবার ভেবে দ্যাখো গরীবগুর্ব্বো লোক কেমন খেতে পাবে? ডাক্তার নিজে কমিটিতে যাবার জন্যে কথা বল্‌তে যায় নি, সে বলেছিল এই গরীবদের জন্যে—

এই গরীবদের জন্যে বলা হবে বলেই কি, পঞ্চু শ্লেষের ভঙ্গীতে কহিল, কাল রাতে শশী খুড়োর বাড়ীতে তোমাদের পঞ্চায়েত বসেছিল চাচা?

—পঞ্চায়েত!

—হ্যাঁ হ্যাঁ চম্‌কে উঠ্‌ছ কেন? মনে করো কি পঞ্চু খবরাখবর রাখে না?

—তা রাখবে না কেন?

পঞ্চু কহিল, দেখলুম বাবা রাতে শশীখুড়োর বাড়ী থেকে তুমি, হারাণ, দশরথ, শরৎদা সোজা বেরিয়ে গেলে।

উহাদের কথার মাঝখানে আশু ডাক্তার, শ্রীপতি ও শশী আসিয়া পড়িল। বৃষ্টি বোধকরি একটু কমিয়া আসিয়াছিল। আশু ডাক্তারের হাতে টর্চ-লাইট ছিল। সে দাওয়ার দিকে আলো ফেলিয়া দেখিল, সবাই চেনা লোক। পঞ্চুর গলা ডাক্তার আগেই শুনিতে পাইয়াছিল। তাই কোন রকম গৌরচন্দ্রিকা না করিয়াই সে কহিল, ওসব কথা তুলে আর লাভ কি? গরীবকে

বাঁচবার জন্যে যদি পঞ্চায়েত ক'রতে হয় তাতে দোষটা কি? সে তো আর ফুড-কমিটি হাতে রাখবার জন্যে পঞ্চায়েত নয়? গরীবরা না হয় পঞ্চায়েত করেছিল কিন্তু তোমরাই কি কিছুর কসুর ক'রেছিলে? গাঁয়ে গাঁয়ে লোক পাঠিয়ে, আগে থাকৃতে লোক মোতায়েন ক'রে রেখেছিলে—ফুড কমিটির ইলেকশনে যাতে হেরে না যাও—

পঞ্চু প্রতিবাদ করিয়া কহিল, কখ্খনো নয়—

ডাক্তার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ইচ্ছা করিলে সে দীনু ও পরাণকে দেখাইয়া দিতে পারিত কিন্তু তা না করিয়া সে বলিল, শুধু শুধু বকে তো লাভ নেই। চলো চাচা—চলো। বেস্পতিবার হয় জোচ্চোরেরই জন্যে। দেখলে না এস-ডি-ও, সার্কেল অফিসার পর্য্যন্ত ওদের এই অনিয়মে একটি কথাও কইলে না!

সকলে হাসিয়া উঠিল। ইয়াসিন কহিল, পানি থেমেছে কি?

ডাক্তার পকেট হইতে একটা শিশি বাহির করিয়া গলায় ঢালিয়া দিয়া কহিল, প্রায়।

সকলে দাওয়া হইতে নীচে নামিয়া পড়িল।

শ্রীপতি কহিল, আবার কেমন ঠেসিয়ে ঠেসিয়ে ভট্চায বল্লে শুন্লে—আমাদের দেখতে হবে তছরুপ-টছরুপ করেছে এমন লোক যেন কেউ কমিটিতে স্থান না পায়। আরে ব্যাটা তছরুপ ক'রে ক'রে জীবন কাটালি! তোর মুখে আবার রাম নাম!

যাক আর নয়, ঘনশ্যাম কহিল, বিষ্টি প্রায় ধরে এসেছে সব চলো—

ডাক্তার টর্চ ফেলিয়া ঝড়ের মত চলিতে লাগিল। সকলে তাকে অনুসরণ করিল।

ঘনশ্যাম চলিতে চলিতে কহিল, কে জানে বেজাটা কি ক'রছে?

ডাক্তার হঠাৎ থামিয়া পড়িয়া বলিল, বাস্তবিক। আচ্ছা চলো আমরা যাচ্ছি—

ডাক্তার আবার ঝড়ের মত চলিতে লাগিল। সকলের সম্মুখে বোধ করি ভাসিয়া উঠিল, মাটির ভিতর হইতে উঠা একটা নরকঙ্কাল।

ওদিকে ঝড়-বৃষ্টিতে বিজয়, পরমেশ ও জীবন দামোদরের খালের ধারে শ্মশানে সীতার কঙ্কাল পুড়াইতে নাস্তানাবুদ হইয়া গিয়াছিল।

ফাঁকা মাঠের মাঝে খালের ঢালু পাড়ে শ্মশান। মাথার উপর কোন আচ্ছাদন নাই, এমন কি একটা গাছও নাই। সদ্যকাটা বাবলাগাছের কাঠে জ্বালানো হইয়াছিল চিতা, বৃষ্টির ঝাপটায় সে চিতা গেল নিভিয়া—তার উপর ঝড়ের ঝাপটায় শুধু অনর্গল ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল। একে ঝড় ও বৃষ্টি, তদুপরি এই ধোঁয়া, শ্মশানে দাঁড়ায় কার সাধ্য!

তবু শেষ পর্য্যন্ত সেখানে দাঁড়াইতেই হয়। কারণ জ্বালানো চিতা নিভিয়া গিয়াছে বলিয়া তো আর ফেলিয়া রাখা যায় না। তা ছাড়া ফেলিয়া যাওয়া দেশাচারও নয়। এই দেশাচার নিয়াই যত মুস্কিল। তা না হইলে সীতার এই কঙ্কাল হয় তো পুড়াইবারও প্রয়োজন হইত না।

ঝড়-বৃষ্টি কাটিয়া গেলে আবার তারা নূতন করিয়া চিতা জ্বালাইল। চিতা জ্বালাইলেই বা হইবে কি! সদ্য মরা মানুষকে যে ভাবে সহজে পুড়ানো যায়, মানুষের শরীর হইতে পৃথক করা কঙ্কালকে ঠিক তত সহজে পুড়ানো যায় না। একে মৃত-মানুষের শরীরের মাংসল অংশটা ঝরিয়া গিয়াছে, তদুপরি দিনের পর দিন মাটির নীচেকার রসে কঙ্কালটা রসিয়া পাকা হইয়া গিয়াছে, এমনকি পাথর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অবশ্য আগুনেও পাথর পুড়ে। কিন্তু সে তেমনিতরো আগুন হওয়া চাই। সামান্য বাবলা কাঠের আগুনে তা পুড়ানো যায় না।

তবু কঙ্কালটা পুড়ানোই হইল। আগুনের শিখায় যখন হাড়গুলি খানিকটা জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে তখনই বাঁশের খোঁচা দিয়া দিয়া সেগুলাকে

টুক্‌রা টুকরা করিয়া দেওয়া হইতে লাগিল। এইভাবে কঙ্কালটা পুড়াইতে প্রায় মধ্যরাত্রি পার হইয়া গেল।

মুক্ত-আকাশের বুকে তখন জোৎস্নার উচ্ছ্বসিত হাসি সুরু হইয়াছে। দূর আকাশে রাতের চাতক তখনও হাঁকিতেছে, ফটিক জল—ফটিক জল। এত জলেও বুঝি তার তৃষ্ণা মিটে নাই।

শেষ শ্মশান কৃত্য সারিয়া তারা বাড়ী ফিরিবার উদ্যোগ করিল।

বাড়ীর সামনে আসিয়া হরিবোল ধ্বনি দিতেই মা বাহির হইয়া পড়িল। বাড়ীর সুমুখে বসানো ছিল একটা কলসী, পাশে জ্বলিতেছিল ঘুঁটের আগুন এবং কলাপাতায় বসানো ছিল ছোলা আদা গুড় ও নিমপাতা। মা বলিল, আগে এগুলো সেরে নে বাবা সব—

অতঃপর একে একে সবাই ঘুঁটের আগুনে হাত সেঁকিয়া, নিমপাতা দাঁতে কাটিয়া আদা ছোলা ও গুড় মুখে দিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

পথে আসিতে আসিতেই তারা পুকুরে স্নান সারিয়া আসিয়াছিল। বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়াই দেখিল—দাওয়ার একদিকে টিম্ টিম্ করিয়া আলো জ্বলিতেছে, আর সেই স্বল্পালোকে একদিকে বসিয়া আছে ঘনশ্যাম, শশী, ও শ্রীপতি, আরেক দিকে বসিয়া আছে বনমালা ও কুসুম।

বিজয় কহিল, জ্যাঠা তোমরা এখনও বসে আছো?

তোরা গেছিস্, ঘনশ্যাম কহিল, ভাবলুম এলেই যাব। তাই বসে আছি।

বিজয় ইত্যবসরে একবার কুসুমের দিকে তাকাইয়া নিল। কিন্তু কুসুম কোন কথা বলিল না। সে বনমালাকে ঠেলিয়া দিল। বনমালা উঠিয়া পড়িল।

ঘনশ্যাম কহিল, হ্যাঁরে খুব কষ্ট হয়েছিল তো?

সে আর বল্‌তে, বিজয় কহিল, এরকম ফেরে জীবনে আর কখনো পড়ি নি।

সোজা জল ঝড় কিরে বাবা, শ্রীপতি কহিল, সে যাই হোক্ এখন দুটি দুটি কিছু মুখে দিয়ে এবার সব যে-যার গিয়ে শুয়ে পড়ো দিকি। আবার শরীরটা তো রাখতে হবে সকলকে।

বিজয় কহিল, আমি কিন্তু কিছু খাব না।

সে কি একটা কথা হ'ল, শ্রীপতি কহিল, তোমার সঙ্গে পরমেশ রয়েছে জীবন রয়েছে—তুমি না খেলে ওরা খাবে কেন?

ওরা খাক্ আমি খাব না, বিজয় কহিল।

পরমেশ কহিল, বারে মজা!

ওসব কাজের কথা নয়, শ্রীপতি কহিল, কই গো বিজয়ের মা—দাও না ওদের ঠাঁই ক'রে।

বিজয়ের মা হাঁকিল, ও বউমা?

বনমালা ঠাঁই করিয়া দিবার জন্য ব্যবস্থা করিতে গেল।

বিজয় কহিল, কাপড়টা ছাড়ব না?

ঘনশ্যাম কহিল, কাপড়টা খেয়েই ছাড়িস্ না বাবা—ওরা যখন ভিজে কাপড়ে রয়েছে তখন তোমার কি কাপড় ছাড়লে চলে?

ঠিক কথা। বিজয় ভিজা কাপড়েই পরমেশ ও জীবনের সহিত খাইতে বসিল। শ্রীপতি বনমালার উদ্দেশ্যে কহিল, বিজয়কে কিন্তু শুধু মিষ্টি দিও বৌমা। আর ওদের তুমি সব কিছুই দিতে এরো—শুধু আঁস আর সকড়ি বাদ দিয়ে—

খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে পরমেশ ও জীবন বিদায় নিল। বিজয় কৃতজ্ঞতার সহিত কহিল, তোরা যে আমার কি উপকার করলি তা কি বল্‌ব।

পরমেশ সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, এ তো করতেই হয় ভাই।

জীবন কিছু মনে ক'রিস্ নি ভাই, বিজয় আগাইয়া গিয়া তার হাত দুটা ধরিল। সে কহিল, দূর—কি যে বলিস!

—মানুষের এমন বিপদ যেন কখনো না হয়।

—সেইটেই আসল কথা।

পরমেশ ও জীবনের বিদায় পর্ব্ব শেষ হইলে কুসুম কহিল, ঠাকুরদা এবার আমার বাড়ী পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে আসবে চলো।

হ্যাঁ যাব, শ্রীপতি কহিল, কিন্তু তোমরা আর রাত কোরো না—শুয়ে পড়ো।

শশী কহিল, কি হে ঘনশ্যাম যাবে নাকি ?

হ্যাঁ যাব, ঘনশ্যাম কহিল।

চল্‌লে সবাই তা হ'লে, বিজয় সকলের উদ্দেশ্যে কহিল। ঘনশ্যাম কহিল, সকালে আসব আবার। কাল আমি হরিহরের ওখানে যাব। যাবার আগে দেখা ক'রে যাব'খন।

—কালই হরিহরের ওখেনে যাবে ?

—হ্যাঁ।

—তা আমি যে যাব মনে করেছিলুম।

—কিন্তু কাল তোর যাওয়া হয় কি ক'রে? তে-রাত্তির না গেলে—

হুঁ, বিজয় চিন্তিত ভাবে বলিল, আচ্ছা আমি যদি পরশু যাই—

হ্যাঁ, ঘনশ্যাম কহিল, তা হতে পারে। তবে ওদের বাসা গিয়ে কি চিন্‌তে পারবি ?

বিজয় কহিল, বাসায় যাবার আমার দরকার কি। আমি সোজা হাঁসপাতালে গিয়ে উঠ্‌ব।

—হাঁসপাতাল চিনিস্‌ তো ?

এবার আর বিজয় কথা বলিল না—বলিল মা। বুড়ী উদ্গত অশ্রু দমন করিতে করিতে বলিল, হতভাগীরই জন্যে তো ওকে হাঁসপাতালেও যেতে হয়েছিল।

ঠিক বটে হাসপাতালেই সীতার বাঁ-হাতটা কনুইয়ের কাছ হইতে বাদ দিতে হইয়াছিল। সেকথা স্মরণ করিয়াই ঘনশ্যাম হুঁশিয়ার হইয়া গেল। সে কহিল, তা হ'লে তুই পরশুই যাস্‌—এখানকার সব কিছু সেরে।

—হ্যাঁ তাই যাব।

সকলকেই বিজয় সব বলিল, শুধু বলিতে পারিল না কুসুমকে। কিসে যেন তার কণ্ঠ আপনা-আপনিই রুদ্ধ হইয়া আসিল কিন্তু কুসুম সবকিছু মানাইয়া

নিয়া বিজয়ের মা ও স্ত্রীর উদ্দেশ্যে কহিল, আসি গো জ্যাঠাই—আসি ভাই বৌদিদি।

মা বুড়ী বলিল, এসো মা—ভাগ্যি এসেছিলে তবু আমি যেন বাঁচনু।

বনমালাও ঘোমটার ভিতর হইতে চাপা-গলায় বলিয়া উঠিল, সকালে এসো—

—আসব।

সকলে আগুপিছু বিদায় নিলে বিজয় স্ত্রীকে কহিল, এই দাওয়াতেই একটা মাদুর পেতে দে দিকি—

বিজয়ের কথামত বনমালা তাই করিল। বিজয় শুইয়া পড়িয়া মায়ের উদ্দেশে কহিল, আর দেরী কেন মা—এবার শুয়ে পড়ো। যা হবার তাতো আগেই হ'য়ে গেস্‌লো—আজতো নতুন ক'রে কিছু হ'ল না!

হ্যাঁ বাবা, মা বলিল, কিন্তু মন যে বোঝে না।

তবু বোঝাতে হবে, বিজয় পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িল। বনমালা কহিল, পা-হাতগুলো টিপে দোব?

—দে।

বিজয় অনুভব করিল, বনমালা তার পা টিপিতেছে।

১১

কিন্তু ঘুম কোথায় ?

আগের দিন প্রায় সারাদিন সে আদর্শগ্রামের জমিতে লাঙ্গল দিয়াছে। রাতে স্বামী-স্ত্রী দুইজনে মিলিয়া বীজ তুলিয়াছে, ভোর হইতে না হইতেই ধান রুইতে গিয়াছে, দুপুরে আসিয়া আবার আদর্শগ্রামের জমিতে লাঙ্গল দিতে লাগিয়াছে! তারপর এই কঙ্কালের কলঙ্ককর অধ্যায়, ঝড় ও বৃষ্টি, চিতার আগুনের সহিত প্রাণপণে লড়াই। ইহার মধ্যে বিশ্রাম সে পায় নাই। অথচ কি আশ্চর্য্য—ক্লান্তি নামিয়া আসে নাই তার শরীরে, চোখে নামিয়া আসে নাই ঘুম, মাথাও চিন্তাভারাবনত নয়। ভাবিতেও যেন কেমন লাগে।

ছায়াচিত্রের মত একে একে গত কয়েকদিনের ঘটনাবলী চোখের সুমুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। পৃথিবী যেন কি হইয়া গিয়াছে!

চারিদিকে শুধু অত্যাচারের পর অত্যাচারের কাহিনী। সমাজে যারা বড়, যারা উচ্চবর্ণ, যাদের আছে পয়সা, মোড়লীয়ানা করিয়া যারা জীবন কাটায়—তাদের দুষ্কার্য্যের, তাদের দুর্নীতিপরায়ণ জীবনের বীভৎস কুকীর্ত্তি ক্রমশঃই যেন সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছে। পল্লীগ্রামে এমন কোন মানুষ নাই যে তার প্রতিকার করে।

তার মনের কোণে সহসা উঁকি দেয়—একদিন এই অঞ্চলের লোকেরা জমিদারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিল। সেদিন কেমন করিয়া সংগ্রাম করিয়াছিল কে জানে। এই প্রসঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ীর দেশের কথাও মনে পড়িয়া যায়। বর্দ্ধমানের চাষীরাও দল বাঁধিয়া ক্যানাল-করের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছিল। এত বড় বড় সব ইতিহাস রহিয়াছে চাষীর, আর আজ এইসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে চাষী রুখিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না ?

বিজয় ভাবিতে লাগিল, যদি সে, ঘনশ্যাম, শশী, শ্রীপতি, পরমেশ, জীবন, আশু ডাক্তার প্রভৃতি একজোট বাঁধিয়া চেষ্টা করে তা হইলে কি তারা পারে না সংগ্রাম করিতে?

মাথা যেন তার কেমন ভারী হইয়া উঠিল।

উঃ আজিকার ঘটনা—ইহা কি একটা সহজ ব্যাপার! তারা দরিদ্র। তার বোন সীতা এই দরিদ্র ঘরেরই মেয়ে। রূপসী বলিয়া তার খ্যাতি ছিল। কিন্তু তাকে বাড়ী হইতে ধরিয়া নিয়া গিয়া তার উপর অত্যাচার করা হইয়াছে এবং পাছে সে অত্যাচারের কাহিনী ফাঁস হইয়া গেলে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি-সুনাম বিপন্ন হয় তার জন্য তাকে হত্যা করিয়া মাটিতে লাস পুঁতিয়া রাখা হইয়াছে! এই সব মানুষ কি না করিতে পারে? অথচ এই সব মানুষই সমাজের মাথা, দেশের শিরোমণি—ইহা অপেক্ষা লজ্জাকর ও দুঃখজনক কাহিনী আর কি হইতে পারে!

এই উপর তলার লোকগুলাই দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। দেশের মানুষকে ইহারা মারিয়াছে, নিজেদের বিষাক্ত-হস্ত প্রসারিত করিয়া সারা দেশকে ইহারা বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। এমনদিন নিশ্চয়ই আসিবে, যেদিন মানুষ এইসব ভণ্ড, স্বার্থপর নরপশুদের ক্ষমা করিবে না—সময় ও সুযোগ মত উপযুক্ত শিক্ষা দিবে।

ভগবান! সে দিন আর কত দূরে?

এইসব সাতপাঁচ ভাবিতে ভাবিতে কখন যেন উত্তেজনা একটু কমিয়া আসিল। বিজয় সহসা অনুভব করিল, কি যেন একটা অবিচার করিয়া বসিয়াছে সে। মনে পড়িয়া গেল কুসুমের কথা।

সহসা তার মনে হইল, সে যদি উঠিয়া কুসুমের ওখানে যায় তো কেমন হয়? কুসুম এখনও বেশিক্ষণ যায় নাই। এখনও সে নিশ্চয়ই জাগিয়া আছে।

কিন্তু কেন সে জাগিয়া থাকিবে? বিজয় তো কোনদিন এমনভাবে তার ওখানে যায় নাই? যদি সে কোনদিন এমন ভাবে গিয়া থাকিত তাহা হইলে

না হয় সে আশায় আশায় জাগিয়া রহিত কিন্তু সে রকম তো কোনদিন হয় নাই—কাজেই কেন সে জাগিয়া বসিয়া থাকিবে ?

তবু কেন যেন বিজয়ের মনে হয়, কুসুম নিশ্চয়ই জাগিয়া বসিয়া আছে। মানুষের মন কেমন করিয়া যেন জানিতে পারে।

তা ছাড়া একথা তো পড়িয়াই আছে। সেই বৈকালে শ্মশানে যাইবার আগে কুসুমকে সে বাড়ীতে দেখিয়া গিয়াছে, রাতে শ্মশান হইতে ফিরিয়াও সে তাকে দেখিয়াছে—যে দরদ ও আন্তরিকতা নিয়া সে এই সময়টায় তাদের বাড়ীতে থাকিয়াছে, তার সেই দরদ ও আন্তরিকতাকে বিজয় কতখানি তারিফ করিয়াছে—আদৌ নয়। একে কুসুম অভিমানিনী, তার উপর বিজয় যেন তাকে দেখিয়াও দেখে নাই, কাজেই কুসুম যে ভিতরে ভিতরে অভিমানে ফাটিয়া পড়িতেছে, সে কথা বিজয় ছাড়া আর কে বুঝিবে ?

আরও একটা কথা তার মনে পড়িয়া গেল। সেই দারোগার তদন্ত করিতে আসার সময় যোগেশবাবুর বোর্ড অফিসে সে যে অমন করিয়া সবাইকে শুনাইয়া আসিল—কই তারপর তো আর সে একবারও কুসুমের সহিত দেখা করে নাই। অথচ কুসুম সেজন্য বিজয়দের বাড়ী বহিয়া ব্যাপারটা শুনিতে আসিয়াছিল। কাজেই ইহাতেও তার কম অভিমান হইবার কথা নয়।

বিজয় মনে মনে লজ্জিত হইল।

কিন্তু পরক্ষণেই আজ এই সীতার ঘটনায় কুসুমের উপস্থিতিটুকু তাকে কেমন যেন মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। কতখানি দরদ থাকিলে মানুষ বিশেষ করিয়া কুসুমের মত নানা অসুবিধা থাকার মানুষ, এমন করিয়া বৈকাল হইতে রাত্রি দুপুর পর্য্যন্ত তাদের বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে পারে! তার এই নীরব সহানুভূতির প্রতিদান দেওয়া প্রয়োজন।

শুধু কি তাই ?

আরও তো কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ অদ্যকার দুঃখজনক ঘটনার মধ্যে সে যে কষ্ট পাইয়াছে, তার লাঘব করিবে কে ? এই যে সে শুইয়া শুইয়া

ঘুমাইতে পারিতেছে না—ইহার কারণ কি? কত ক্লান্ত সে, তবু ঘুম আসিতেছে না। একটু শান্তি চায় সে, একটু শান্তি। শান্তির এই অমৃত-প্রলেপ তাকে কে দিবে?

কুসুমের ওখানে যাইবার জন্য তার মনটা যেন ছটফট করিয়া উঠিল। সে উঠিয়া বসিল। বনমালা ঘুমাইতেছে, ঘুমাক। সে উঠিয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

বর্ষা-ধৌত আকাশে চাঁদের আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গ্রামের গাছপালা পথঘাট কেমন যেন এক শান্ত-সুন্দর আবহাওয়ায় ভরিয়া উঠিয়াছে। দূর বন-পথে কোথায় যেন চাতকের সেই ডাক শুনা যাইতেছে, 'ফটিকজল' 'ফটিকজল।'

কুসুমদের বাড়ী অবধি সমস্ত পথটা কেমন যেন এক-প্রকার উত্তেজনায় সে চলিয়া আসিল। কিন্তু মানুষের মনের এই ভাব-প্রবণতার মূল্য কি? হরি-সভার সামনে আসিয়া সহসা তার মনে পড়িয়া গেল যে এটা পল্লীগ্রাম, এখানকার সমাজ পল্লীসমাজ। এই গভীর রাত্রিতে সে কুসুমের বাড়ীতে আসিতেছে, যদি কেহ ইহা দেখে তাহা হইলে গ্রামে আর কান পাতা যাইবে না, ঢি-ঢি পড়িয়া যাইবে।

তাই বাড়ীর সামনেটায় আসিয়া তার কেমন যেন একটা নূতন উন্মাদনা সুরু হইল। বুকখানা ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল। এমনও তার মনে হইল যে সে চলিয়া যাইবে নাকি! কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হইল সে চলিয়া যাইবে কেন? সে পুরুষ মানুষ। কাপুরুষের মত সে পালাইয়া যাইবে? না তা কখনও হইতে পারে না।

আবার তার মনে হয় সে পুরুষমানুষ বলিয়াই তো যত গণ্ডগোল। পল্লীসমাজের মানুষ একদিন তার কলঙ্ক ভুলিয়া যাইবে কিন্তু ভুলিবে না কুসুমের কথা। এ সমাজে নিষ্কলঙ্কা নারীর প্রতি নিক্ষিপ্ত কলঙ্ক কখনও ঘুচে না। তাই তার মনে হয়, কুসুমের মুখ চাহিয়াই তার ফিরিয়া যাওয়া উচিত।

১২

ভোরে বৃষ্টি থামিলে যথারীতি ঘনশ্যাম আসিয়া উপস্থিত হইল। বিজয় ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িয়া কহিল, ঘুমিয়ে পড়েছিনু জ্যাঠা।

ঘুমের আর দোষ কি, ঘনশ্যাম কহিল, যাক্ তুই তা হ'লে কাল যাচ্ছিস্ তো?

বিজয় কাপড়টা ঠিক করিয়া সামলাইতে সামলাইতে বলিল, হ্যাঁ নিশ্চই।

তা হলে আমি আর দেরী ক'রব না, ঘনশ্যাম কহিল, তারকেশ্বর যেয়ে থাড় ট্রেনখানা ধরতে পারি তো সকাল সকাল পৌঁছুতে পারব। বেলা হয়ে গেলে ওদের আবার রান্নাবান্না নিয়ে বড় হ্যাঙ্গামে পড়তে হবে।

হ্যাঁ, বিজয় কহিল, থাড় ট্রেনে গেলে আর দেরী ক'রলে চলবে না।

কি ক'রব বিষ্টিটা ঠিক তালে এসে পড়ল, ঘনশ্যাম কহিল, তবে একটু পা চালিয়ে যেতে হবে আর কি।

তা একটু পা চালিয়ে যেতে হবে, বিজয় কহিল, চলো তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

—তুই আর এই জল-কাদায় যাবি কেন বাপু?

—চল না।

মা কহিল, যাচ্ছিস বটে কিন্তু দেরী করিস নি। আমি বাবাঠাকুরের ওখানে যাব। হতভাগীর জন্যে আবার কালকে তে-রাত্তিরের ব্যাপার সারতে হবে তো। বাবাঠাকুরের কাছ থেকে ফর্দ্দ ক'রে আনব—আজ হাটবার আছে, সকাল সকাল হাটে গিয়ে ফর্দ্দ-মাফিক জিনিসগুলো কিনে এনে দিস্—

আচ্ছা, বলিয়া বিজয় ঘনশ্যামের সহিত বাহির হইয়া গেল।

একটু বেলা হইলে কুসুম কথামত বিজয়দের বাড়ীতে আসিল।

বহুদিনকার সঞ্চিত পুঞ্জীভূত-বেদনা তার যেন একেবারে হাল্কা হইয়া

গিয়াছে। রাতের ঘটনায় কুসুম এমন বদলাইয়া গিয়াছে যে, অনেক সময়ে সে নিজেই ঠিক করিতে পারিতেছে না—সত্যই সে সেই আগেকার কুসুম কিনা। কিন্তু তবু তার মাঝে তার কি যেন একটা ভয়—বনমালা রাত্রির ব্যাপার বুঝিতে পারে নাই তো? কুসুম বদলাইয়া নূতন হইয়াছে বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার এই ভয়টাও নূতন। এরূপ ভয় তো সে আর কখনো পায় নাই।

অবশ্য কুসুমের ভয় পাইবারই কথা। বনমালার ঘরে সে সিঁধ দিতেছে। যে মানুষের বিবেক আছে সে তো ইহাকে মনে মনে অপরাধই ভাবিবে এবং সেই অপরাধ পাছে গৃহস্থের চোখে পড়িয়া যায়, সে আশঙ্কা হওয়া তার খুবই স্বাভাবিক।

তা ছাড়া আরও একটা ভয় তার হইতেছিল। রাতে বিজয় তার ওখানে গিয়াছিল—দিনের আলোয় তার সেই রাত্রির মূর্ত্তি কেমন হইবে কে জানে। যদি সে অনুতপ্ত হয়, যদি সে বাঁকিয়া যায়। কিম্বা কুসুমকে সকালে নিজেদের বাড়ীতে আসিতে দেখিয়া যদি সে তাকে নির্ল্লজ্জ ভাবে?

কিন্তু তার সমস্ত ভয় এক মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইয়া গেল। কুসুম উঠানে পা দিয়াই শুনিতে পাইল, বনমালা বলিতেছে—'জ্যাঠাকে যে আগিয়ে দিতে গেল লোকটা, আর তো ফেরবার নাম নেই!' কুসুম কথা কটা শুনিয়াই যেন কেমন আশ্বস্ত হইল—বাঁচা গিয়াছে লোকটা বাড়ী নাই! তারপর যখন বনমালা আবার তাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, 'এসো ঠাকুরঝি', তখন সে যেন আরও বাঁচিয়া গেল। কুসুম বনমালার ঐ সম্বোধনে খুশি হইয়া দাওয়ার দিকে আগাইয়া গেল।

বনমালা তার চোখে-মুখে যেন একটা নূতনত্বের ছাপ দেখিতে পাইল। তপস্বিনীর কৃচ্ছ্র-সাধন করা মূর্ত্তি যেমন সাফল্যের মাধুর্য্যে শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠে কুসুমেরও চোখে মুখে যেন তার ছায়া। তবু কোথায় যেন তার মধ্যে প্রদীপের উদ্ভাসিত আলোর মত সহজ-দীনতা। বনমালার বড় ভাল

লাগিল কুসুমকে। তাই দরদীকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ ঠাকুরঝি কাল রাতে গিয়ে কিছু খেয়েছিলি ?

কুসুম মৃদু মৃদু হাসিল ও বলিল, কেন বল্‌দিকি ?

—মুখটা যেন কেমন দেখাচ্ছে।

কুসুম দুষ্টমি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাল না খারাপ ?

খারাপ কেন দেখাবে লা, বনমালা বলিল, খাস্‌নি তাই বল্ না !

সত্যিই কিছু খাই নি, কুসুম কহিল, অতো রাতে গিয়ে আবার কে রান্নাবান্না করে। তাই দেখলুম না খেয়ে শুয়ে পড়াই হচ্ছে চালাক মেয়ের কাজ।

দূর পোড়ারমুখি, বনমালা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, আমারই ভুল হ'ল—তোকে এখানে খাইয়ে দাইয়ে পাঠিয়ে দিলেই ভাল হোত।

কুসুম কহিল, আমি খেতুম কিনা !

—কেন ?

—কেন কি ? সব পুরুষ-মানুষরা বসে থাকতে আর আমি গিল্‌তে বসতুম। মরণ আর কি !

তা নয়, বনমালা একবার বাড়ীর প্রবেশ-পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, ত্যাখদিকি আচ্ছা লোক সেই যে জ্যাঠাকে এগিয়ে দিয়ে আসি ব'লে বাড়ী থেকে বেরুল আর ফেরবার নামটি নেই। এদিকে ঘর-কন্নার কি কম্‌নে করতে হবে তার কিছু ঠিক নেই। অথচ এই তো হাতে আজকের দিনটি মাত্তর সময় !

কুসুম বুঝিল বনমালা অশৌচের কথা বলিতেছে। তাই সে কহিল, তা তো বটেই। কাণ্ড-মাণ্ড কিছু না হোক ভুজ্যি উচ্ছুগ্যু ক'রে একটা ছেরাদ্দ-মেরাদ্দ তো ক'রতে হবে।

হ্যাঁ ঠাকুরমশাই যখন বিধেন দিয়েছেন, বনমালা দৃঢ়ভাবে কহিল, করতে হবে বৈকি।

বিজয়ের মা এতক্ষণ গোয়ালঘরে ছিল। সম্ভবতঃ গোয়ালঘরে বসিয়া বসিয়া বুড়ী কাঁদিতেছিল। কান্না চাপিয়া বাহিরে আসিয়া বুড়ী গোবর মাখা হাত দুখানা হাতে হাতে ঘষিয়া গোবর সাফ করিতে লাগিল। তারপর কি মন গেল কহিল, হ্যাঁগা কুসুম তোদের ওদিকে নাকি ভোর রাতে কি একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে শুনুনু?

কিসের গণ্ডগোল জ্যাঠাই, কুসুম বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল।

—শুনিস্ নি কিছু?

—না জ্যাঠাই।

বুড়ী ধীরে ধীরে দাওয়ার দিকে আগাইয়া আসিয়া কহিল, সকাল বেলাতে আমি বাবাঠাকুরের ওখানে গেসনু হতভাগীর ছেরাদ্দ শান্তি কিভাবে ক'রব তাই জানতে। গিয়ে শুনুনু পঞ্চার বয়ের ঘরে নাকি শশী ঠাকুরপোর ছেলে দীনু সারারাত ছেল। পঞ্চা তাই না জান্‌তে পেরে দেস্‌লো ঘরে শেকল তুলে।

ওমা সিকি কথা গো, বনমালা সবিস্ময়ে কহিল, পঞ্চা ছেল কোথায়?

বুড়ী কহিল, ছোঁড়া কি রাতে বাড়ী থাকে গা?

ও হরি, বনমালা কহিল, কই এসে তো একথা বল্‌নি মা?

বল্‌ব কি বাপু নিজের জ্বালায় মরছিনু, বুড়ী কহিল, তা ছাড়া ভুলেই গেসনু কথাটা। এখন কুসুমকে দেখে মনে পড়ে গেল।

কুসুম কহিল, তারপর?

তারপর আর কি, বুড়ী বলিতে লাগিল, পঞ্চা তো লোকজনকে সব ডাকতে বেরিয়েছে দীনুর কীর্ত্তি দেখাবে ব'লে—এমন সময়ে ছোঁড়া ঘরের পোরোল গলে তো পালিয়েছে! লোকজন এসে সব গ্যাখে ঘরের মধ্যে বউটা একলা আর কেউ নেই। পঞ্চা তো লোকজনের সামনেই বউকে ধরে পিটুতে লাগল আর চেঁচাতে লাগল, 'বল মাগি তোর লোক কোথায় গেল।' ছোঁড়াও যত চেঁচায় বউও তত বলে—'লোক আবার কোত্থেকে আসবে?'

বনমালা ও কুসুম দু'জনেই জিজ্ঞাসুভাবে বুড়ীর দিকে তাকাইয়া রহিল।

বুড়ী বলিতে লাগিল, সত্যি মিথ্যে জানি না মা। পঞ্চা বললে, দীনু নিশ্চয়ই পোয়াল গলে পালিয়েছে। লোকেও তাই বিশ্বেস করলে। কিন্তু বউটা বড় হুঁসিয়ার—সে বল্‌লে, 'আমার বদনাম দেবে ব'লে একটা মনগড়া কথা অমনভাবে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তোমরা কেউ বিশ্বেস ক'র না।' কেউ কেউ বউটার কথাও সত্যি বলে মানলে—কেন না পঞ্চাকে তো লোকের জানতে বাকী নেই।

বনমালা কহিল, তবে দীনুও তোমার ভাল ছেলে নয় মা। জানো তো সেই সেবারে জঙ্গলপাড়ার সেই বউটার সঙ্গে কিত্যি ক'রে ক'বছর জেল খেটে এল।

বুড়ী কহিল, তা না হয় মানলুম কিন্তু সে যে পঞ্চার বয়ের ঘরে ছেল, তা তো নাও হতে পারে।

কুসুম কহিল, বটেই তো।

বনমালা কহিল, যাকগে বাবা ওসব কথায়। কে কোথায় ডুবে ডুবে জল খায় না খায় সেকথা কে খোঁজ রাখবে বল ?

আরে তা নয় তো কি, বুড়ী কহিল, গেসলুম ওদিকে, শুনেও এনু—তাই বলছি।

এসব কথা শুনিতে শুনিতে কিন্তু কুসুমের মনটা কেমন হইয়া গেল। পঞ্চুর বউ সৌরভের ঘরে দীনু ঢুকিয়াছে কি, না ঢুকিয়াছে, পঞ্চু সেজন্য ঘরে শিকল তুলিয়া দিয়াছে, লোক ডাকিয়া বউকে সকলের সাম্‌নে মারিয়াছে এবং সেকথা পল্লবিত হইয়া লোকের মুখে মুখে কত দূর-দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শুধু ছড়াইয়া পড়ে নাই, সেকথা নিয়া জটলা আলোচনাও চলিতেছে। এই তো এইখানে—এই বিজয়দের বাড়ীতে তারা কজনেই তো আলোচনা করিতেছিল।

ঠিক ইহার পাশাপাশি সে ভাবিল, নিজের কথা। রাতে তার ঘরে বিজয় গিয়াছিল, ভোর পর্য্যন্ত সে তার কাছে ছিলও—যদি একথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পাইত তা হইলে হয় তো অমনি করিয়াই তার ঘরে শিকল তুলিয়া দেওয়া হইত,

হয় তো অমনি করিয়াই গাঁয়ের লোকজনকে ডাকাইয়া সকলের সামনে তাদের বিচার করা হইত, তারা যে ডুবিয়া ডুবিয়া জল খায় সেই কথাই গ্রামময়, গ্রামের বাহিরে দূর-দূরান্তরে রাষ্ট্র হইয়া যাইত। লোকে যে কি ভাবে ব্যাপার-টাকে নিত তা তার জানিতে বাকী নাই। লোকে বাহির হইতে দেখিত তাদের দুজনের খারাপ দিকটাই—তারা দেখিত না ভিতরকার গোপন ও পবিত্র ভালবাসার উচ্ছল আবেগ। কেমন যেন একটা ভয়ের আভাষে বুকখানা কুসুমের টিপ্ টিপ্ করিয়া উঠিল, গলা শুকাইয়া গেল। গতরাত্রির চঞ্চল উন্মাদনার আমেজ বোধকরি এখনও নিঃশেষিত হয় নাই, তার উপর এমনিতরো একটা অচিন্তনীয় ভয়—অতি সহজেই বুঝা যায় যে কুসুম অস্বস্তি বোধ করিবে।

এই অবস্থা হইতে কুসুম প্রাণপণে নিজেকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কেন না বনমালা সুমুখে রহিয়াছে। সে স্ত্রীলোক। বুঝিয়া ফেলিবে স্ত্রীলোকের মন। গত রাত্রিতে যে বিজয় তার ওখানে গিয়াছিল তা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। বনমালার কাছে কুসুমও ছোট হইয়া যাইবে, বিজয়ও ছোট হইবে। কেন না সে তো বুঝিবে না, ভালবাসার আবেগে তারা এরূপ করিয়াছে? কাজেই নিজেকে সামলানো দরকার।

সহসা কুসুমের মনে হইল সে যেন জীবনের এক পিচ্ছিল পথে পা দিয়াছে। কিন্তু কেন দিল? কি প্রয়োজনে ছিল তার এইভাবে পিচ্ছিল পথে পা বাড়াইবার? বাল্যকালে তার বিবাহ হইয়াছিল, তখন হইতে স্বামী নিরুদ্দেশ —তার প্রাণের ক্ষুধা, তার দেহের ক্ষুধা, তার জীবনের ক্ষুধা মিটে নাই বলিয়াই কি সে এপথে পা দিয়াছে? তা তো নয়। জীবনের উপর দিয়া তার কাটিয়া গিয়াছে অনেকগুলা বছর, অনেক বিপদ-আপদ, ঝড়-ঝঞ্ঝা. অনেক জ্যোৎস্না-মদির রাত্রি, বসন্তদিন, কোকিল-কূজিত নিস্তব্ধ দুপুর—কই সে তো কখনও উতলা হইয়া, এমন করিয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলে নাই?

তবু, তবু সে কেন গতরাত্রিতে এমন কাণ্ড করিয়া বসিল? পরক্ষণেই

তার মনে হইল, এজন্য তো সে দায়ী নয়—দায়ী বিজয়। রাগ গিয়া পড়িল বিজয়ের উপর। কেন সে অমন করিয়া তার কাছে গিয়াছিল? যদি কেহ দেখিয়া ফেলিত?

কিন্তু সে না হয় অমন করিয়া গিয়াছিল, কুসুমের মন যদি এতই নির্দ্দোষ, নির্লিপ্ত, তবে সে বিজয়কে তাড়াইয়া দেয় নাই কেন? কেন সে চীৎকার করিয়া লোক জড়ো করে নাই? কিন্তু...কুসুম যেন আর ভাবিতে পারে না।

কুসুম এসব কি ভাবিতেছে? বিজয়কে সে তাড়াইয়া দিবে—যে বিজয়কে প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্ত্তে সে পাইবার আশা করিয়াছে, সেই বিজয়কে সে তাড়াইয়া দিবে? ইহা কখনো কি সম্ভব হইত তার পক্ষে? তা ছাড়া তাড়াইবেই বা কেন? ভালবাসা থাকিলে তো এরূপ করিতেই হয়। যারা তাদের বুঝিবে না তাদের চোখ এড়াইয়াই তো চলিতে হইবে। বিজয় তার কাছে গিয়া কিছুই অন্যায় করে নাই। বেশ করিয়াছিল সে গিয়াছিল। তবে কেহ দেখিলে ব্যাপারটা পঞ্চুর বউয়ের মত হইয়াই দাঁড়াইত। যাক্ কেউ দেখে নাই, বাঁচা গিয়াছে। তবে এবার হইতে তাকে একটু সাবধানে চলিতে হইবে।

কুসুমের মাথা হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া গেল। সে বনমালাকে কহিল, একগ্লাস জল দেতো ভাই বৌদিদি।

এমন সময় জল খাবি কেন রে, বনমালা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

কুসুম ফস্ করিয়া বলিয়া দিল, তেষ্টা অনেক আগেই পেয়েছিল। খেতে ভুলে গেছি।

আচ্ছা মেয়ে বাবা, বলিয়া বনমালা জল আনিতে গেল।

ইতিমধ্যে বাড়ীর বাহিরে কার যেন কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কে যেন বলিতেছিল, 'আমি ছাড়ব না—কিছুতেই ছাড়ব না। দেখে নোব পঞ্চাকে।' কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গেই বিজয় ও দীনু বাড়ীতে প্রবেশ করিল। বেশ বোঝা গেল দীনুই কথাগুলা বলিতেছিল।

বিজয়কে আসিতে দেখিয়া আজ যেন কুসুমের কেমন লজ্জা হইল। ভাল করিয়া একবার তার মুখের দিকে তাকাইয়া নিয়া কুসুম ছুটিয়া ঘরের মধ্যে বনমালার কাছে চলিয়া গেল।

বনমালা কহিল, ও কিরে—ঘরে পালিয়ে এলি যে!

কুসুম নিজের লজ্জার কথা চাপিয়া গিয়া কহিল, দীনু আস্‌ছে।

বনমালা মনে করিল, দীনুকে দেখিয়াই বুঝি সে লজ্জা পাইয়াছে। তাই সে কহিল, তা দীনুকে দেখে লজ্জায় পালিয়ে আসতে হবে?

কুসুম এবার বুদ্ধি করিয়া বলিল, আহা-মা লজ্জায় পালিয়ে আসব কেন। ওর কথা হচ্ছিল ব'লেই—

তাই বল, বলিয়া বনমালা কুসুমের হাতে এক গ্লাস জল দিল। কুসুম এক চুমুকে জলটুকু খাইয়া নিয়া গ্লাসটা ঘরের এককোণে রাখিয়া দিল।

বিজয় দাওয়ার কাছে আগাইয়া আসিয়া কহিল, কইরে সব গেলি কোথা? একটা মাদুর-টাদুর দে দিকি—

বনমালা মাথায় কাপড় দিয়া বাহিরে আসিয়া একখানা মাদুর দাওয়ায় পাতিয়া দিল। বিজয় দীনুকে কহিল, বোস্‌ ভাই—

দীনুর তখন রণমূর্ত্তি। ভোরবেলা পঞ্চুর বাড়ীতে যে কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে, তারপর তার বউয়ের যা-ই হইয়া থাকুক না কেন—দীনুকে যখন সেখানে কেউ দেখে নাই তখন পঞ্চুর বউয়ের সহিত তার নাম জড়াইয়া তার নামে কলঙ্ক লেপন করা হইয়াছে কেন? এবং সেকথা মূহূর্ত্তে মূহূর্ত্তে পল্লবিত হইয়া যে ছড়াইয়া পড়িতেছে তা-ই বা মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করা হইতেছে না কেন? ইহাই দীনুর মোট-মাট ব্যক্তব্য।

এই ব্যক্তব্য জানাইতেই দীনু পঞ্চুর বাড়ী যাইতেছিল, পথে বিজয়ের সঙ্গে দেখা হইয়া যাওয়ায় বিজয় তাকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া টানিয়া আনিয়াছে। কারণ সে জানে যে দীনু গেলে পঞ্চুকে এমনি-এমনি ছাড়িয়া দিবে না—হয়তো

খুনোখুনি কাণ্ড করিয়াই বসিবে আর তাতে জটিলতা বাড়িবে বৈ কমিবে না। কিন্তু দীনু যেন বে-পরোয়া।

দাওয়ায় উঠিয়া মাদুরে বসিয়া দীনু বলিল, আরে ভাই শুধু কি ঐসব কথাই বল্‌ছে লোকে। আমার নাম ধরে ধরে লোকে বলছে ঐ জন্যে ছোঁড়াকে বাপ আলাদা ক'রে দিয়েছে। বাড়ীতে ঠাঁই দেয় নি। কথাগুলা বলিয়া তারপর নিজেই যেন তার জবাব দিতেছে এমনভাবে বলিতে লাগিল, আরে আমার বাবা সে লোক নয়। বাড়ী ছেড়েছি আমি নিজে। আমার জীবনে একটা গেরো ছিল, ঘটে গেছে—তা আমি আর বাড়ীতে থেকে বাপ-চোদ্দপুরুষের নাম ডোবাই কেন, তাই আমি বাড়ীর বাইরেই রয়ে গেছি। তাতে লোকের বলবার কি আছে?

বাস্তবিক। একবার জীবনে তার একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। সে ঘটনা সত্য হউক, মিথ্যা হউক বা যা-ই হউক—সে যখন তা স্বীকার করিয়া নিয়া অন্যত্র বাস করিতেছে, তখন তাতে লোকের অমন করিয়া ফুলাইয়া-ফাঁপাইয়া বলা কেন? মনে মনে এসব কথা ভাবিলেও নেহাৎ নির্লিপ্তভাবেই যেন বিজয় বলিল, ছেড়ে দেনা বাবু ওসব কথা। দাঁড়া তামাক সাজি—আয়েস ক'রে খাওয়া যাক।

অতঃপর বিজয় তামাক সাজিতে গেল। ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া বনমালা চাপা গলায় বলিল, নাও এবার তামাক ধরাও। তারপর আধপহর বেলা কাটিয়ে দাও। আর ওদিকে হাটও ভেঙে যাক্—

বিজয় হুঁকা হাতে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, থাম্ বাপু। হাট ভেঙে যায় তো কি হবে? নেশা না ক'রে কোথাও যেতে নেই—

বল্‌লেই ঐ খুনসুড়িটুকু আছে, বলিয়া বনমালা মুখ ঘুরাইয়া কুসুমের দিকে তাকাইয়া কহিল, দ্যাখ্‌না ভাই—

বিজয়ের মাথায় মতলব খেলিয়া গেল। সে এই তালে কুসুমকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া নিবার উদ্দেশ্যে সোজা ঘরের ভিতর

ঢুকিয়া বলিল, বলতো কুসুম—নেশা না ক'রে যেতে আছে কোথাও? শাস্ত্রে বলে—

শাস্ত্রে কি বলে না বলে সেকথা কুসুম জানবে কি ক'রে, বনমালা সকলের সুমুখেই বিজয়কে একটা ঠেলা দিয়া কহিল, যাও মেয়ে ন্যাকরা পুরুষ কোথাকার!

বিজয় দাওয়ায় উপবিষ্ট দীনুর দিকে তাকাইয়া কহিল, এরকম বউ নিয়ে মানুষ ঘর করতে পারে বল্‌তে পারিস্‌?

দীনু রাগের মধ্যেও মুখে হাসি ফুটাইয়া তুলিল।

বিজয় তামাক সাজিতে গেল। বনমালা বলিতে লাগিল, ভাল লাগে না এরকম খুনসুড়ি। কাল ব'লে কি ক'রে সব কাজ মিটবে বাড়ীসুদ্ধ লোক আমরা সেই সবই ভাবছি—উনি কিনা করছেন ন্যাকরা। ন্যাকরা করবারই সময় বটে এখন!

বিজয় তামাক সাজিতে সাজিতে কহিল, যাচ্ছি রে বাবা যাচ্ছি হাটে —তোর হাট এখন বসেই নি।

বিজয়ের মা বুড়ি বুঝি গোবর-হাত ধুইতে পুকুরে গিয়াছিল।

বাড়ী ফিরিয়াই দাওয়ায় দীনুকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বুড়ী অবাক হইয়া গেল। এইমাত্র যে ছেলেটার কথা হইতেছিল, সেই ছেলেটা একেবারে তার বাড়ীতে আসিয়াই উঠিয়াছে! তা হইলে নিশ্চয়ই বিজয় বাড়ী অসিয়াছে। বুড়ী দাওয়ার কাছে আসিয়া দেখিল—হ্যাঁ বিজয় আসিয়াছে বটে। যাক্‌ বুড়ী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। যে সব পুরুষ-মানুষের নামে বদনাম আছে সে সব পুরুষকে কখনও বাড়ী ঢুকিতে দিতে নাই, বিশেষ করিয়া বাড়ীতে পুরুষ-মানুষ না থাকিলে—ইহাই বুড়ীর জীবন-যাত্রার পথে অভিজ্ঞতা।

বিজয়কে দেখিতে পাইয়া বুড়ী নিশ্চিন্ত হইতেই চিন্তাধারা কেমন পাক খাইয়া গেল। সোজাসুজি সে দীনুকে প্রশ্ন করিল, হ্যাগা এসব কি ব্যাপার-স্যাপার শুনছি তোমার নামে?

মিথ্যে জ্যাঠাই—মিথ্যে, বিরক্তভরে দীনু বলিয়া উঠিল

বুড়ী বয়সোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল, সব শুনেটুনে আমারও তাই মনে হ'ল।

যে শুনবে তারই মনে হবে, দীনু অধিকতর বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বহিল, যদি আমাকে ঘরেই শেকল দেয়া থাকবে জ্যেঠাই তবে শেকল খুলে আর আমাকে পাওয়া গেল না কেন?

ওরা বল্‌ছে তুমি নাকি পোরোল গলে বেইরে গ্যাছো, বলিয়া বুড়ী বয়সোচিত হাসি হাসিতে লাগিল।

বিজয় তামাক সাজিয়া আনিয়া দীনুর হাতে দিতে দিতে কহিল, ছেড়ে দাও না মা ওসব কথা!

বিজয়ের কথায় বুড়ী বুঝিল, ছেলে এসব ব্যাপার পছন্দ করিতেছে না। তাই বুড়ী গৃহকর্ম্মে নজর দিবার জন্য পুত্রবধুর দিকে চলিয়া গেল।

তামাক খাওয়া হইলে বিজয় দীনুকে কহিল, আর কিন্তু ওমুখো নয়—সোজা-সুজি বাড়ী চলে যাবি। ও ছোটলোকটার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি ক'রে লাভ কি?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া দীনু নীরবে চলিয়া গেল। বিজয় বুঝিল দীনুর রাগ এখনও পড়ে নাই।

দীনু চলিয়া যাইতেই বিজয় হাটে যাইবার জন্য মা ও বউকে হাঁক-ডাক করিতে লাগিল। বিজয়ের মা সকালেই শ্রীপতির কাছে গিয়া শ্রাদ্ধের ফর্দ্দ তৈরী করিয়া আনিয়াছিল। ফর্দ্দটা দিয়া বিজয় বলিল, নেমকর্ম্মর এগুলো সব দেখে শুনে কিনো—

একটা ধামা নিয়া বিজয় হাটে চলিয়া গেল।

বিজয় হাটে চলিয়া গেলে কুসুম ও বনমালা দাওয়ায় আসিয়া বসিল। বসিয়া বসিয়া দুইজনে গল্প চলিতে লাগিল।

কথায় কথায় শতকল্যকার ঘটনা আসিয়া পড়িল। দুজনেরই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। কুসুম কহিল, এরকম ঘটনাও ঘটে মনিষ্যির জীবনে!

হ্যাঁ, বনমালা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিল।

কুসুম কহিল, আমার তো মনে হয় এ ব্যাটা ভট্‌চাষ্যির কাজ।

—আমাদের তো তাই মনে হয়।

—মরে না মুখপোড়াটা।

খারাপ লোক চট করে মরে না, বনমালা কহিল, ভাল লোকগুলোই আগে যায়।

এদিকে ধীরে ধীরে বেলা বাড়িয়া উঠিতে ছিল। কুসুম উঠিয়া পড়িল। গতরাত্রিতে তার রান্নাবান্না করার জন্য খাওয়া হয় নাই। আজও সেভাবে কাটিলে মুস্কিল। তাই সে বলিল, পালাইরে বৌদি—আবার রান্নাবান্না ক'রতে হবে।

কি বল্‌ব বল, বনমালা বলিল, কাল কাজটাজগুলো এসে ক'রে দে যাস্‌। মার তো যা অবস্থা! কেঁদে কেঁদে বুড়ী সারা হয়ে যাবে—আর আমি ওসবের কিছু বুঝিও না।

আসব, বলিয়া কুসুম চলিয়া গেল।

বলা বাহুল্য যে বিজয় হাট হইতে ফিরিয়া স্নানাহার সারিয়া বাড়ীতে থাকিতে পারে নাই এবং সে যে কোথায় গিয়াছিল তা অনুমান করাও কঠিন নয়। দুঃখের অগ্নিশিখার প্রদীপ্ত-আলোয় সে খুঁজিয়া পাইয়াছে কুসুমকে—কাজেকাজেই তার কাছে কুসুম যে কতখানি তা শুধু সেই জানে।

তা ছাড়া তার জীবনে ইহা এক নূতন উন্মাদনা। বনমালা তার ঘর, তাকে সে পাইয়াছে অনেকদিনই, আর কুসুম তার বাহির, তাকে সে পাইয়াছে সবে মাত্র। সেজন্য এই দিককার আকর্ষণ তার বেশিই।

১৩

পরদিন শোনা গেল ফুড-কমিটি চাল দিবে।

খবর শুনিয়া অধর কুণ্ডুর বাড়ীর সম্মুখভাগ লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। এতদিন লোকে হাটবাজার, দোকান, আড়ত প্রভৃতি হইতে চাল কিনিয়াছে। তারা কখনও বুঝিতে পারে নাই, চালের অভাব হইলে কি ব্যাপকভাবে মানুষের মধ্যে শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। চালের জন্য এত মানুষ একসঙ্গে আর কখনও দেখা যায় নাই। ডিহিবাৎপুর ইউনিয়নের প্রায় দশবারো খানি গ্রামের লোক যেন একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

অধর কুণ্ডুর বিরাট দোতালা বাড়ী। বাড়ীটার কোল ঘেঁষিয়া লোকে লাইন দিয়াছে প্রায় অর্দ্ধমাইল জুড়িয়া। চালের জন্য লাইন দেওয়া চাঁপাডাঙা প্রভৃতি অঞ্চলে যারা দেখিয়া আসিয়াছে তারা যাতে নিয়ম মত চাল বিলি করা সম্ভব হয় তার জন্য লোককে এইভাবে লাইন দিতে পরামর্শ দিয়াছে। যা' করিলে চাল পাওয়া যাইবে, লোকে তাই করিতেছে। অনেক লোক এখনও লাইনের বাইরে রহিয়াছে। লাইনের ব্যাপার তারা বোঝেও না আর মানিতেও চায় না। জীবনে কেউ তো কখনও এমন করিয়া চাল কিনে নাই। পয়সা ফেলিলেই জিনিস পাওয়া গিয়াছে যখন, তখন লাইন-টাইন আবার কি!

অধর কুণ্ডুর বৈঠকখানা ঘরে চালের বস্তা ঠাসা। লোকগুলা সেইখানেই ভিড় করিয়াছে সবচেয়ে বেশি। ঘরের ভিতর দেখা যাইতেছে যোগেশবাবু, ভট্চায, পঞ্চু, ইব্রাহিম ও ফুড-কমিটির সেই দুইজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক, কান্তবাবু ও ধীরেনবাবু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি যেন পরামর্শ আঁটিতেছেন।

বাহির হইতে তাদের উদ্দেশ্যে কেহ বলিতেছে, 'বাবা পরামর্শ করে চালগুলো সব ভাবী-সাবী লোকের ঘরে তুলে দিওনা। গরীবদের দু-এক দানা

দিও।' কেহ বলিতেছে—'ফুস্ ফুস্ গুজ্ গুজ্ বন্ধ ক'রে একবার দিতে সুরু কর না বাপধন।' ছেলেপুলের দল ইতিমধ্যেই ছড়া বাঁধিয়া ফেলিয়াছে—'না দাও যদি আকালের চাল'—'খুলে ফেলব অঙ্গের ছাল।' কিন্তু কে কার কড়ি ধারে। ঘরের মধ্যে যেমনভাবে পরামর্শ চলিতেছিল, তেমনিভাবেই পরামর্শ চলিতে লাগিল।

আকাশে রৌদ্রের লীলা। লাইনের মধ্যে কেহ মাথায় কোঁচার খুঁট তুলিয়া দিয়াছে, কেহ দিয়াছে গামছা—যদি রৌদ্র হইতে মাথাটা বাঁচে, এই আর কি।

যারা চাল আনিতে আসিয়াছিল তাদের এই দুর্দ্দশার কথা ঝড়ের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। গ্রামের মেয়েরা পর্য্যন্ত ঘরের বাহিরে আসিয়া লোকজনের ভিড় দেখিতে লাগিল।

বিজয়ের তে-রাত্রি অশৌচের ক্রিয়া-কর্ম্মাদি সমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। শ্রীপতি পুরোহিত, কাজেই এতদুপলক্ষ্যে সে আসিয়াছিল—তা ছাড়া পরমেশ ও জীবন আসিয়াছিল, যেহেতু তারা এতদসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে লিপ্ত ছিল। কুসুম আসিয়াছিল বনমালার অনুরোধে।

ক্রিয়া-কর্ম্মাদি শেষ করিয়া বিজয় বলিল, আমি তো আজ সহরে চলে যাচ্ছি—দেখে আসি চালের জন্যে কেমন লাইন দিয়েছে লোকে। তারপর পরমেশ ও জীবনের দিকে তাকাইয়া সে কহিল, যাবি নাকি তোরা ?

পরমেশ কহিল, চল্—

শ্রীপতি বলিল, আমি কিন্তু বাড়ীর দিকে ছুটলুম।

বাড়ী যাওয়ার আগে ফলারটা সেরে যাও বাবা ঠাকুর, বিজয়ের মা বলিল।

শ্রীপতি বলিল, তা তো যাবই।

বিজয় বলিল, আমরা তিনজনেই যাচ্ছি—

হ্যাঁ তাই যা, বলিয়া শ্রীপতি ফলারের উদ্দেশ্যে বসিল।

অতঃপর বিজয়, পরমেশ ও জীবন তিনজনে পথে বাহির হইয়া পড়িল।

অশৌচের ক্রিয়া-কর্ম্মাদি মিটিলে বিজয়ের মা কলার পেটো, ভোঙা প্রভৃতি শ্রাদ্ধের জিনিসপত্র খালের জলে দিবার জন্য চলিয়া গেল। বনমালা যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। দাওয়ায় পা ছড়াইয়া বসিয়া সে কুসুমের উদ্দেশ্যে কহিল, বাবা বাঁচা গেল! আয় ঠাকুরঝি এবার একটু হাত-পা ছড়িয়ে বসি।

কুসুম কহিল, সত্যি এত পব্বোও আছে মানুষের!

পব্বো ব'লে পব্বো, বনমালা কহিল, ভ্যাখদিকিনি সেই কাল থেকে সব যোগাড় করছি। তাতেও সকালটা কি কম নাকাল হলুম! এই কুশ নেইরে, তেলহলুদ নেইরে, কড়ি নেইরে, কাপাস সুতো নেইরে, তিল নেইরে, গোবরের নাদি নেইরে—অর্ডার হল তো অমনি ছোট আন্‌তে।

সত্যি, কুসুম তারিফ করিল বনমালাকে।

বনমালা দুঃখ করিয়া কহিল, পোড়ারমুখি বেঁচে থেকেও আমাদের জ্বালিয়েছে আর মরেও জ্বালিয়ে গেল!

কুসুম কথাটা নির্ব্বিকার ঔদাসীন্যে শুনিল। সীতা যে বাঁচিয়া থাকিবার সময় ইহাদের জ্বালাইয়া গিয়াছে সেকথা আদৌ সত্য নয়। আর মরিয়া যে জ্বালাইয়া গেল তাতে তো তার হাত ছিল না। তবু বনমালা কথাটা কেন বলিল, তা সেই জানে।

কুসুমের এই উদাসীনভাব দেখিয়া বনমালা নিজের বলিয়া ফেলা কথাটার গুরুত্ব কমাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে কহিল, অবিশ্যি মেয়ে সে খারাপ ছিল না। তার রূপটাই ছিল ঘর-জ্বালানে। পেরথম যখন সব খুইয়ে পোড়ারমুখি এখানে এল তখন কি কম উৎপাত হ'ত বাড়ীতে—এই বড় বড় মাটির ডেলা এব্‌লা-ওব্‌লা যখন-তখন পড়ছে বাড়ীতে। গাঁয়ের ছোঁড়াগুলো তো বাসা ক'রে ফেলেছিল আমাদের বাড়ীর সামনে। অথচ সে যদি সেরকম মেয়ে হোত তবে কবে ভেসে যেত। বল্‌তে নেই পোড়ারমুখি তা কখনো করে নি। বাপের বংশের নাম রেখে গেছে ঠিকই। তবে সেইটুকুই কি কম জ্বালারে ভাই—

কুসুম এবার বনমালার কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া কহিল, তা তো বটেই।

বনমালা কহিল, তারপর রথ দেখ্তে গিয়ে হাতে লাগল ; সেই লোকটাকে একবার বাড়ীরে, একবার হাঁসপাতালরে—সেও কি কম জ্বালা!

কুসুম কহিল, পোড়ারমুখি যদি তখনও মরত তাও না হয় বোঝা যেত!

তা হ'লে ল্যাটা মিটেই যেত, বনমালা কহিল, ভাগ্যে রয়েছে পোড়ারমুখির এমনটা হবে—সে কি আর ওল্টানো যায়।

কিন্তু এ কিরকম মিত্যু বল্‌তো বৌদিদি, কুসুম বলিতে লাগিল, পেরথম পেরথম মনে হোত বুঝি পোড়ারমুখি কুলে কালি দিয়েই গেছে। অবিশ্যি যত দিন যেতে লাগল ততই মনে হতে লাগল, বোধহয় তা করে নি। কিন্তু তবু তো মনের খট্‌কা ঘোচে নি।

হ্যাঁ তা যা বলেছিস্, বনমালা বলিতে লাগিল, ভাগ্যি লাঙলে ঠেকেছিল হাড়টা—তাইতো?

—তা তো বটেই।

—শুধু কি তাই। ও লোকটার মনে যদি সন্দো না হোত তো মিটেই যেত। কিন্তু লোকটার সন্দো হয়েছিল বলেই তো। তা না হ'লে হাড় তো হাড়, কিসের হাড় বয়ে গেছে—বলে যদি জায়গাটা বাদ দিয়ে লাঙল চালিয়ে যেত তো এসব আর কিছুই জানা যেত না।

—তা হ'লে সন্দো হয়েছিল বল্?

—হ্যাঁ। সেইজন্যেই তো হাড়টা টেনে তুলেছিল।

কুসুম ভাবিতে লাগিল গ্রামের লোকের পাশবিকতার কথা। এমনি করিয়া তারা সীতাকে মারিয়াছে। কে জানে সম্ভবতঃ সেদিনও হয়ত কুসুমকে তারা অমনি করিয়া মারিত। ভাগ্যি বিজয় আসিয়া পড়িয়াছিল! কুসুম মনে মনে যেন শিহরিয়া উঠিল। মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচারের এই দিকটা মনে পড়িতেই সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা দিক তার মনে পড়িয়া গেল।

গতকল্য সকালে সে যখন এখান হইতে বাড়ী গিয়াছিল ঠিক সেই সময়ে তার কাছে পঞ্চুর বউ সৌরভ আসিয়াছিল। সৌরভকে এমন নির্ম্মমভাবে পঞ্চু প্রহার করিয়াছিল যে তার কপালটা কাটিয়া গিয়াছিল, পিঠ ও সর্ব্বাঙ্গে আঘাতের দাগ কালো হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছিল। তাতেও নাকি পঞ্চু ক্ষান্ত হয় নাই—সেজন্য আগুনে পোড়ানো লোহার শিক দিয়া ছ্যাঁকা দিবার ব্যবস্থা করিতেছিল। তাই দেখিয়া সে পালাইয়া আসে। কোথায় যাইবে কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া সে সোজাসুজি কুসুমের বাড়ীতেই আসিয়া পড়ে। এই ব্যাপারটা মনে পড়িতেই কুসুম কহিল, জানিস ভাই বৌদি কাল কিন্তু এক কাণ্ড হয়েছে আবার?

কি কাণ্ড রে আবার, বনমালা প্রশ্ন করিল। কুসুম একে একে সব কথা বলিয়া তারপর কহিল, বউটার আর রাখেনি কিছু—আমার তো দেখে টেখে মনে হোল মরে না যায়—

—এমন মার মেরেছে।

—হ্যাঁরে ভাই।

—অমন সোয়ামীর মুখে নুড়ো জ্বেলে দাও।

—যা বলেছিস্।

এবার স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দুর্ব্ব্যবহারের তত্ত্ব হইতে আরও গভীরে যাইবার উদ্দেশ্যে কহিল, তা সে যাই হোক—ও মারধোর তো গেরামে অল্প-বিস্তর আছেই। ওদের আসল ব্যাপার কিছু শুনলি?

—তা শুনলুম বৈকি।

—কি ব্যাপার বলদিকি?

—দীনুর সঙ্গে বাপু ব্যাপার ওর আছেই।

—ও বললে সেকথা?

—না ঠিক বলেনি। তবে দীনুর কথা উঠতে বউটা বললে—সে আর লোকই বা খারাপ কোথায়। জঙ্গল পাড়ার যে বউটাকে নিয়ে তার বদনাম

সে বউটা তো ভাল মানুষ নয়। তা ছাড়া মেয়েমানুষের ব্যাপার নিয়ে তার জেলও হয়নি—হয়েছিল চুরির জন্যে। পঞ্চুর বউ নাকি দীনুর কাছ থেকে শুনেছে যে—জঙ্গলপাড়া দিয়ে দীনু প্রায়ই চাঁপাডাঙ্গা যেত। বউটা বেহায়ার মত দীনুকে ইসারা ক'রত। দীনু একদিন সেজন্যে তাদের বাড়ীতে জল খাবার ছল ক'রে ঢোকে। বাড়ীতে তখন কেউ ছিল না। দীনু যখন জল খাচ্ছিল এমন সময় ছুঁড়িটার সোয়ামী-ছোঁড়া এসে পড়ে। ছুঁড়ির অমনি স্বভাবের জন্যে ছোঁড়া বরাবরই সন্দেহ করত। সেদিন একেবারে ঐরকম সামনা-সামনি পর-পুরুষের সঙ্গে দেখে ছোঁড়া তো একেবারে তেলে-বেগুনে হয়ে উঠল। ব্যস চেঁচামেচিতে গাঁয়ের লোক জড়ো হয়ে গেল। সবাই-ই দীনুকে দোষী সাব্যস্ত করলে। দীনু ক্ষেপে উঠল। বললে, তোমরা আমাকে থানায় দাও, পুলিশে দাও সব আমি সইব—কিন্তু মেয়ে মানুষের নাম জড়িয়ে নয়। গাঁয়ের লোকও দেখলে যে গাঁয়ের একটা বউয়ের নামে বদনাম। তাই তার চেয়ে দু'একটা গয়নাগাটি দীনুর হাতে দিয়ে বললে, দিনদুপুরে চুরি করছিল। ব্যস্ তাইতেই ক'বছর জেল হয়ে গেল।

বনমালা অবাক হইয়া প্রশ্ন করিল, এত কথা বললে পঞ্চার বউ?

হ্যাঁরে ভাই, কুসুম কহিল, এইসব কথা শুনেই তো আমার মনে হোল যে দীনুর সঙ্গে বউটার মাখামাখি আছে। তা না হ'লে এসব কথা তুমি জানোনা, আমি জানিনা, পাঁচজনে তো জানেইনা কিন্তু ও জান্‌ল কি ক'রে?

আরে সেকথা আর বল্‌তে, বনমালা বলিয়া উঠিল, কিন্তু কাল ভোরে কি ব্যাপারটা হয়েছেল সেকথা কিছু বলে নি?

বল্‌লে, তবে আসল কথা কি আর কিছু বল্‌লে, কুসুম বলিতে লাগিল, এদিক দিয়ে তো মেয়ে মানুষ খুব চাপা। মনে থাকলেও কিছু বল্‌বেনে। তবে তার মধ্যে বুঝে নিতে হবে—

তবু, বনমালা জিজ্ঞাসুভাবে কুসুমের দিকে তাকাইয়া রহিল।

কুসুম বলিল, বল্‌লে ঘরেই যদি ঢুকেছেল তবে শেকল বন্ধ করে রেখেও কি তাকে আর পাওয়া যেত না।

বনমালা বলিল, কিন্তু পোরোল ডিঙিয়ে পালিয়েছেল তো।

সেকথাও বল্‌লে, কুসুম কহিল, অন্য লোকদের পোরোল যেমন তেমন হোক্ ওদের পোরোল দিয়ে নাকি বেড়ালও গল্‌তে পারে না।

—তাই নাকি ?

—সেই কথাই তো বল্‌লে।

—তা হ'লে ওরকমটা হবার কারণ ?

কারণ ভাই আমি যা বুঝলুম, কুসুম বলিতে লাগিল, দীনুর সঙ্গেও ওর মাখামাখি আছে আর পঞ্চুর সঙ্গেও ওর বনে না। আসলে পঞ্চুও তো লোক ভাল নয়। যাত্রারদলের ছোঁড়াদের নিয়ে সে রাত কাটায়। বউয়ের বদনাম দিতে পারলে বউয়ের সুখদুঃখুর কথা ভাবতে হবে না—ব্যস্ তাই দাও একটা বদনাম আর ঠেঙাও কসে।

বনমালা যেন হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, কোনো লোকটার মুখে শুনবে না যে তাদের সোয়ামীতে-ইস্ত্রিতে মিল আছে।

বনমালার এই কথায় কুসুম যেন কেমন একটু সতর্ক হইয়া গেল। এ বনমালা কি বলিতেছে ? তার কি স্বামীর সহিত মিলে না ? কি করিয়া মিলিবে কুসুম কি তা জানে না ? যাক্ ওকথা। সে বলিয়া উঠিল, ওরে ভাই বউ-দি গল্প তো খুব করছি, এদিকে যে বেলা হয়ে গেল দু'পহর।

হোক্ না, বনমালা কহিল, তোকে তো গিয়ে আজ রান্নাবান্না ক'রতে হবে না।

—বটে ?

—তুই আজ আমাদের এখানে খাবি।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। যাক্ এখন খাওয়ার কথা রেখে বল পঞ্চার বউ তারপর কি করলে।

কুসুম কহিল, তারপর আর কি। আমি তো জানি—মেয়েরা যত মারই থাক্, সোয়ামীর কাছে না গেলে তাদের চল্‌বে না।

—তোর এক কথা।

—না আমি মিথ্যে কথা বলিনি। এ ছাড়া আর মেয়েদের গতি কি!

—তাতো বটেই।

—তাই বুঝিয়ে সুঝিয়ে খানিকবাদে দিলুম বাড়ী পাঠিয়ে।

বিজয়ের মা খাল হইতে ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই দেখিল বনমালা ও কুসুম তখনও গল্প করিতেছে। বুড়ী যেন একটু রাগ করিয়াই বলিয়া উঠিল, কিগো বউমা এখনও তোমরা গল্প-গুজবই করছ—সংসারে কি আর কাজ নেই?

বনমালা লজ্জিতভাবে উঠিয়া বসিল। কুসুমও যেন কেমন লজ্জা অনুভব করিল। বুড়ী আবার বলিল, বেলা চলল তিনপহরে—রান্নাবান্না তো চাপাতে হবে, না বসে থাক্‌লেই চল্‌বে? লোকগুলো খাবে—

বনমালা কুসুমের উদ্দেশ্যে কহিল, বোস্ ঠাকুরঝি—আস্‌ছি।

কুসুম কহিল, তা না হয় হ'ল—কুট্‌নো বাট্‌না যদি কিছু ক'রতে হয় দে না আমায়।

আসছি, বলিয়া বনমালা চলিয়া গেল।

বুড়ী আপন মনে বকবক করিতে লাগিল, পরমেশ খাবে, জীবন খাবে, আমরা কজন লোক খাব—তার জন্যে যোগাড়জাত যা' ক'রতে হয়, ক'রে নিয়ে কাজে লেগে পড়ো, তা নয় বসে আছো! এ কিরে বাবা!

এ যেন বুড়ীর চাপা তিরস্কার। কুসুমের ভাল লাগিল না বুড়ীর কথাগুলা। সে উঠিয়া পড়িল। দুপুরে তার এখানে খাইবার এতটুকুও ইচ্ছা নাই। অবশ্য বুড়ীর কথায় যে তার এরূপ মনে হইতেছে তা নয়। দুপুরে

সে বাড়ী থাকিলে বিজয় যাইতে পারে—গতকল্য যেমন গিয়াছিল তেমনিভাবে।

তাই উঠিয়া পড়িয়া সে ভাবিল কি করিবে।

পরশু রাত্রি হইতে তার জীবনের চাকা ঘুরিয়া গিয়াছে। কেমন যেন মধুর-মদির লাগিতেছে। পরশু রাতে বিজয় তার ওখানে গিয়াছে, কাল দুপুরে গিয়াছে। পরশু রাতে তার সহিত তেমন কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। কিন্তু কাল দুপুরে যেসব কথা হইয়াছে তা অপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয়।

দুপুরে বিজয় তাকে বলিয়াছে, 'আর তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে আমি রাজী নই।' কুসুম প্রশ্ন করিয়াছে, 'বনমালার কি করিবে?' বিজয় বলিয়াছে, 'সে তার নিজের আসনে ঠিকই থাকিবে।' তাতে কুসুম আবার প্রশ্ন করিয়াছে 'তাকে নিজের আসনে ঠিক রাখিয়া তুমি আমাকে কোথায় রাখিবে?' বিজয় উত্তর দিয়াছে সে কথার, অদ্ভুত উত্তর, যে উত্তর কুসুম তার সারা-জীবনেও কখনও পায় নাই। শুধু কুসুমই বা বলি কেন, অনেক কুসুমই পায় নাই। বিজয় বলিয়াছে, 'মানুষের জীবনের দুইটা দিক: একদিক ঘর ও আরেকদিক বাহির। বনমালা আমার ঘর আর তুমি আমার বাহির। ঘরে ও বাহিরে আমার ভালবাসা থাকুক ছড়াইয়া।' একথা শুনিয়া অবধি কুসুম মকরন্দ-পিয়াসী লোভাতুরা ভ্রমরার মত বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তার নারী জীবন যেন সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। বিজয় এমন করিয়াও তাকে মাতাইতে পারে!

সেই বিজয় তার ওখানে দুপুরে যাইতে পারে। তবে একটা কথা তার মনে পড়িয়া গেল। বিজয় বলিয়াছিল দুপুরে যদি সে নাও আসিতে পারে তবে বৈকালের দিকে নিশ্চয়ই আসিবে। বাড়ীতে বলিবে যে সে ঘনশ্যাম জ্যাঠার ছেলেকে দেখিতে যাইতেছে এবং সেজন্য পোঁটলা-পুঁটুলি নিয়া বাহির হইয়া পড়িবে কিন্তু তখন-তখনই না গিয়া সে কুসুমের বাড়ীতে আসিয়া উঠিবে এবং রাতটা কুসুমের কাছে থাকিয়া ভোর-ভোর শহরের

উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িবে। কাজেই দুপুরে তার যাওয়ার যেমন স্থিরতা নাই তেমনি রাত্রিতে যাওয়ার স্থিরতা ষোল আনা। কাজে কাজেই এখন উতলা হইয়া লোকের সন্দেহ উদ্রেক না করিয়া বরং রাত্রির অপেক্ষাতেই থাকা ভাল।

কুসুম আবার বসিয়া পড়িল।

ওদিকে চালের লাইনের শেষ নাই।

যারা লাইনে দাঁড়াইয়াছে তাদের প্রত্যেককে একসের করিয়া চাল দেওয়া হইতেছে। দশ আনা করিয়া সের। অধর কুণ্ডুর বৈঠকখানা ঘরে অধর কুণ্ডু, যোগেশবাবু প্রভৃতি ফুড-কমিটির সেইসব লোকগুলাই জটলা করিতেছে আর দরজার কাছে একজন লোক বস্তার মুখ খুলিয়া রাখিয়া দাঁড়িপাল্লা হাতে এক-এক সের করিয়া চাল ওজন করিয়া লোকের গামছায়, কোঁচার খুঁটে, স্ত্রীলোকদের আঁচলে ঢালিয়া দিতেছে। অসংখ্য লোক লাইনে, কাজেই তাড়াতাড়ি লোককে দিতে হইবে, সেজন্য তিন পোয়ায় একসের করিয়া সময় সংক্ষেপ করা হইতেছে।

মাঝে মাঝে ভট্‌চায্‌, পঞ্চু প্রভৃতি বাহিরে আসিয়া লোককে নিয়মানুবর্ত্তিতা শিখাইতেছে। সকলে যদি ঠিক ঠিক লাইনে দাঁড়ায় তা হইলে ঠিক পর পর চাল দিতে পারা যাইবে। তা ছাড়া এইরূপভাবে দাঁড়ানোর মধ্যে কেমন একটা শৃঙ্খলা ফুটিয়া উঠে। দেখিতেও যেমন সুন্দর হয়, কাজও তেমনি তাড়াতাড়ি হাঁসিল করা যায়।

বিজয়, পরমেশ ও জীবন অধরের বৈঠকখানার কাছে আসিতেই শশী, পরাণ, ইয়াসিন, দশরথ, হারাণ ও শরত তাঁতীর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। তারা কেউ লাইনে দাঁড়ায় নাই। লাইনে দাঁড়াইতে তাদের কেমন যেন বাধিয়াছিল। আরও অনেক লোক তাদের মতই লাইনে দাঁড়ায় নাই। তারা ঐস্থানে দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছিল। ইয়াসিন কহিয়া উঠিল, বাপজানের সব ক্রিয়া-টি্রয়া মিটে গেছে?

হ্যাঁ চাচা, বিজয় সবিনয়ে বলিল।

দশরথ কহিল, চাল নেবে নাকি বিজয় ?

না, বিজয় কহিল, দেখতে এলুম ফুড-কমিটির তামাসা।

তামাসাই বটে, ইয়াসিন বলিয়া উঠিল, কর্ত্তারা আমাদের রোদের বিচে নাচিয়ে তামাসা দেখছেন। হায় আল্লা, এত ব্যবস্থাও ক'রেছিলে!

শশী কহিল, বিজয় কি আজ যাচ্ছিস নাকি ঘনশ্যামের ওখানে ?

—হ্যাঁ খুড়ো আজকেই যাব।

—গেলে ফিরিস কিন্তু তাড়াতাড়ি।

ইয়াসিন কহিল, বাপজান যাবে কোথায় গা শশী ?

শশী ঘনশ্যামের ছেলে হরিহরের কথা বলিল। ইয়াসিন কহিল, ও!

হঠাৎ লাইনের গোড়ার দিককার লোকদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড গোলমাল শোনা গেল। ব্যাপারটা কি হইল? সবাই ত্রস্ত-চকিত হইয়া সেইদিকে ছুটিল। গোলমাল আরও প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। ব্যাপারটা কি? শুধু দেখা গেল চাল দেয়া ঘরখানার দরজা সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। জনতার ভিতর হইতে হঠাৎ একটা সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তবে এমনি ক'রে দু'তিনঘণ্টা লোককে রোদে দাঁড় করিয়ে রাখবার কি দরকার ছিল? আরও একজন কে যেন বলিয়া উঠিল, তিন-পোয় তো সের দিচ্ছো—তাতেও কুলোল না চালে? এমনিতরো আরও অনেক মন্তব্য জনতার ভিতর হইতে শোনা গেল এবং তাতে বুঝিতে পারা গেল যে চাল দেয়া বন্ধ হইয়া গেল।

বহু লোকের ঘরেই চাল নাই। আশায় আশায় সব লোক আসিয়া লাইনে দাঁড়াইয়াছে। দু'তিনঘণ্টা ধরিয়া সবাই রোদ মাথায় নিয়া অপেক্ষাও করিয়াছে। এখন চাল না পাইলে তো গোলমাল তারা করিতেই পারে।

কিন্তু করুক লোকে গোলমাল। দরজা যেমন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তেমনিই রহিল। শুধু যোগেশবাবু বাহিরে আসিয়া সকলের উদ্দেশ্যে কহিলেন,

এবলা সবাইকে ফিরতে হবে। এভাবে চাল দেওয়া অসম্ভব। আমরা একটা নিয়ম বের করছি, নিয়মটা হ'লেই কারো চাল পেতে কষ্ট হবে না। তা ছাড়া লোককে ইউনিয়নের সবগ্রাম থেকে এই একটা জায়গায় ছুটে আসতে হবে না। যে যার গাঁয়ে বসেই চাল পাবে—

যে যার গাঁয়ে বসিয়াই চাল পাইবে, কথাটা মন্দ নয়। সকলে যেন একটু আশ্বস্ত হইল। একজন জিজ্ঞাসা করিল, কিভাবে গাঁয়ে বসে চাল পাওয়া যাবে সেটা বলে দেওয়া হোক্।

এবার বাহিরে আসিলেন কান্তবাবু। দিব্যি মোটাসোটা গোলগাল চেহারা, মাথায় অল্প-স্বল্প টাক, রঙটা মাজা-ঘষা, লম্বাটে লোকটা। পরনে দীর্ঘ ঢোলাহাতা পাঞ্জাবী। বাহিরে আসিয়া হাত নাড়িয়া কহিলেন, কিভাবে চাল পাওয়া যাবে সেইকথাটাই বলছি। ইউনিয়ন বোর্ডের নজন মেম্বার আর তার সঙ্গে আরও তিনজনকে নিয়ে ফুড-কমিটি হয়েছে সেকথা আপনারা জানেন। এই বারোজন লোকের তত্ত্বাবধানে ইউনিয়নের বারোটা গ্রামে বারোটা সেণ্টার করা হবে—সেই সেণ্টারগুলোর এক-একটা থেকে এক-একটা গ্রামের চাল দেয়া হবে। যে-যার ইউনিয়ন ট্যাক্সের রসিদ দেখালেই চাল পাবেন।

জনতা বলিয়া উঠিল, সেকথা আগে বললেই তো মিটে যেত।

পিছনে আসিয়াছিলেন কান্তবাবুর জুড়িদার ধীরেনবাবু। রোগা লিক্‌লিকে লম্বা চেহারা। দেখিলেই মনে হয় ডিস্‌পেপ্‌সিয়া আছে। তবু লোকটা বেশ রুচিসম্পন্ন বাবুগোছের। কথা বলার প্রকাশ-ভঙ্গীটা তাঁর ভারী হৃদয়গ্রাহী। ভ্রূ-কুঁচকাইয়া হাত নাড়িয়া কথা বলেন। নিজস্ব ভঙ্গীতে কান্তবাবু কহিলেন, সেকথা কি করে আগে বলা যাবে—এ রকম ফাঁপরে কি কখনো মানুষ আর পড়েছিল ?

তা ঠিক, জনতার মধ্যে সমর্থন মিলিল।

বিজয় বলিয়া উঠিল, এ মন্দ ব্যবস্থা হ'ল না।

ইয়াসিন কহিল, আরে বাপজান তাই কি ঠিক ভাবে ওরা চাল দেবে

গেরামে। ফুটু কমিটির এক-একটি মেম্বর নয় তো, সব এক-একটি রাঘব-বোয়াল।

বিজয়, শশী, দশরথ, হারাণ, শরৎ, পরমেশ, জীবন, পরাণ প্রভৃতি ইয়াসিনের কথায় একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল।

কথাটা সকলের মনে লাগিয়াছে দেখিয়া ইয়াসিন কহিল, তা নয়ত কি বাপ্। আমি তো বুড়ো হয়িচি, ওদের আমি আজ লতুন দেখছি না।

দশরথ কহিল, ঠিক কথাই।

শরৎ কহিল, এরকম ক'রে চলবেনে। সোজাসুজি আমাদেরও জোট বাঁধতে হবে। চাল না দিলে আমাদেরও ওপরে লেখালেখি করতে হবে।

শশী কহিল, এই হচ্ছে লাখ কথার এক কথা।

কথাটা সকলেরই মনে ধরিল। সোজাসুজি সকলকে জোট বাঁধিতে হইবে ও চাল না দিলে উপরে লিখালিখি করিতে হইবে। কথাটা কেমন যেন বেশ ভরসাপূর্ণ। হারাণ পিঠাপিঠি বলিয়া উঠিল, এস তো আমরাও একদিন মিটিং বসাই সব।

ইয়াসিন কহিল, দাও গোটা ইউনিয়নটেয় ঢেঁড়ি। তারপর যা হয়, দেখা যাক্।

শশী কহিল, দাঁড়াও ঘনশ্যামটা ফিরুক একবার।

জ্যাঠা এখন কবে ফিরবে, বিজয় কহিল, ঢ্যাঁড়া তোমরা দিয়ে দাও না। ডাক্তারবাবু, ঠাকুরমশাই এরা তো আছে গাঁয়ে।

ইয়াসিন কহিল, হ্যাঁ সেই ভালো—ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একবার সলাপরামর্শ ক'রে ব্যবস্থা একটা ক'রে ফেলি এসো।

কথায় কথায় সকলে আশু ডাক্তারের ডিস্পেন্সারীর দিকে চলিল।

বিজয় পরমেশ ও জীবনকে নিয়া কিন্তু বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বাড়ী ফিরিয়া আহারাদি সারিতে প্রায় অপরাহ্ণ হইয়া গেল। পরমেশ ও জীবনকে

বিদায় দিয়া বিজয় বনমালাকে কহিল, তোরা খেয়ে নিয়ে আমার সব ব্যবস্থা ক'রে দে। রাতের ট্রেনেই আমি যাব।

বনমালা কহিল, যাবে তো পথে—ততক্ষণে একটু জিরিয়ে নাও না কেন?

—হ্যাঁ একটা মাদুর-টাদুর পেতে দে না ঘরে।

—তামাক তো খাবে।

—তা খাব বৈকি।

—আচ্ছা আগে তামাকটা তো দিই। তারপর মাদুর দিচ্ছি বিছিয়ে।

অতঃপর কথানুযায়ী কাজও হইয়া গেল। তামাক খাইয়া বিজয় শুইয়া পড়িল। কিন্তু এমন অবস্থায় শুইয়া পড়িয়া ঘুম আসিবে কেন? শুইয়া শুইয়া সে পূর্ব্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী ভাবিতে লাগিল কুসুমের বাড়ীতে রাত্রি-যাপনের কথা, তারপর ভোরবেলায় উঠিয়া অন্ধকারে অন্ধকারে তারকেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করা।

বনমালা কুসুমকে নিয়া খাইতে বসিয়া কহিল, আয় খেয়ে যা আমাদের বাড়ীতে শুধু-মুদু দুটো।

কুসুম কহিল, থাম আর ভনিতে ক'রতে হবে না।

এবার কথা কহিল মা বুড়ী। বলিল, যা দরকার টরকার হবে চেয়ে-চিন্তে নিস্। জ্যাঠাই কি দিতে কি দেবে, কিছু যেন মনে করিস নি বাপু।

কেন জ্যাঠাই ওসব কথা বলছ, কুসুম কহিল, আমি তো ঘরের মেয়ে গা—

ঘরের মেয়েই বটে, বিজয় চোখ বুজিয়া ভাবিল, জানিতে পারিলে তোমায় ঠেঙা পিটিয়া ঘরের মেয়ে হওয়ার সাধ মিটাইয়া দিবে।

আহারাদি সারিয়া কুসুম বিদায় নিল। তার মনে আজ আশার আনন্দ-ধ্বনি। আজ সে সময় থাকিতে প্রস্তুত হইতে পারিবে। সেদিন বিজয় অপ্রত্যাশিত ও অতর্কিত ভাবে তার ওখানে গিয়াছিল এবং সেজন্য সে প্রস্তুত হইয়া থাকিবার সময় পায় নাই। আজ কিন্তু তার হাতে যথেষ্ট সময় এবং পাছে সে সময়ের অপচয় ঘটিয়া যায় তার জন্য কুসুম যেন রীতিমত

সতর্ক। আহারাদি সারা হইলেই সে আর দেরী করিল না—বনমালা ও বিজয়ের মার কাছে বিদায় নিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

পথ যেন আজ এক নূতন রূপে তার চোখের সুমুখে ফুটিয়া উঠিল। গাছে গাছে যেন প্রকৃতির উজাড় করা রূপৈশ্বর্য্য, মাঠের দিগন্তহীন পথে ফসলের জীবন চাঞ্চল্য, বনে-বনান্তরে পাখ্-পাখালির ডাক, মেঘলোকে সদা-সঞ্চরমান কাদের যেন অনন্ত অভিসার।

কুসুমের মনে বুঝি আজ রঙ্ লাগিয়াছে।

দিন যায় রাত্রি আসে। দিনের দুঃখ, দিনের গ্লানি, মানুষের যত আশা আকাঙ্ক্ষা ও কামনা—সব যেন ফুল হইয়া ফুটিয়া উঠে রাত্রির কৃষ্ণময় সুবিস্তৃত পটভূমিতে। সকলের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়াই যেন বিজয় কুসুমের বাড়ীতে আসিয়া উঠিয়াছিল। রাত্রিটা কাটাইয়া সে চলিয়া যাইবে।

কুসুমের মনের অলিতে গলিতে যেন অজস্র ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে। কান পাতিয়া থাকিলে বুঝি ভ্রমর-গুঞ্জন শোনা যায়।

বিজয় সেদিন আসিয়াছিল, কুসুম ছিল তখন নিতান্ত অপ্রস্তুত। আজ কিন্তু আর তা হয় নাই। পূর্ব্বাহ্নেই সাজিয়া-গুজিয়া নিয়াছে। দামী সায়ার উপর তাঁতের রঙিন একখানা দামী শাড়ী পরিয়াছে কুসুম, আঁটসাঁট ব্লাউজ পরিয়াছে জীবনকে যেন বাঁধিয়া বাঁধিয়া, গলায় দিয়াছে চন্দ্রহার, কানে পরিয়াছে শহরের মেয়েদের মত পাশা, আধুনিক মেয়েদের অনুকরণে বাঁ-হাতে একগাদা সোনার চুড়ি, ডান-হাতের অনামিকায় বুঝি জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে একটা পাথর বসানো আংটি। শুধু এইসবই অবশ্য কুসুম পরে নাই—মানুষের মনের শিল্পী মানুষকে নিয়া আয়নার সুমুখে বসিয়া সে নিজের মুখমণ্ডলে চন্দনের কৃষ্ণচূড়া আঁকিয়াছে, কুঙ্কুমের টিপ পরিয়াছে ভ্রূ-যুগলের মাঝখানে। খোঁপায় বেড় দিয়াছে সদ্য ফোটা বক্-শিউলির মালা।

কুসুমকে যারা দেখিতে পারে না তারা হয়ত নানারকম গালাগালি দিবে। কিন্তু জানিয়া রাখা ভালো কুসুম গ্রামের মেয়ে হইলেও এই সাজ-পোষাক সে

করিতে শিখিয়াছে, সহরের মেয়েদের নিকট হইতেই। গ্রামের অন্ধ্র-রন্ধ্র দিয়া শহর-সভ্যতার ধোয়ানি তীব্র বেগে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। তা ছাড়া চাষার মেয়ের গায়ে এত অলঙ্কার দেখিয়া কারও কারও মনে নানা প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু তা-ও এই প্রসঙ্গে জানিয়া রাখা ভালো, কুসুম কোনরকম সন্দেহজনক কার্য্যকলাপের ফলে এগুলি অর্জ্জন করে নাই। নিজের কষ্টার্জ্জিত অর্থের দ্বারাই এগুলি সে স্যাকরার দোকানে নিজের মনের মত করিয়া গড়াইয়া নিয়াছে।

যুদ্ধের প্রথম দিকে এতদঞ্চলে শোণ-দড়ির কাজ হইয়াছিল প্রচুর—সরু দড়ি, মোটাদড়ি, ক্যামোফ্লেজ নেট ইত্যাদি। কুসুম সে সময় গ্রামের মধ্যে হইতেছে বলিয়া এই শোণদড়ি কাটার কাজে লাগিয়া যায়। বড় বড় কাঁটায় শোণ টানা, দড়িতে মাড় দেওয়া, জাল তৈরী করা এবং তার হিসাব রাখা প্রভৃতি কাজগুলি ভালই করিতে পারিত। সেই সময় সে দৈনিক দু-তিনটাকা করিয়া উপার্জ্জন করে। সংসারে তার নিজের ছাড়া আর কারও ভাবনা ভাবিতে হইত না। কাজেই সেই উপার্জ্জনে সে এই অলঙ্কারগুলি তৈরী করাইতে পারে।

বিজয় আসিবে তাই সে আগে হইতেই ফুলের মালা গাঁথিয়া রাখিয়াছিল। এমনিতরো সাজিয়া-গুজিয়া ফুলের মালা হাতে বিজয়কে অভ্যর্থনা করিল। বিজয় তো বিস্ময়ে হতচেতন! হাত ধরিয়া কুসুম বিজয়কে ঘরে নিয়া গেল। ঘরে দাঁড় করাইয়া গলায় তার মালা পরাইয়া দিয়া প্রণাম করিল। তারপর ডান-হাতের অনামিকার সেই আংটিটি খুলিয়া বিজয়ের বাঁহাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে পরাইয়া দিয়া কহিল, এই আমার চিহ্ন।

বিস্ময়ে বিজয়ের চোখে জল আসিল।

এই রাত্রি ভোরের আলোয় ফুরাইয়া আসিবে বিজয়কে চলিয়া যাইতে হইবে দূর শহরে।

হ্যাঁ, যাইতেই হইবে দূর শহরে।

১৪

নিঃসঙ্গ মানুষ যোগেশবাবু। সংসারে তাঁর আপনার বলিতে কিছু নাই—অবশ্য ধনদৌলত ছাড়া। তবুও যেন যোগেশবাবু কুশলী বিষয়ী লোক।

সেদিন দুপুর হইতেই ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। বাহিরে মেঘের আকাশ-মাতানো খেলা সুরু হইয়াছিল। বনে বনান্তরে শোনা যাইতেছিল পাগল-বাতাসের হাহাকার।

চোখের সুমুখে বিশ্বপ্রকৃতি যেন অন্ধকারে আবৃত। বোর্ড অফিসে যোগেশবাবু ছাড়া আর কেহ নাই। বাহিরে আকাশের দিকে তাকাইয়া তিনি একখানা চেয়ারে বসিয়া কি যেন ভাবিতেছিলেন।

যে যেমন মানুষ, তার কাছে এমনিতরো দিনগুলি নিতান্তই বন্ধুর মত। এমনিতরো বর্ষা-মুখর অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনে শিল্পীর ভাল লাগে তার সৃষ্টির উন্মাদনা অনুভব করিতে, কবির ভাল লাগে কাব্যলোকে উধাও হইয়া যাইতে, দম্পতি রচনা করে নব-মেঘদূত, বিরহিনী প্রিয়হারা মেয়ে মুখরা প্রকৃতির মতই উথলিয়া উঠে, শোকাতুরা জননী কাঁদে চুরি করিয়া, দরিদ্র রচনা করে আকাশ কুসুম। এমন দিনে কোন মানুষই নির্লিপ্ত উদাসীন থাকিতে পারে না। এমন কি যোগেশবাবুও নয়।

জীবনের যে দিকটায় মানুষের বাসা সে দিকটায় যদিও যোগেশবাবুর রুদ্ধ দ্বার, তথাপি যোগেশবাবু, যোগেশবাবুই। তাঁরও জীবনের একটা দিক আছে। সে দিকটাকে যে যেভাবেই দেখুক না কেন, যোগেশবাবুর কাছে সেদিকটা উপেক্ষনীয় নয় বরং সে দিকটাই যোগেশবাবুর কাছে একান্ত বরণীয়। যেভাবে ও যে আবহাওয়ায় তিনি মানুষ তাতে তিনি অন্য কিছু চান বা না চান, একটা জিনিস তিনি চান—মান, সম্মান, খ্যাতি-প্রতিপত্তি আর সকল

মানুষের উর্দ্ধে থাকিয়া সকল মানুষকে শাসনে রাখিতে। তারই আকর্ষণে, সম্রাটের আভিজাত্য নিয়া তিনি যেন জীবনের সুমুখ পথে অগ্রসর হইয়া যাইতে চান। ভয় আছে, বিপদ আছে, এপথে আছে অনন্ত অশান্তি, অনুপশম জ্বালা—তবু সেই জ্বালা অতিক্রম করিয়াও এ পথের সীমান্ত দেশে পাওয়া যাইতে পারে ক্ষমতার উৎসধারা। তারই সাধনা তাঁর নিত্য-দিনকার চিন্তা, পথ ও পাথেয়।

জীবনের আরও একটা দিক আছে তাঁর। সে দিকটা ভয়ের। মনে মনে তিনি অত্যন্ত ভীরু। ছেলেবেলায় যোগেশবাবু দেখিয়াছেন, লোকে যেন মাথা তুলিয়া অপরের সঙ্গে কথা বলিতে পারিত না। কি যেন একটা ভয়ে ও সঙ্কোচে মানুষ সর্ব্বদাই সশঙ্কিত হইয়া থাকিত। কিন্তু আজকাল যেন কেমন বদলাইয়া গিয়াছে, সেই মৌন-মূক মানুষ আজ মুখর হইয়া উঠিয়াছে, সেই ভীত সশঙ্কিত মানুষ আজ দুঃসাহসের পাখায় ভর করিয়া উন্নতশিরে দাঁড়াইতে শিখিয়াছে। যোগেশবাবু এই নূতন মানব-গোষ্ঠীকে বরদাস্ত করিতে পারেন না—আর পারেন না বলিয়াই ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর কাপুরুষের মত অত্যাচারী ডিক্টেটররূপে নিজেকে প্রকাশ করেন।

বাহিরে বর্ষার মাতামাতি চলিয়াছে। আকাশের দুস্তর প্রান্তরে বজ্রের আর্ত্তনাদ শোনা যাইতেছে। আলোকময় দিনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে বর্ষার অন্ধকারময় দীপ্তি। এমন দিনে যোগেশবাবুর মত মানুষের মনে জাগে, ভবিষ্যতের দুঃস্বপ্নে বিভোর হইয়া চক্রান্তের জাল বুনিতে। যোগেশবাবু উঠিয়া পড়িলেন চেয়ার হইতে।

ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে করিতে তিনি রচনা করিতে লাগিলেন চক্রান্ত জাল। চোখ দুটা তাঁর অন্তর্মুখী, মেঝের দিকে যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ, বুকের মধ্যে তাঁর হাত দুটো জড়ো করা, পদক্ষেপে অদ্ভুত এক সুর-সঙ্গতি।

ডিহিবাৎপুর ইউনিয়নের তিনি বিধাতা। সারা ইউনিয়নে চালের জন্য মানুষের হাহাকার তিনি দেখিয়াছেন, চালও ফুড-কমিটি মারফৎ তাঁর হাতে

প্রচুর আসিয়াছে। গ্রামে গ্রামে ডিলার ঠিক করিয়া দিয়া তিনি ফুড-কমিটির এক-একজন মেম্বারকে তত্ত্বাবধানের ভার দিয়াছেন। লোকে গ্রামে বসিয়া চাল খুঁজিবে। চাল তারা পাক না পাক যোগেশবাবুর কাছে আর তারা ছুটিয়া আসিবে না। এদিকে চাল যদি সব জায়গায় অল্প অল্প পাঠাইয়া বাকী সব আটকাইয়া রাখা যায় তা হইলে এবেলা-ওবেলার ব্যবধানে পাঁচ-সাত টাকা করিয়া দর উঠিতে পারে। আর সেই চড়া দরে যদি প্রত্যহ গোপনে দুইশত মণ চাল ছাড়া যায় তো এক-একদিনে দুই হাজার, তিন হাজার টাকা লাভ হইতে পারে। যুদ্ধের-জগতে বাতাসে টাকা উড়িতেছে, সে টাকাকে শুধু কোন রকম কৌশলে ফাঁদ পাতিয়া ধরিতে হইবে। আর এইভাবে ধরিতে পারিলে প্রচুর টাকা আসিবে, কল্পনাতীত টাকা, ডলারের দেশ আমেরিকার মত টাকা।

এই টাকা তাঁকে হাতে আনিতেই হইবে। এই টাকায় তাঁর মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি—টাকা তাঁর মানুষকে শাসন করিবার পথে একমাত্র উদ্যত অস্ত্র। এ অস্ত্র তিনি হাতছাড়া করিতে পারেন না। কিন্তু তাঁর নিজের এত টাকা কোথায়—যার দ্বারা তিনি আরও চাল আনাইবেন, আরও চড়াদরে বিক্রয় করিয়া আরও লাভ করিবেন এবং তাঁর প্রভাব, খ্যাতি-প্রতিপত্তি আরও বাড়াইয়া তুলিবেন?

টাকা আছে অধর কুণ্ডুর হাতে। দেশের লোক খাইতে পাইতেছে না, চাল আনা দরকার, ফুডকমিটির মান বাঁচাও বলিয়া অধর কুণ্ডুর নিকট হইতে টাকা পাওয়া যাইবেই। এবং সেই টাকা দিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কণ্ট্রোল দরে চাল আনিতে বিশেষ বেগও পাইতে হইবে না। কিন্তু এই একটা ইউনিয়নের কতই বা চাল আর তাতে লাভই বা কি হইবে। মহকুমা হাকিম, বা কালেক্টর সাহেবের কাছে দরবার করিয়া কি সমগ্র মহকুমা কিম্বা সমগ্র জেলার প্রয়োজন মত চালের সাপ্লাই দেওয়ার ভার নিতে পারেন না? জেলা না হোক্ অন্ততঃপক্ষে মহকুমার? তা যদি হয়

তো তবে একমাসেই তাঁর হাতে যে টাকা আসিবে তার পরিমাণ ভাবিয়াও স্থির করা যায় না।

ইহাই করিতে হইবে যোগেশবাবুকে। টাকার চেয়ে বড় অস্ত্র জগতে আর নাই। পায়চারী করিতে করিতে তিনি যেন দেখিতে পাইলেন, চোখের সুমুখে তাঁর পড়িয়া রহিয়াছে নব-নব সম্ভাবনার পথ। পশ্চিমপাড়া হইতে বেশি দূরে নয়, চাঁপাডাঙা পার হইয়া কয়েক মাইল মাত্র পথ—ছোট রেলে করিয়া যাওয়া যায়, বড়গাছিয়া না কি নাম জায়গাটার। বড়গাছিয়ায় মিলিটারী ছাউনি পড়িতেছে। আর ওদিকেও, তারকেশ্বর দিয়া শেওড়াফুলি হইয়া ভদ্রেশ্বর—সেখানেও অনুরূপ ভাবে মিলিটারী ছাউনি পড়িতে সুরু হইয়া গিয়াছে। জাপানীরা গত বছর বোমারু বিমান হইতে বোমাবর্ষণ করিয়া গিয়াছিল, এবছরে নাকি স্থলপথ, জলপথ ও আকাশপথে যুগপৎ আক্রমণ করিতে পারে এবং তারই সম্ভাবনায় ডিফেন্স-লাইন তৈরী করার জন্য চারিদিকে অসংখ্য মিলিটারী ছাউনি ফেলা হইতেছে। এই ছাউনিগুলির ঠিকাদারী যদি তিনি নিতে পারিতেন? সরকারী নিয়ম তিনি জানেন, এজন্য সরকারী দপ্তরে কণ্ট্রাক্টর হিসাবে নাম লিখানো দরকার।

এই এক পথ। আরও একটা পথ আছে। সেদিনই সকালে আসিয়াছিল দক্ষিণপাড়ার হরিপদ। হরিপদ গ্রামের পাঠশালার মাস্টার। মাস্টারী করিয়া সংসার চালানো তার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিতেছিল। তা ছাড়া চালের কষ্ট গ্রামে দেখা দিতেই অনেক ছেলেও পাঠশালায় আসা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এমনিতেই কোন মাসে সে পনেরো টাকার বেশি পায় না। তার উপর ছেলেরা পাঠশালায় আসা বন্ধ করিলে যে ঐ মাসে পনেরো টাকা কোথায় গিয়া ঠেকিবে তা সহজেই বুঝা যায়। সংসারে তার খাইতে বুড়ী মা, বিধবা বৌদিদি, বিধবা ভাইঝি, নিজেরা স্বামী ও স্ত্রী, দুটি পুত্র, দুটি কন্যা—এই নয়টি প্রাণী। নয়টি প্রাণীর যে পনেরো টাকায় জীবনযাত্রা নির্বাহ করা যে-কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয় তা যে-কোন মানুষই বুঝিতে

পারে। তার উপর আসিয়াছে এই চালের সঙ্কট। এ অবস্থায় তো আর কথাই নাই। এমনিই সে খাওয়াইতে পারে না বলিয়া তার বিধবা ভাইঝি মতিটার গাঁয়ে কতই না বদনাম। শুধু সে গ্রামের পাঠশালার শিক্ষক বলিয়াই লোকে প্রকাশ্যভাবে অপমান করে না—তা না হইলে মতির সম্বন্ধে কে না কানাঘুষা করে। হরিপদর বিঘা সাতেক জমি ছিল—তাও তিন বিঘা জমি বন্যার ফলে বালি পড়িয়া একেবারে আবাদের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে; জমিগুলা শুধু কবরভূমির মত আকন্দ ও চোঁচ-ঘাসে পরিপূর্ণ। চার বিঘা জমিতে মাত্র ফসল হয়। গড়ে বিঘাপ্রতি পাঁচমণ করিয়া ধানের ফলন ধরিলে বিশমণ ধান হয়। বিশমণ ধানে তের-চৌদ্দমণ চাল হয়। অর্থাৎ হরিপদদের চার মাসেরও খোরাকী নয়। গত বৎসরের চাষের চাল কবে শেষ হইয়া গিয়াছে। কিনিয়াই খাইতেছিল তারা। কিন্তু আর বুঝি দিন চলে না। তাই সকালে সে তার জমিগুলি যোগেশবাবুর কাছে বিক্রয় করিবার প্রস্তাব নিয়া আসিয়াছিল। এখন তো খাইয়া বাঁচিতে হইবে? যোগেশবাবু তাকে আশ্বাস দিয়া ফিরাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু সেই হইতে তাঁর চোখের সুমুখে এই একটি পথও ফুটিয়া উঠিয়াছে। এমনি করিয়াই লোকে আজকাল জমি বিক্রয় করিতে আসিবে। বিক্রয় করা তাদের গরজ। কাজে কাজেই জলের দরে এ সমস্ত জমি কিনিতে পারা যাইবে। একবার যদি এইভাবে তিনি এ অঞ্চলটায় কিছু জমি কিনিতে পারেন তা হইলে তাঁকে আর পায় কে?

একদিকে চালের কণ্ট্রোল, মিলিটারী-কণ্ট্রাক্টরী—আরেকদিকে এই জমি ক্রয় এইভাবে যদি তিনি কিছুটা অগ্রসর হইতে পারেন তা হইলে, তাঁর সহিত পাল্লা দিবার এমন কে এখানে থাকে, তা তিনি একবার দেখিয়া লন।

পায়চারী করিতে করিতে তিনি যেন কেমন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। তাঁর ভাবনা কি, তিনি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বার, মহকুমা আদালতে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাঁর অবাধ মেলামেশা। তিনি কোন আবেদন করিলে তা কোন রকমেই ব্যর্থ হইবে না। তবে তাঁকে সব কিছুই করিতে

হইবে বে-নামীতে। কারণ তিনি সরকারী-দপ্তরের সহিত জড়িত। কোন সরকার-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে কোন ব্যবসায় করিতে পারেন না। কাজেই যা কিছু করিতে হইবে তাঁকে তা বেনামীতেই করিতে হইবে। তা হোক্—তিনি বেনামীতেই করিবেন। আর বেনামীতে করিলে তাঁর অসুবিধাটাই বা কি—অধর কুণ্ডু তো রহিয়াছেই।

বাহিরে তখনও বৃষ্টির বিরাম নাই। একটানা অবিশ্রান্ত পড়িতেছে তো পড়িতেছেই। যোগেশবাবু একবার বাহিরের দিকে তাকাইয়া মনে মনে স্থির করিয়া নিলেন, যতশীঘ্র সম্ভব তিনি এবিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের সুপারিশ নিয়া সামরিক বিভাগে গিয়া কণ্ট্রাক্টরীটাকে পাকাপাকি করিয়া ফেলিবেন। এই সব ভাবিতে ভাবিতে তিনি উঠিয়া পড়িয়া বাড়ীর দিকে গেলেন এবং আপাদমস্তক একটা ওয়াটার প্রুফ জড়াইয়া বৃষ্টি-মুখর পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

*

অতো জলেও ভট্‌চাযের কিন্তু বিরাম নাই।

গ্রামে গ্রামে আলাদা আলাদা ভাবে চাল বিক্রয়ের কেন্দ্র হইয়াছে। ভট্‌চাযের ভার পড়িয়াছে পশ্চিমপাড়া গ্রামের দোকান তত্ত্বাবধানের। তা ছাড়া সমগ্র ইউনিয়নের মোট আমদানীর স্টকও তাঁরই হাতে। এই স্টককে যদি সরাইয়া না রাখিতে পারা যায় তবে ক্ষুধার্ত্ত জনতার ক্রমাগত চাহিদার ফলে ছাড়িয়া দিতে হইবে কিম্বা তারা হয় তো সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া নিয়া যাইবে। ভট্‌চায হুঁশিয়ার লোক তাই সে ব্যবস্থা করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। সারা প্রকৃতি জুড়িয়া সৃষ্টি-ভাসানো বৃষ্টি নামিয়াছে। পথে ঘাটে লোকজনের তেমন সতর্ক দৃষ্টি থাকিবে না—এই সময়ে বস্তাগুলি সরানো একান্ত নিরাপদ।

তাই অধর কুণ্ডুর বাড়ীর সামনে গরুর গাড়ীতে চালের বস্তা ত্রিপল ঢাকিয়া সরানো হইতেছিল। ভট্‌চায ব্যস্ত-ত্রস্তভাবে ছাতা মাথায় দিয়া

একবার অধরের বাড়ী আর একবার বাহির—এমনিভাবে ছুটাছুটি করিতে ছিলেন।

চাঁদের গাড়ী যাইবে গ্রামের প্রান্তভাগে ভট্‌চাযের পূর্ব্ব-পুরুষের তৈরী করা বাগানবাড়ীতে। পুরুষানুক্রমে এই বাগানবাড়ী। এককালে ভট্‌চাযরা ছিলেন এতদঞ্চলের জমিদার। নফর ভট্‌চাযের পিতামহ সে জমিদারী ঐ বাগানবাড়ীতে বসিয়া বসিয়া প্রায় নিঃশেষ করিয়া দিয়া যান। নফরের বাবা ত্রিপুরা ভট্‌চাযও কম যান নাই। জমিদারীর শেষ অঙ্কে তিনি সাফল্যের সহিত বিয়োগান্ত দৃশ্যগুলি অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি ঐ বাগান-বাড়ীতে পড়িয়া থাকিতেন। সুরার স্রোতাধারা ও নারীর অশ্রুধারার মধ্যে বসিয়া তিনি আত্মতৃপ্তির এক স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই স্বর্গরাজ্যে বসিয়াই তিনি স্বর্গলাভ করেন। পিতার মৃত্যুর পরে নফর ভট্‌চায্ কখনও ওমুখো হন নাই—নফরের মায়ের নিষেধ ছিল। কিন্তু মায়ের নিষেধ পুত্রকে শেষ পর্য্যন্ত অমান্য করিতে হইয়াছে। অবশ্য মনে মনে তিনি এই যুক্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন যে তিনি তো আর পিতা-পিতামহদের মত কোন উচ্ছৃঙ্খল আদর্শ নিয়া বাগানবাড়ীতে যাইতেছেন না—তিনি যাইতেছেন বরং তাঁদের জীবনের বিপরীত পথেই। তাঁরা অর্থ সম্পত্তি উড়াইয়া দিতে ওখানে গিয়াছিলেন আর তিনি যাইতেছেন সে সব গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই। কাজেই মাতৃ-আজ্ঞা পালন হইতে তাঁর পদস্খলন হইতেছে কোথায়?

আগেই পঞ্চু ও কয়েকজন লোক বাগানবাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বিস্তীর্ণ একটা জমির চারিদিকে প্রাচীর ঘেরা। ভিতরে একটা বিরাট পুকুর। পুকুরের উত্তর ও দক্ষিণে বসিবার জায়গাসহ দুটা পাকা ঘাট। বাগানে হরেক রকম গাছপালা। পুকুরটার ঠিক উত্তরেই প্রকাণ্ড হলঘরওয়ালা একটা দোতালা বাড়ী। দালানে উঠিলেই দুদিকে সিঁড়ি। সিঁড়ি বাহিয়া উপরে যাইতে হয়। ভিতরকার দেয়ালে দেয়ালে স্থাপত্য শিল্পের অনুকরণে -নগ্ন

স্ত্রীদেহের বিভিন্ন মানসিক অবস্থার বিভিন্ন রকম মূর্ত্তি খোদাই করা। মেঝেগুলা মার্ব্বেল পাথর দিয়া তৈরী।

বহুদিন বাগানবাড়ীটায় মানুষের পা পড়ে নাই। আগাছা জন্মাইয়াছে চারিদিকে। পুকুরটা অসংস্কৃত অবস্থায় থাকার দরুণ জলজ তৃণলতায় ভরিয়া উঠিয়াছে—একেবারে মাঝখানে হেলাফুলের গাছগুলা দল বাঁধিয়া উঠিয়াছে। ঘাট দুটা আগাছার শিকড়ে শিকড়ে ফাটিয়া গিয়াছে। দোতালা বাড়ীটারও সেই অবস্থা। কত বৃষ্টিধারা, বজ্রপাত, সূর্য্য চন্দ্রের খেলা, কত কাকপক্ষী, বন্যজন্তুর মাতামাতি হইয়া গিয়াছে বাড়ীটার উপর দিয়া। ঘরের জানালা-গুলার রঙ উঠিয়া গিয়াছে, বারান্দার ঝিলিমিলিগুলা খসিয়া পড়িয়াছে। ছাদে ও দেওয়ালে অশ্বত্থ ও বট গাছ প্রচণ্ড আগ্রহে নিজেদের প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। তাদের সর্ব্বগ্রাসী আলিঙ্গনে দেয়ালে দেয়ালে ফাটল ধরিয়াছে, ছাদের উপর হইতে বৃষ্টিধারা গাছের শিকড়ের সরস-সূত্র ধরিয়া ঘরের মেঝেয় ফোঁটা ফোঁটা ঝরিয়া পড়িয়া শ্বেতপাথরের মেঝের সঙ্গেও আপনার শক্তি পরীক্ষা করিয়াছে। দেওয়ালের ফাটলে ফাটলে, চামচিকা, টিকটিকি, চড়াই ও শালিক ছাতারের দল বাসা বাঁধিয়াছে।

তবু চালের ব্যাপার হাতে আসিয়া পড়িতেই ভট্চায তাড়াতাড়ি এই বাগানবাড়ীর ঘরগুলাকে শুধু যথাসম্ভব পরিষ্কার করাইয়া নিয়াছেন। সারা বাগানবাড়ী পরিষ্কার করিবার তাঁর দরকার নাই—আর করিলেও তা অবিবেচনারই কাজ হইবে। কারণ লোকে তাতে সন্দেহ করিয়া বসিবে এই ভাবিয়া যে, হঠাৎ এইভাবে বাগানবাড়ী পরিষ্কৃত হইতেছে কেন? অন্যদিকে তারা চাল পাইবে না, না পাইয়া এই বাগানবাড়ী পরিষ্কারের রহস্য বুঝিয়া ফেলিবে।

তাই ঘরগুলাই শুধু পরিষ্কার করিয়া চাল বোঝাই করা হইতেছে। পঞ্চু ও কতকগুলি লোক এখানে চালের বস্তাগুলা গুছাইয়া গুছাইয়া রাখিতেছিল আর ভট্চায অধর কুণ্ডুর বাড়ী হইতে চালগুলা পাচার করিয়া দিতেছিলেন।

এইভাবে চালান করিতে করিতে যখন শেষ গাড়ীটা বোঝাই হইল ভট্‌চায তখন নিজে ছাতা মাথায় দিয়া গাড়ীর পিছন পিছন বাগানবাড়ীতে আসিয়া হাজির হইলেন। কেমনভাবে চালগুলা রাখা হইয়াছে তাহা দেখিয়া নিয়া তিনি চারিদিক পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ চালগুলায় জল পড়িবে কিনা এবং দ্বিতীয়তঃ বাহির হইতে বস্তাগুলা দেখা যাইবে কিনা। এই সব দেখাশুনা করিয়া তিনি উপরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সুমুখে বিরাট পুকুর। পুকুরের ওপারে বাগান, তারপর এই বাগানবাড়ীর প্রাচীর। ভট্‌চায দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই বাগানবাড়ীর রূপ দেখিতে লাগিলেন। তিনি কি ভাবিলেন কে জানে। দূর আকাশ হইতে মেঘের দল ভাসিয়া আসিতেছে, কালো জমাট মেঘ। মাঝে মাঝে বেশ দেখা যায় মেঘগুলা যেন গলিয়া গলিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

পিছনে পঞ্চু আসিয়া দাঁড়াইল। ভট্‌চায বুঝিতেও পারিলেন না। সম্ভবতঃ তিনি যেন কি ভাবিতেছিলেন। পঞ্চু কহিল, সব ঠিকঠাক—এবার আমরা যেতে পারি?

ভট্‌চায চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন, কি যাবি তোরা?

হ্যাঁ, পঞ্চু জিজ্ঞাসা করার ভঙ্গীতে উত্তর দিল।

ভট্‌চায কহিলেন, সব ঠিক ক'রে রেখেছিস তো?

—হ্যাঁ।

তবে যা, বলিয়া ভট্‌চাযের যেন কি একটা কথা মনে পড়িয়া গেল এমন ভাবে বলিলেন, আর হ্যাঁ লোকগুলোর পাওনা-থোওনা ঠিকঠাক মিটিয়ে দিয়েছিস তো?

—দিয়েছি।

—কথাটা যেন কারু কাছে ওরা না ভাঙে।

সে আমি ঠিক করে বলে দিয়েছি, পঞ্চু আত্ম-গর্ব্বের আবেগে বলিয়া উঠিল।

—ব্যস তোরা যা তবে।

পঞ্চু একটা চাবীর তোড়া আগাইয়া দিয়া কহিল, তা হ'লে চাবীটা নিন্।

ভট্চায হাত বাড়াইয়া চাবীটা নিয়া বারান্দায় পায়চারী করিতে লাগিলেন। ওরা চলিয়া গেল।

আবার যেন ভট্চাযকে একটু আগের সেই চিন্তা পাইয়া বসিল। বর্ষা-বিপর্য্যস্ত বাগান বাড়ীখানার দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া তিনি যেন চিন্তা-লোকের কোন গহনরাজ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিলেন। এই বাড়ী—এই বাগানবাড়ী, দালানকোঠা, পুকুর, গাছপালা সবই একদা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাঁর পূর্ব্ব-পুরুষেরা। বংশমর্য্যাদায় আর প্রতাপে তাঁরা ছিলেন, তৎকালীন সমাজের কাছে অনেক উর্দ্ধলোকের মানুষ। লোকে তাঁদের ভয় করিত, তাঁদের শাসন মানিত—এমনকি তাঁদের সম্মান করিত। শুধু তাই নয় অনেকে তাঁদের পূজাও করিত। কাজে কাজেই এখনকার দিনে তাঁদের বংশমর্য্যাদার কথা ভাবিতেও যেন কেমন লাগে। আর এই পুরাতন স্মৃতিচিহ্ন দেখিয়া সেই বংশ-মর্য্যাদার কথাই ভট্চাযের মনে পড়ে সবচেয়ে বেশি। হঠাৎ মনটা যেন তাঁর হাহাকার করিয়া উঠিল।

পায়চারী করিতে করিতে তাঁর দৃষ্টি যেন কঠিন হইয়া উঠে। কোনদিকে তিনি দেখিতেছেন, তা কিছুই বোঝা যায় না। এই বংশের উত্তরাধিকারী তিনি। আজ তাঁর চিন্তিত হইয়া পড়িবারই কথা বটে। রাগ হয় তাঁর পূর্ব্বপুরুষদের উপরেই। তাঁদের ছিল অতো প্রভাব-প্রতিপত্তি, কিন্তু তার কাণাকড়িও এই উত্তরাধিকারীর জন্য রাখিয়া যান নাই। রাখিবার মত আজ কোন ব্যবস্থাও অবশিষ্ট নাই। জমিজায়গা, বিরাট জমিদারী সবই তাঁরা খোয়াইয়া গিয়াছেন। রাখিবার মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন এই বাগানবাড়ীটি। কিন্তু এও যেন সেই বংশের আসল চিহ্ন নয়। নফর ভট্চাযের মা যখন তাঁর ছেলেবেলায় তাঁকে এমুখো হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন—ও তোমাদের বংশের বাগানবাড়ী নয়, বংশের বাঁশগাড়ীর

চিহ্ন। আজ এই ভগ্ন, ধ্বংসোন্মুখ বাগানবাড়ীর বারান্দায় দাঁড়াইয়া জননীর সেই কথা মনে পড়ে ভট্চাযের। শুধু মনেই পড়ে না, অকারণে চক্ষু দুইটাকে জলে ভাসাইয়াও দেয়।

রক্ষা এই যে এই নির্জ্জন জঙ্গলাকীর্ণ বাগানের মধ্যে এমনিতরো ভগ্নদেউলের মত প্রাসাদের একান্তে দাঁড়াইয়া ভট্চাযের কান্না দেখিবার কেহ নাই। কে জানে, মানুষ হয়ত এমনিই। নিজের জীবনেও ভট্চাযের কুকর্ম্মের অন্ত নাই কিন্তু তিনিও কাঁদিতে জানেন এবং কথাটা শুধু কথার কথা নয়, তিনি এখনই কাঁদিতেছেন।

কিন্তু মানুষের কান্না মানুষের দুর্ব্বলতারই প্রকাশ মাত্র। ভট্চায যেন নিজেকে ফিরিয়া পাইলেন। ভিতরে তাঁর বংশ-মর্য্যাদা গজ্জিয়া উঠিল। তাঁর বংশের কোন মানুষ কখনো বোধ হয় চোখের জল ফেলেন নাই। তা যদি হইত তা হইলে জমিদারী করিয়া অজস্র অর্থ লুঠিতে তাঁরা পারিতেন না এবং সে জমিদারী নিজেদেরই চোখের সুমুখে আবার ধ্বংসও করিয়া যাইতে পারিতেন না।

জননীর কথা আবার মনে পড়ে ভট্চাযের। তিনি এই বাগানবাড়ীকে বলিয়াছেন ইহা বাঁশগাড়ীর চিহ্ন। এই বাঁশগাড়ীর দেউলিয়া অবস্থা হইতে তাঁকে উঠিয়া দাঁড়াইতেই হইবে। মনে মনে তাঁর কি যেন এক কঠোর প্রতিজ্ঞা।

সহসা তাঁর দূরে বাগানবাড়ীর প্রবেশ পথের দিকে দৃষ্টি পড়ে। দেখিলেন কে যেন একটা লোক সর্ব্বাঙ্গে ওয়াটার প্রুফ আঁটিয়া বর্ষাধারা ভেদ করিয়া এদিকেই আসিতেছেন। বর্ষার সূচীভেদ্য আস্তরণে লোকটাকে ভাল করিয়া চেনা যায় না। কিন্তু ভট্চাযের ভয়ও হয় না। নিতান্ত নির্ব্বিকার চিত্তে তিনি লোকটার আসা-পথের দিকে তাকাইয়া থাকেন।

খানিকটা লক্ষ্য করিতেই বুঝা গেল আসিতেছেন যোগেশবাবু। বন-বাদাড় ভেদ করিয়া ইতিহাসের যেন কোন সমর-নায়কের মত তিনি আগাইয়া

আসিতেছিলেন। বুঝিতে পারামাত্র ভট্‌চায সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেলেন এবং তাঁর দিকে ইসারা করিয়া হাঁকিলেন, সোজাসুজি চ'লে আসুন।

বৃষ্টির শব্দ ভেদ করিয়া ভট্‌চাযের কথা যোগেশবাবুর কানে গিয়া পৌঁছাইল। যোগেশবাবু হাত তুলিয়া ভট্‌চাযের কথায় সায় দিলেন।

কাছে আসিতেই ভট্‌চায বলিয়া উঠিলেন, তারপর হঠাৎ ?

বৃষ্টি হ'চ্ছে বটে, ওয়াটার প্রুফটা খুলিতে খুলিতে যোগেশবাবু বলিয়া উঠিলেন, হঠাৎ মাথায় একটা মতলব এল—তাই আর ঘরে থাকতে পারলাম না। বৃষ্টি মাথায় ক'রেই তোমার কাছে আসবার জন্যে বেরিয়ে পড়লাম। তারপর ভিজা ওয়াটার প্রুফটা দরজার একটা পাল্লার উপর মেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন, এতো ভয়ানক বাগানবাড়ী হে। আমি কখনো আসিনি তোমাদের এখানে—

আমারও সেই অবস্থা, বলিয়া ভট্‌চায কহিলেন, তারপর মতলবটা কি শুনি ?

বারান্দার একদিকে দাঁড়াইয়া যোগেশবাবু জামার পকেট হইতে চুরুট ও দিয়াশলাই বাহির করিয়া চুরুটটায় অগ্নিসংযোগ করিয়া একে একে সব কথা বলিতে লাগিলেন।

ভট্‌চায মুগ্ধ হইয়া সব শুনিলেন। শুনিয়া কহিলেন, তা হ'লে তো একদিন এস-ডি-ও কিম্বা ডি-এমকে নিয়ে গিয়ে গভর্ণমেণ্ট-কণ্ট্রাক্টর হিসাবে নামটা লিখিয়ে আসতে হয়—

লিখিয়ে আসতে হয় মানে, যোগেশবাবু চুরুট টানিতে টানিতে বলিলেন, লেখাতেই হবে। তা না হ'লে কণ্ট্রাক্টই পাওয়া যাবে না।

তা হ'লে তো ব্যাপারটা তাড়াতাড়িই সারতে হয়, ভট্‌চায কহিলেন, কেন না তাড়াতাড়ি না হ'লে তো আবার কণ্ট্রাক্ট ধরতে দেরী হয়ে যাবে। শেষকালে খরচ-খরচা ক'রে সবই হবে, অথচ কণ্ট্রাক্ট পাওয়া যাবে না।

যোগেশবাবু প্রশ্ন করিলেন, তা হ'লে কবে যাওয়া যায় বলদিকি ?

আগে তো এস-ডি-ও, ডি-এম এঁদের ব্যাপারগুলো সারতে হয়। ভট্‌চায কহিলেন, তা না হ'লে কি ক'রে কি করা যাবে।

এস-ডি-ওর সঙ্গে আমি আদালতে গিয়েই ঠিক ক'রে নোব'খন, যোগেশবাবু চিন্তিতভাবে কহিলেন, কিন্তু ডি-এম-এর কাছে যাই কবে। এর মধ্যে তো সদরে যাচ্ছি না—

তা না হয় না গেলেন, ভট্‌চায কহিলেন, কিন্তু একাজের জন্য তো যেতেই হবে।

হ্যাঁ যেতেই হবে, যোগেশবাবু চিন্তিত ভাবে চুরুটে টান দিতে লাগিলেন। তারপর কি ভাবিয়া তিনি বারান্দা হইতে হলঘরের ভিতরদিকে পা-পা করিয়া চলিয়া গেলেন। ভট্‌চায যেন কি মনে করিয়া তাঁর সহিত আর গেলেন না। যোগেশবাবু একাই চারিদিক ঘুরিয়া আসিয়া কহিলেন, আচ্ছা ভট্‌চায এক কাজ করলে হয় না?

—কি?

—তোমার এ বাগানবাড়ীটা তো বেশ জুৎ-সইয়ের।

—তা জুৎ-সইয়ের বটে তবে বড় ঝোপ-জঙ্গল হয়েছে চারিদিকে।

—আচ্ছা খুব শিগ্‌গিরই এসব পরিষ্কার করা যায় না?

—তার আর কি, ক'রলেই কয়া যায়।

যোগেশবাবু যেন হাতের কাছে চাঁদ পাইলেন, এমনভাবে বলিয়া উঠিলেন, তাহ'লে তাড়াতাড়ি তাই করো দিকি ভট্‌চায। আমি মনে করছি ইতি মধ্যেই আদর্শগ্রামের আবাদ উপলক্ষ্যে একদিন এস-ডি-ও আর ডি-এম এবং কণ্ট্রাক্ট দেয়া-নেয়া যাঁর ওপর ভার সেই অফিসারকে ইন্‌ভাইট ক'রব—ইনভাইট ক'রে এই বাগানবাড়ীতে একটা ভোজ দোব। ব্যাস্ সেই উপলক্ষ্যে এক ঢিলে সব পাখী মারা যাবে—

তা ক'রতে পারলে মন্দ হয় না, ভট্‌চায বলিলেন।

যোগেশবাবু বলিলেন, সেজন্যে শুধু তোমাকে এই বাগানবাড়ীটা একটু

সাফ করাতে হয়। কেননা এরকম জায়গায় তো আর তাঁদের আনা যায় না।

বেশ আমি কালই ক্লষেণ লাগিয়ে দিচ্ছি, ভট্‌চায বেশ উৎসাহিত হইয়াই বলিলেন।

যোগেশবাবু আকাশের দিকে তাকাইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। বৃষ্টির বুঝি শেষ নাই। আকাশ যেন, তোলপাড় করিতেছে।

ভট্‌চায বুঝিলেন যোগেশবাবু মনে নেশা ধরিয়াছে—অর্থের নেশা, সম্পত্তির নেশা। তা' এ নেশা মানুষের ভাল। মানুষের সামনে উচ্চাসন লাভ করিতে গেলে, এই নেশাই মানুষের দরকার। তা ছাড়া ভট্‌চাযের আরও একটা কথা মনে পড়িল, জননীর ভাষায় বাঁশগাড়ীর চিহ্ন এই বাগানবাড়ী—ইহার মত এই দেউলিয়া অবস্থা তাঁরও। যদি তাঁকে এ অবস্থা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইতে হয় তবে তাঁরও টাকার প্রয়োজন। কিন্তু সে টাকা উপায় করিবার মত ইচ্ছা থাকিলেও কৌশল জানা নাই ভট্‌চাযের। তাই তিনি এবিষয়ে যোগেশবাবুকেই আঁকড়াইয়া থাকিতে চান। যোগেশবাবুর এই প্রস্তাবে ভট্‌চায বেশ খুশিই হইলেন।

ভট্‌চায যোগেশবাবুর মন্ত্রীবিশেষ। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া যোগেশবাবু কোন কিছু কাজে হাত দেন না। আজও তাই তিনি তাঁর মতলবের কথাটা সবই ভট্‌চাযকে বলিলেন। কিন্তু ভট্‌চাযের বুদ্ধিসুদ্ধি কম নয়। যদি ভট্‌চায তাঁর সহিত তেমন সুকৌশলে ব্যবহার করে তবে যোগেশবাবু কখনই তাঁর সঙ্গে পারিয়া উঠিবেন না। কিন্তু এ আশঙ্কা তাঁর অমূলক। কই, ভট্‌চায তো তাঁর সঙ্গে কখনও এরূপ ব্যবহার করে নাই। না, না কখনই করে নাই।

যোগেশবাবু আশ্বস্ত হইয়া চুরুটে টান দিতে লাগিলেন।

এমন সময় হঠাৎ পঞ্চুকে বনবাদাড় ভাঙিয়া আসিতে দেখা গেল। ভট্‌চায কহিলেন, হঠাৎ আবার পঞ্চাটা আসছে কেন—ব্যাপার কি?

দ্যাখো আবার কি খবর নিয়ে আসে, বলিয়া যোগেশবাবু পায়চারী করিতে লাগিলেন। ভট্‌চাযও যেন কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

পঞ্চু আসিতে না আসিতেই ভট্‌চায নিতান্ত উদ্বিগ্নভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার রে? হঠাৎ ছুটে এলি যে?

ব্যাপার তেমন কিছু নয়, পঞ্চু হাসিতে হাসিতে কহিল, আপনাদের এখুনি একবার আসতে হবে।

কেন বলদিকি, ভট্‌চায জিজ্ঞাসা করিলেন।

পঞ্চু কহিল, সার্কেল অফিসার এসেছেন। কুণ্ডু মশায়ের বাড়ীতে অপেক্ষা করছেন। আপনাদের যেতে বল্‌লেন!

এত জলে সার্কেল্ অফিসার, যোগেশবাবু সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন।

ভট্‌চায কহিলেন, কে জানে কি মনে ক'রে এসেছেন।

মতলব কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে, পঞ্চু কহিল, তবে তিনি বল্‌লেন—এসেছিলেন এদিকেই তাই একবার ঘুরে যাচ্ছেন আর কি।

যোগেশবাবু ও ভট্‌চায মুখ চাওয়াচারি করিলেন।

তাহ'লে আপনারা আসুন, পঞ্চু কহিল, আমি এগোই।

আচ্ছা আমরা যাচ্ছি, বলিয়া ভট্‌চায যোগেশবাবুর দিকে তাকাইলেন। যোগেশবাবু দরজার পাল্লা হইতে ওয়াটার প্রুফটা নিয়া গায়ে জড়াইতে জড়াইতে বলিলেন, লোকটা কেন এসেছে তা তো আর বুঝ্‌তে না পারার কথা নয়। তবে আমরাও যদি তেমন ভাবে চালটা বরাবর পাই তো কিছু দিতে আমাদেরও আপত্তি নেই। কি বল ভট্‌চায?

হেঁ-হেঁ, ভট্‌চায হাসিলেন।

অতঃপর চারিদিকে তালাচাবী লাগাইয়া তাঁরা দু'জনে অধর কুণ্ডুর বাড়ীর উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলেন।

বৃষ্টিধারা তখনও সমানেই ঝরিতেছিল।

আজ কয়েকদিন হইল, কুসুমের বাড়ীতে সেদিন রাত্রিটা অতিবাহিত করিয়া বিজয় সোজাসুজি শ্রীরামপুর শহরে চলিয়া আসিয়াছিল। এখানে আসিয়া এই কয়েকদিনেই যেন সে এক পরম বিস্ময়কর জগতে পড়িয়া গিয়াছে। এই শহরে সে আগেও আসিয়াছে, কিন্তু এমনটি যেন আর কখনো দেখে নাই।

আশ্চর্য্য এই শহরের জীবনযাত্রা। এখানে আসিয়া যেন বিজয়ের চোখ খুলিয়া গিয়াছে। যেন সে নূতনতরো এক জগতের সন্ধান পাইয়াছে—যে জগত গ্রামে থাকিতে তার কাছে অজ্ঞাতই ছিল। এখানকার মানুষ বিশেষ করিয়া হরিহরদের মত শ্রমজীবী মানুষ, ইহারা যেন এক অদ্ভুত কর্ম্মব্যস্ততার ভিতর দিয়া কোন এক নব-জীবনের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। চারিদিকে ইহারা দলবদ্ধ। সব সময়েই ইহারা চলিয়াছে দল বাঁধিয়া। কারখানায় যায় দল বাঁধিয়া, কারখানা হইতে বাহিরে আসে দল বাঁধিয়া—দল বাঁধিয়াই আবার নিশান কাঁধে করিয়া ইহারা নিজেদের দুঃখ দুর্দ্দশার প্রতিকার করিতে আগাইয়া যায় বিপুল উদ্যমে। এই দলবদ্ধ জীবনধারার মধ্যে কেমন যেন একটা উন্মাদনা অনুভব করে বিজয়।

সে গ্রামের মানুষ। গ্রামে কৃষকরা পাশাপাশি, ঠাসাঠাসি বাস করে বটে, কিন্তু তারা পরস্পরেব কাছে কোন দিনই কাছাকাছি নয়। সর্ব্বদাই যেন কেমন বিক্ষিপ্ত, পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন। গ্রামে দুঃখ আছে, কষ্ট আছে—আছে শত শত অবিচার ও অত্যাচার। গ্রামে সীতার উপর অত্যাচার করিয়া তাকে মৃত্যুর হিম-অন্ধকার পথে ঠেলিয়া দিয়া মাটির নীচে পুঁতিয়া ফেলা হয়, কুসুমের ঘর পুড়াইয়া দেওয়া হয়, তার নামে অপবাদ দিয়া দাঙ্গা মারামারির খবর চাপিয়া যাওয়া হয়; বারি-লেশহীন ধূধূ করা শুষ্ক মাঠে

ফসল হয় না, তবুও খাজনা গণিতে হয়, ইউনিয়ন বোর্ডের কোনই সুবিধা কৃষকরা পায় না তবু ট্যাক্স দিতেও হয়। দরিদ্র জনসাধারণের একমাত্র খাদ্য চাল, তাও কাড়িয়া নিবার উদ্দেশ্যে নিজেদের মনোমত করিয়া ফুড-কমিটি তৈরী করা হয়। কিন্তু গ্রামের লোক কিছুই করিতে পারে না।

সেদিন শহরের সমস্ত সম্প্রদায়ের, সমস্ত শ্রেণীর একটা সম্মিলিত জনসভা ছিল স্টেশনের সম্মুখস্থ মাঠে। এই প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষে কি করা যায়, তাই ছিল সভার আলোচ্য বিষয়। সভার শেষে বিজয় ও ঘনশ্যাম হরিহরের বাসা বাড়ীতে ফিরিতেছিল।

ফিরিবার পথে দুইজনে বহু কথা হইল, সভাস্থ বক্তাদের সমালোচনাও কিছুটা হইল। সেদিন সবচেয়ে ভাল হইয়াছিল মণিবাবুর বক্তৃতা। সেই মণিবাবু রোগা ছিপ্‌ছিপে লোকটা। তিনি বলিয়াছিলেন—"দেশে যখন এমনিতরো হাহাকার তখনও যারা চাল লুকিয়ে মানুষ মারছে আর পয়সা করছে তাদের সম্বন্ধে নির্ম্মম হয়ে উঠতে হবে। চোরাকারবারীদের টুঁটি টিপে আমাদের জনসাধারণকে বাঁচাতে হবে। যেসব আমলারা ঘুষ নিয়ে চোরা-কারবারীদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে, তাদের কঠোর শাস্তিবিধানের জন্যে আন্দোলন ক'রতে হবে। এসব যেমন একদিককার কাজ তেমনি আর একদিককার কাজ সর্ব্বদলীয় কামিটির হাতে সরকারের চাল বিলির ভার দিতে হবে। তা না হ'লে তা চোরাকারবারীদের খপ্পরে গিয়ে পড়বে।" কথাগুলো যেন পথ চলিতে চলিতেও কানে বাজিতেছিল।

এই মণিকে সে সর্ব্বপ্রথম দেখে যেদিন দেশ হইতে সে হাসপাতালে হরিহরের কাছে আসিয়া উঠিয়াছিল।

মনে পড়ে সেই দিনটা।···

···সেদিন হরিহরদের সম্বন্ধে তার যে ভুল ধারণা ছিল তাও ভাঙিয়া যায়। তারা স্ট্রাইকে যোগ দেয় নাই বলিয়া একদা সে তাদের উপর রাগ করিয়াছিল কিন্তু ঐদিন সে তার রাগের জন্য নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়ে।

সকালেই সে হাসপাতালে আসিয়া পৌছায়। একেবারে হরিহরের ঘরে গিয়া সে দেখে হরিহর আধশোয়া ও আধবসা অবস্থায় বালিশে হেলান দিয়া বসিয়া আছে আর তারই পাশে বসিয়া আছে একটি মেয়ে। বিজয়কে দেখিতে পাইয়াই হরিহর উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, আয় আয় বিজয় আয়। বিজয় হরিহরের অভ্যর্থনায় এবং তার পাশে মেয়েটি বসিয়া আছে দেখিয়া কেমন যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, তুই কেমন আছিস হরিহর ?

ভাল হয়ে গেছি তো, হরিহর কহিল, এখন হাঁসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেই হয়।

বিজয় মেঝেয় পোঁটলাটা নামাইয়া রাখিয়া কহিল, কি ভয়ই পেয়েছিলুম তা কি বল্‌ব। যাক তবু তোকে দেখে যেন বাঁচলুম।

না আর কোন ভয় নেই, হরিহর তার পাশে বিজয়কে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া সেই মেয়েটির দিকে তাকাইল। তারপর কহিল, কাল আপনাদের এরই কথা বলেছিলুম। ইউনিয়ন বোর্ডের উদ্যোগে পতিত জমিতে অধিক খাদ্যশস্য ফলাতে গিয়ে মাটির ভেতর এরই বোনের কঙ্কাল উঠেছিল।

বিস্মিতভাবে মেয়েটি বলিয়া উঠিল, তাই নাকি !

—হ্যাঁ।

এসব কথাও ইহারা আলোচনা করিয়াছে। বিজয় ভাবিয়া বিস্মিত হইল। ঘনশ্যাম জ্যাঠা আগেই আসিয়াছে, কথাটা সেই বলিয়াছে ইহাদের। মেয়েটি বলিল, কঙ্কালটা যদি আপনি রেখে দিতেন—না পুঁড়িয়ে, তাহ'লে লোককে আমরা দেখাতাম অত্যাচার কাকে বলে।

মেয়েটির কথায় বিজয়ের যেন কি মনে হইল। তার সারাদেহ ও মন একই সঙ্গে যেন হাহাকার করিয়া উঠিল। কই একথাটা তো সে ভাবিয়া দেখে নাই! দেশাচার ও লোকাচার রক্ষা করিতেই সে উদ্‌গ্রীব হইয়া

উঠিয়াছিল এবং সেজন্য সে শ্রীপতির বিধানানুযায়ী কঙ্কালটা দাহ করিয়াই দিয়াছে।

এইসব আলাপ-আলোচনায় অনতিকালের মধ্যেই বিজয় যেন মেয়েটির সহিত আত্মীয়তা অনুভব করিল। অদ্ভুত মেয়েটি। বিজয়ের চোখে যেন সে এক মূর্তিমতী বিস্ময়। ছিপ্‌ছিপে লম্বা গড়ন মেয়েটির। সারা শরীরে বিস্ময়কর সামঞ্জস্য। মাথায় এলোখোঁপা, দু-এক গুচ্ছ অবিন্যস্ত চুল অপ্রশস্ত ললাটের উপর বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। চোখ দুটায় সন্ন্যাসিনীর উদাস-গৈরিক ছায়া, তার উপর বাঁকা চাঁদের মত সপ্রতিভ যুগল ভ্রূ, দিব্যি আঁটসাট দেহ। সরু দু-খানি হাতে সরু দু-গাছি চুড়ি, কানে ছুটি স্বর্ণদুল। বয়স কত হইবে কে জানে। তবে বয়স যে খুব বেশি নয় সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। মেয়েটির কোথাও এতটুকু চটুলতা নাই, ব্যক্তিত্বের মাধুর্য্যময় ঝঙ্কার দিয়া যেন তার চারিদিকটা গণ্ডীবদ্ধ। বিজয় মাথার দিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিল—কই সিঁদুর নাই তো? তবে কি অবিবাহিতা?

সে যখন মেয়েটির সম্বন্ধে এই সব কথা ভাবিতেছিল ঠিক সেই সময়ে হাসপাতালের একেবারে সেই ঘরে ক্ষিপ্রপদে খবরের কাগজ হাতে প্রবেশ করিল একটি যুবক। রোগা লিক্‌লিকে চেহারা, তবে অনেকখানি লম্বা। চোখে চশমা। যুবকটি আসিয়াই বলিয়া উঠিল, আরে লীলা তুই এখানে? আজকের কাগজ পড়িছিস্?

বিজয় বুঝিল, মেয়েটির নাম লীলা। লীলা কহিল, কেন?

আসামের মাটিতে যুদ্ধের ছায়া পড়েছে, যুবকটি কহিল, এদিকে—

হরিহর কথার মাঝেই বলিয়া উঠিল, সে তো জানা কথা মণিদা!

হ্যাঁ জানা কথা, আগন্তুক মণি যেন কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

লীলা কহিল, দেখি কাগজখানা।

মণি কাগজখানা লীলার দিকে আগাইয়া দিল। লীলা কাগজখানা হাতে

বাড়াইয়া নিয়া প্রথম পাতাটায় ব্যানার-হেডিং-এ চোখ বুলাইতে লাগিল। হরিহরও হুমড়ি খাইয়া দেখিতে লাগিল।

'—আসামের প্রান্তরে আকাশ ও স্থলপথে জাপ-আক্রমণ—'

মণি চঞ্চলভাবে পায়চারী করিতে করিতে বলিতে লাগিল, গত বছরে এমনি দুর্দ্দিন এসেছিল আমাদের জীবনে। ওদিকে স্টালিনগ্রাডের পথে ককেসাস ডিঙিয়ে ইরাক-ইরাণ, আফগানিস্থানের মধ্যে দিয়ে নাৎসী সৈন্যরা চায় এদেশে আসতে, আর এদিকে আসতে চায় রেঙ্গুন ও আরাকানের পথে জাপ-ফ্যাসিস্টরা—এই দুই ফ্যাসিস্ট শক্তির প্রচণ্ড সাঁড়াশীর চাপে ভারতবর্ষ রুদ্ধকণ্ঠ অবস্থায় নিঃশ্বাস ফেলতে পারত না। কিন্তু স্টালিনগ্রাডে বীর লালফৌজ নিজেদের রক্ত ঢেলে আমাদের তা থেকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু আজ যখন জাপ-ফ্যাসিস্টরা আসামের মাটি ছুঁতে চলেছে তখন আমাদের হয়ে কে লড়বে বল্‌তে পারো?

ঘরে যেন কেমন একটা নিঃস্তব্ধতার স্রোত বহিয়া গেল।

মণি আবার বলিতে লাগিল, তেমন যদি আক্রমণ হয় তবে বৃটিশ ফৌজ তো পিছু হটে আসবে; আর তা হলেই আমাদের মাতৃভূমির উপর দিয়ে জাপ-ফ্যাসিস্টরা দুর্দ্দমনীয় বিক্রমে সবকিছু দলে পিষে চুরমার ক'রে দিয়ে এগিয়ে যাবে। হয়ত তাতে বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদ শেষ হবে কিন্তু আর এক সাম্রাজ্যবাদ তার উগ্র মূর্ত্তি নিয়ে আমাদের ঘাড়ে চেপে বসবে। আমাদের এতদিনকার স্বাধীনতা আন্দোলন, আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন সব কিছু তার লোহার বুটের নীচে গুঁড়িয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে।

লীলা এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই। সে কহিল, সেতো হবেই। কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছু ক'রতে হ'লে সে তো আমাদেরই ক'রতে হবে।

মণি ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, সেইটেই তো আসল কথা। কিন্তু ভেবে দেখেছিস আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি? আমাদের দেশের নেতারা সব

জেলে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁদের বন্দী করে রেখেছে মিথ্যে বদনাম দিয়ে। তারা বলতে চায়, কংগ্রেস ফ্যাসিস্টদের পক্ষে। ঠিক এই অবস্থায় দেশে আবার প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ সুরু হয়েছে। মাঠে ফসল নেই, কারখানাগুলোতে প্রয়োজন মত উৎপাদন হয় না, জাপানের পঞ্চম-বাহিনীরা এই অবস্থার পুরোমাত্রায় সুযোগ নিচ্ছে। তারা বল্‌ছে, নেতারা জেলে থাক, স্বাধীন ভারতে তাঁদের কারামুক্ত করা হবে। অর্থাৎ তার মধ্যে জাপানীরা এদেশের গদিতে বসে পড়ুক।

ঘরে যেন আরও নিস্তব্ধতা ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

মণি তেমনি ভাবেই বলিতে লাগিল, গ্রামে গ্রামে তারা বলে বেড়াচ্ছে, 'কি হবে ফসল ফলিয়ে—ওসব বৃটিশ সরকার তার সৈন্যদের জন্যে নিয়ে যাবে।' কারখানায় কারখানায় দালালরা শ্রমিকদের বলে বেড়াচ্ছে, 'এই তো তোমাদের তাল—লাগাও স্ট্রাইক।' এর মানে দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হোক, মানুষ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যেন ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারে। দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ঠিক এই একই কথা তারা বল্‌ছে, 'লাগাও লুঠতরাজ', কিম্বা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে বলো, 'হয় সে খেতে দিক না হয় বুলেট দিক।' অথচ দুর্ভিক্ষের মুখে লুঠতরাজে মানুষ বাঁচবে না বরং দমন-নীতিই বেড়ে চলবে। আর বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছে খাবারের বদলে বুলেট চাইতে হবে না—খাবার না দেওয়াটাই বুলেটের চেয়ে ঢের বড় দেয়া। এমনিই কলকাতার রাস্তায় কাতারে কাতারে মৃত্যু সুরু হয়েছে। এর ফলে দেশ যাচ্ছে হতাশায় ডুবে।

লীলা যেন কেমন দৃঢ় হইয়া উঠিল। তার চোখের সেই উদাস-গৈরিক ছায়া কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল। চক্ষু দুইটি হঠাৎ যেন প্রদীপ্ত বহ্নিশিখার মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কহিল, এসব আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে দাদা।

কিন্তু সে খুব সহজ কথা নয় লীলা, মণি বলিতে লাগিল, আমাদের পাহাড়

ঠেলে নড়াতে হবে। সেজন্যে আমি ছুটে এলুম তোদের সবাইকে একজায়গায় করবার উদ্দেশ্যে। আজকেই আমাদের আলোচনা সভা বসিয়ে, বিশেষ ক'রে এই অবস্থায় আমাদের কি করা কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে কাজ ক'রতে লেগে যেতে হবে। এখন একটা মিনিট সময় এক-একটা বছর, এক-একটা যুগ। তোকে এখুনি বেরুতে হবে লীলা। দেরী করা চলবে না।

কথাগুলা শোনা মাত্রই লীলা উঠিয়া পড়িল। বিজয়ের সুমুখ হইতে একটা কৃষ্ণ-যবনিকা সরিয়া গেল সেদিন। উহাদের সব কথা সে বুঝিতে পারিল না বটে কিন্তু এটুকু বুঝিল যে দেশের মাথার উপর এক ভয়ানক দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে এবং এই দুর্দ্দিনে বিশৃঙ্খলা ঘটাইলে নিজেদের রুখিয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা হ্রাস পাইবে।

যাইবার সময় মণি বলিয়া গেল, দেশের নেতাদের মুক্তির জন্যে আমাদের প্রচণ্ড আন্দোলন করতে হবে, কেননা জাতির এই বিপদ থেকে তাঁরাই শুধু আজ পারেন জাতিকে বাঁচাতে। তাই নেতাদের মুক্তি আন্দোলনকে তীব্র ক'রে তোলবার জন্যে মুসলিম লীগের ভায়েদের ডাক দিয়ে বল্‌তে হবে, 'ভাইসব আপনারা যদি আপনাদের দাবী আদায় করতে চান বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে তবে কংগ্রেস নেতাদের আজ বাইরে আনবার চেষ্টা করি আসুন।' তাঁরা বাইরে এলে কংগ্রেস ও লীগের মিলনের মধ্যে দিয়ে অর্থাৎ ভারতবর্ষের চল্লিশ কোটি নর-নারীর জমাট ঐক্য দিয়ে, অনিচ্ছুক বৃটিশ সরকারের হাত থেকে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট ছিনিয়ে নেয়া সম্ভব হবে আর তা হ'লেই আজ জাপ-ফ্যাসিস্টদের বর্ব্বর-আক্রমণ থেকে ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিকে রক্ষা করাও যাবে।

হরিহর মণিকে বিদায় দিবার সময় বলিল, কি বল্‌ব জানেন—আমি এ সময়টায় পড়ে রইলুম!

তার জন্যে ভাবনা নেই, মণি যাইতে যাইতে বলিল, তোমাকে শিগ্‌গিরই যেতে হবে বাইরে। হাসপাতালে এভাবে পড়ে থাক্‌লে তো চলবে না।

সেদিন উহারা চলিয়া গেলে বিজয় ও হরিহর দুইজনে মিলিয়া কিছুক্ষণ গল্প করিল। মণি ও লীলা—দুই ভাই ও বোন। ভাইবোনে মিলিয়া দেশের কাজে নামিয়াছে। ভাইটিও যেমনি, বোনটিও তেমনি। সারা শহরে চারিটা কেন্দ্রে স্থানীয় দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের জন্য চারিটা অন্নসত্র খোলা হইয়াছে। অন্নসত্র অবশ্য হরিহরদের দলের সবাই মিলিয়াই গড়িয়া তুলিয়াছে। কিন্তু সমস্ত অন্নসত্রগুলায় রান্নাবান্নার ব্যাপারটা সংগঠন করিয়াছে লীলা একাই। লীলার এইসব কৃতিত্বের কথা শুনিয়া বিজয় সেদিন মুগ্ধ হইয়া গেল।

বেশ মনে পড়ে সেদিন ঘনশ্যাম জ্যাঠার সঙ্গে হাসপাতাল হইতে হরিহরদের বাসায় ফিরিবার পথে বিজয় তাকে বলিয়াছিল, 'জানো জ্যাঠা কেন যে হরিহররা স্ট্রাইক ক'রতে চায়নি তা আমি সেদিন বুঝ্‌তে পারিনি—আজ পারলুম।'…

আজ এই সন্ধ্যাকালে পথ চলিতে চলিতে বিজয়ের সেদিনকার কথাটা মনে পড়িয়া গেল। অসংখ্য তারায় ভরা আকাশ, শহরের পথে পথে ঠুলি দেয়া ইলেট্রিকের আলো, অন্ধকারের মধ্যে টিম্‌-টিমে জোনাকির মত জ্বলিতেছে। মণির বক্তৃতা শুনিয়া বিজয়ের মনটা আশার দোলায় যেন দুলিয়া উঠিয়াছিল।

•

খানিক পরে ঘনশ্যাম ও বিজয় হরিহরের বাসায় আসিয়া পৌঁছাইল।

ঘিঞ্জি এক বস্তির মধ্যে হরিহরদের বাড়ী। ছেঁচা বাঁশের উপর কাদা ধরানো, মাথায় টালির ছাউনি দেয়া খানদুয়েক ঘর। ঘরের জানালা দরজা ছাড়া বাড়ীটার আর কোন আব্রু নাই। একটা ঘরে হাঁড়িকুঁড়ি ভাঁড়ার ইত্যাদি থাকে, আর একটা ঘর শুইবার, রান্নাবান্না হয় দাওয়ায়। বাড়ীর উঠান দিয়া পথ। সমস্ত পাড়াটার লোক এখান দিয়া যাতায়াত করে। বর্ষার জলে উঠানটা একেবারে কাদায় বজ্‌কাইয়া উঠিয়াছে, চলিবার সুবিধার জন্য সারি সারি ইট পাতিয়া লওয়া হইয়াছে।

হরিহরের সংসার স্ত্রী, একটি ছেলে ও একটি মেয়েকে নিয়া। ছেলেটির বয়স দশ, মেয়েটির আট। বউটি অত্যন্ত চটপটে। গ্রামের মেয়েদের মত অযথা লজ্জা ও সঙ্কোচ তার নাই। সহজভাবেই শ্বশুরের সঙ্গে কথা বলে, বিজয়ের সঙ্গেও খুব কথা কয়। ছেলে আর মেয়ে দুটিও চমৎকার। তারা ইতিমধ্যেই বাপের মতই শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামাত্মক ধ্বনিগুলি শিখিয়া ফেলিয়াছে।

ঘনশ্যাম ও বিজয় বাসায় ফিরিতেই ছেলেটি দৌড়াইয়া আসিয়া বলিয়া উঠিল, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ।' ঘনশ্যাম তাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ।'

বিজয় পিছন হইতে হাসিল। সম্মুখে কেরোসিনের ডিবাহাতে আগাইয়া আসিল হরিহরের বউ। সে হাসিতে হাসিতে কহিল, ছেলেরাও সব তৈরী হয়ে গেছে।

ঘনশ্যাম কহিল, এ কালের হাওয়া মা।

মেয়েটা দাওয়ায় বসিয়া ছিল। সে কহিল, ঠাকুরদাদা আজকে দাদা তামাক সাজেনি—আমি সেজে রেখেছি।

দুর পোড়ারমুখি, হরিহরের বউ উঠান হইতে বলিয়া উঠিল। ঘনশ্যাম কহিল, বেশ ক'রেছ দিদি। হুঁকোটা বাগিয়ে এনে দাও দিকি এবার।

ছেলেটি দাওয়ার দিকে ছুট্‌ দিয়া কহিল, আমি হুঁকো দোব ঠাকুরদা।

মেয়েটিও দাওয়ার একদিকে দৌড়াইল। বলিল, না আমি দোব।

তুই তো সেজিচিস, ছেলেটি কহিল।

মেয়েটি কহিল, তেমনি তুই কিছু করিস্‌ নি!

পিছন হইতে তাদের মা বলিয়া উঠিল, এই ঝগড়া করিস নি!

ইতিমধ্যেই বিজয়ের সঙ্গে ছেলে ও মেয়েটির বেশ জমিয়াছে। প্রতিদিন উহারা বিজয়ের নিকট হইতে গল্প শোনে। ইহাতে শিশুদুটা একান্তভাবে তার ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিজয় জানে আরেকটু পরেই উহাদের

ঠাকুরদাকে তামাক দেওয়ার ঝগড়া মিটিয়া যাইবে। তারপর চট বিছাইয়া নামমাত্র একবার বই নিয়া বসিবে। অন্যথায় মা ছাড়িবে না। তারপর কিছুটা পড়ার পরই উস্‌খুস্‌ করিতে সুরু করিবে এবং ভাই ও বোনে মুখ চাওয়া-চায়ি করিতে করিতে বলিয়া ফেলিবে, বিজয়কাকা একটা গল্প বলো না?

রান্না করিতে করিতে উহাদের মা হাসিয়া উঠিবে, ঘনশ্যাম হাসিবে—আর সেই হাসির মধ্যে বিজয় শুধু চোখ মেলিয়া তাকাইয়া নিবে ছেলে ও মেয়েটার দিকে। উহাদের দিকে তাকাইয়া তার কি মনে হয় তা সেই জানে।

হরিহরের বউ ঘনশ্যাম ও বিজয়কে হাত-পা ধুইবার জল দিল। হাত-পা ধুইয়া বুড়া তামাক খাইবে। নাতি ও নাতনী, কে হুঁকা দিবে, না দিবে তার ঝগড়া থামাইয়া একজন হুঁকা আর একজন কলিকা নিয়া আসিল। বুড়া তামাকে অগ্নিসংযোগ করিয়া টানিতে লাগিল।

হরিহরের বউ ছেলে ও মেয়ের উদ্দেশ্যে কহিল, এই বই নিয়ে ব'স—আর নয়।

এখানে আসিয়া বাঁধাধরা নিয়ম হইয়া গিয়াছে যেন। ঘনশ্যাম খানিকটা তামাক টানিয়া হুঁকাটা দেওয়ালে ঠেসাইয়া রাখিয়া বাহিরে যেন কোথায় যাইবে। তারপর বিজয় সে হুঁকা নিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া টানিবে। ঘনশ্যাম আবার গলা-খাঁকরি দিতে দিতে বাড়ীতে আসিবে আর বিজয়ও হুঁকা নামাইয়া রাখিয়া দিবে।

যথারীতি এসব পর্ব্ব মিটিতেই হরিহরের বউ বিজয়কে জিজ্ঞাসা করিল, কি গো ঠাকুরপো মিটিং কেমন হ'ল?

বিজয় কেমন যেন একপ্রকার উত্তেজনার বশেই বলিয়া উঠিল, ওঃ আজ যা মিটিং হয়েছে! আর মণিবাবু যা' লেকচার দিলে!

—খুব জোরালো?

—জোরালো ব'লে জোরালো। আমি এমন লেকচার কখনো শুনিনি। বাপ্‌রে সে যেমনি আওয়াজের তোড়, তেমনি তোড় কথার। আর লোক-গুলোও বৌ-ঠাকরুণ শুন্‌ছিল একেবারে অবাক হয়ে!

—লাউটিস্‌ পিকার বসিয়েছিল নাকি?

—হ্যাঁ। লাউড স্পীকার না থাকলে অতো লোক শুন্‌তে পাবে কেন?

—লোক হয়েছিল কত?

—হাজার দশেক তো বটেই।

—মণিবাবু আর কে কে লেকচার দিলে?

—আর যারা দিলে তাদের সবাইকে চিনি না। মেয়েদের পক্ষে থেকে বল্‌লে মণিবাবুর বোন লীলা। তা কারো লেকচার শোনার মত নয়। মণিবাবু যা বল্‌লে!

হরিহরের বউ উহাদের সবাইকেই চিনে। মণির বক্তৃতাও সে শুনিয়াছে দুই একবার। যে সব সভায় মেয়েদের যাইবার ব্যবস্থা থাকে, সেসব সভায় কখনও কখনও স্বামীর সহিত সে গিয়াছে, মণিবাবুর বক্তৃতা যে খুব জোরালো তা সে ঐসব সভাতেই শুনিয়াছে। তা ছাড়া অনেকবার মণিবাবু তাদের এই বাড়ীতে আসিয়াছে। তাঁর কথাবার্ত্তার ধরনও বেশ জোরালো। তাই সে কহিল, মণিবাবু লেকচার একটু জোরই দেয়।

—আরে বাবা সে জোর বলে জোর। হাততালিতে ফেটে পড়তে লাগল সারা মাঠটা।

—সভার লোকের মতামত কি হ'ল?

—চাল যাতে শহরের কমিটির হাতে আসে সে জন্যে ম্যাজিষ্ট্রেট, সাপ্লাই-অফিসার আর মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে একটা কমিটি তৈরী করা হ'ল।

—হোক্‌ বাপু, হোক যা হোক্‌ কিছু। লোকে লাইন দিয়ে দিয়ে চালের জন্যে হয়রাণ হয়ে যাচ্ছে।

—এবার যা হোক্ কিছু হবেই।

ঘনশ্যাম দাওয়ায় চুপ করিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া বসিয়াছিল। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, হতেই হবে।

ঘনশ্যামের কথাটা কেমন যেন দাগ কাটে মনে। ঐ একটিমাত্র কথাতেই বিজয়ের সমস্ত চিন্তাটা যেন তার জন্মভূমিকে কেন্দ্র করিয়া পাক খাইয়া গেল। পশ্চিমপাড়ায়ও সে দেখিয়া আসিয়াছে লোকে চালের জন্য লাইন দিতেছে। কে জানে সেখানকার অবস্থা কি হইয়াছে এতদিনে! একে একে তার মনে পড়িয়া গেল মায়ের কথা, বনমালার কথা আর কুসুমের কথা। শশীখুড়োর কথাটাও একবার মনের মাঝে উঁকি মারিয়া গেল। এসব কথা মনে পড়িতেই মনটা কেমন যেন তার ভারী হইয়া গেল।

হরিহরের ছেলে ও মেয়ে ততক্ষণে পড়া শেষ করিয়া গল্পের অপেক্ষায় মুখ চাওয়া-চায়ি করিতেছিল। মিটিংয়ের গল্প থামিতেই তারা সুযোগ পাইয়া গেল। ছেলেটি বলিল, বিজয়কাকা গল্প বল না?

বিজয়ের মনটা এমনিই ভারী হইয়া গিয়াছিল। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, আজ আর গল্প বল্‌তে পারব না—আজকে মনে ক'রে রাখব, কাল বল্‌ব।

ছেলেমেয়ে দুটা শুনিল না। তারা জিদ্ ধরিল। বিজয় বলিল, আজ নয়—কাল তো বল্‌ব বল্‌ছি। ছেলেটা বলিল, না কাকা!

এবার তার মা ধমক দিল। ছেলে ও মেয়েটা চুপ করিয়া গেল। বিজয় জামার পকেটে হাত দিয়া কুসুমের দেওয়া আংটিটা অনুভব করিতে করিতে বাহিরের উদ্দেশ্যে পা বাড়াইল। পাছে কেহ প্রশ্ন করে সে জন্য সে আংটিটা খুলিয়া পকেটে রাখিয়া দিয়াছিল।

তাকে বাহিরে যাইতে দেখিয়া হরিহরের বউ কহিল, কোথায় যাচ্ছো ঠাকুরপো? ভাত বাড়ছি যে—

আসছি, বলিয়া বিজয় বাহিরে চলিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া পকেট

হইতে আংটিটি বাহির করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। কুসুমের জন্ত মনটা তার হাহাকার করিয়া উঠিল।

আহারাদি সারিয়া বিজয় হরিহরদের দলের অফিসে শুইতে যায়। হরিহরদের বাসাবাড়ীতে এমনিই খুব কম জায়গা। তার উপর দাওয়াটাতে ঘনশ্যাম থাকে। তাই বিজয়ের স্থান সঙ্কুলান হয় না। হরিহরের বউ সেজন্ত ছেলেকে দিয়া দলের একজন কর্ম্মীকে ডাকাইয়া সেখানেই বিজয়ের শোবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। রাতটা ঐ অফিসে কাটাইয়া সকালেই সে হরিহরের বাসায় ফিরিয়া আসে। হরিহরের বউ হাতমুখ ধুইবার জল দিয়া তারপর ঘরে যেদিন যেমন খাদ্যদ্রব্য থাকে, সেদিন নিতান্ত সহজ ভাবেই তা বিজয়কে খাইতে দেয়। খাইয়া দাইয়া সে সোজা চলিয়া যায় হাসপাতালে—হরিহরকে দেখিতে। বেলা এগারোটা অবধি হরিহরের সঙ্গে গল্প-গুজব করিয়া আবার ফিরিয়া আসে। হরিহরের বউ আবার যত্ন করিয়া খাইতে দেয়। দুপুরটা দাওয়ায় পড়িয়া থাকিয়া বিকালটায় এদিক-ওদিকে সভাসমিতি, শোভাযাত্রা প্রভৃতিতে অথবা হাসপাতালে হরিহরের কাছে গিয়া কাটাইয়া দেয়। এইভাবে এখানে তার দিন কাটিয়া যায়।

রাত্রিতে শুইতে আসিয়া বিজয় দেখিল অফিসে তখনও একদল কর্ম্মী বসিয়া আলোচনা করিতেছে। মণিবাবু মাঝখানে বসিয়া সকলকে কি যেন বুঝাইয়া দিতেছেন। বিজয় দরজার সুমুখে দাঁড়াইয়া তার কথা শুনিতে লাগিল। অফিসে যে ছেলেটি সর্ব্বক্ষণ থাকে তার নাম অমল। রোগা লম্বাটে ধরণের। রঙ্ ময়লা। সে কহিল, তাই যদি করতে হয় তাহ'লে আগে আমাদের হিসেব নিতে হয় কতজন লোক আছে।

তা তো নিতেই হবে, মণি বলিল, আর তা নিয়ে যতজন হবে তাকে চারটে হোক পাঁচটা হোক দলে ভাগ ক'রে নিতে হবে। তারপর এক-একটা দলকে সহরের এক-একদিকে পাঠিয়ে দিতে হবে। প্রত্যেকটা দলের

কাছে থাকবে নেতাদের মুক্তিদাবী করা একটা দরখাস্ত, আগামী রবিবারে সেই জন্যেই সভা করার হ্যাণ্ডবিল আর আমাদের পতাকা ; প্রত্যেকটা লোকের কাছে দলগুলো যাবে, লোকের সই নেবে আর সভায় আসবার কথা বলে আস্‌বে। বুঝলে ?

অমল কাগজ কলম নিয়া সকলের নাম লিখিতে লিখিতে বলিয়া উঠিল, বেশ।

হ্যাঁ তাহ'লে আমি আর দেরী ক'রব না। এখনই রাত প্রায় এগারোটা বাজে। ডেরায় পৌঁছুতে আরও আধঘণ্টা। কাজেই, বলিয়া মণি উঠিয়া পড়িয়া সোজাসুজি চলিয়া গেল।

অমল লিখিতে লিখিতে হঠাৎ দরজার সুমুখে বিজয়কে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তার কাছে আসিয়া কহিল, এই বিজয়বাবু—কাল বেরুবেন আমাদের সঙ্গে স্কোয়াডে ?

অন্যদিন হইলে হয়তো বিজয় ভাবিত, এতলোক থাকিতে তাকে ইহারা এমন করিয়া ধরিতেছে কেন ? কিন্তু আজ যেন সে কথাও তার ভাবিবার সুযোগ নাই। অদ্যকার সভায় একেই হাজার দশেক লোক হইয়াছিল তার উপর মণির বক্তৃতায় সে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এতক্ষণ আবার সেই মণিই কাল যাতে সবাই কাজে বাহির হয় তার জন্য বলিতেছিল, কাজেই সে ইহাতে যেন বেশ উৎসাহিতই বোধ করিল। তা ছাড়া ইহারা যে ধরনের মানুষ, তাতে ইহারা তাকে কাজের কথা বলিবেই। কোন মানুষকে ইহারা উপেক্ষা করিতে শিখে নাই—সবসময়েই হাত বাড়াইয়া কাছে টানিয়া নেয়। তার মত নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে মানুষকেও ইহারা ভালবাসে, নিজেদের একজন বলিয়া মনে করে। ইহাও কম আকর্ষণ নয় বিজয়ের কাছে। বিজয় রাজী হইয়া গেল।

ব্যস্—ব্যস, অমল চীৎকার করিয়া উঠিল, আমাদের পুরো ছটা স্কোয়াড কাল সহরে বেরুচ্ছে।

অফিসের মধ্যে সোরগোল পড়িয়া গেল।

বিজয় উহাদের কথায় বুঝিতে পারিল—প্রচারের দলকে উহারা স্কোয়াড বলে। স্কোয়াডটা নিশ্চয়ই ইংরাজী কথা। কাল তাকেও স্কোয়াডে বাহির হইতে হইবে।

শুইবার পালা আসিল বিজয়ের। ওরা কিন্তু তখনও আহারের অপেক্ষায়। অফিসেরই ভিতর দিককার একটা ঘরে রান্নাবান্না হয়—যারা অফিসে থাকে তারা খায়। যে ছেলেটি রাঁধে তার নাম অমর। বেঁটেসেঁটে ফর্সা মত ছেলেটি। অমর বি-এ পাশ। বি-এ পাশ করিয়া দেশের কাজ করে। অমর লোককে যেমনি বুঝাইতে পারে, তেমনি সে লিখিতেও পারে। তাছাড়া বিজয়ের কাছে সবচেয়ে যা বিস্ময়জনক ব্যাপার তা হইতেছে এই যে, বি-এ পাশ করিয়া ইহারা রাঁধিতেও কুণ্ঠিত নয়। অথচ সে যদি এপথে না আসিয়া সাধারণ মানুষের মত চাকুরী-বাকুরী করিতে যাইত তা হইলে সে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সুখে-স্বাছন্দ্যে জীবনযাপন করিতেও পারিত। কিন্তু তা না করিয়া...এই মহান ত্যাগের কথা ভাবিয়া বিজয় বিস্ময়ে পুলকিত হইয়া উঠে।

বিজয় মেঝেতে একটা মাদুর বিছাইয়া শুইবার ব্যবস্থা করিতেছিল। কিন্তু কি মনে করিয়া সে হঠাৎ রান্নাঘরের দিকে গেল। যারা দেশের জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে এবং যারা দিনরাত এত পরিশ্রম করে, তারা কি খাইয়া জীবন ধারণ করে তা একবার দেখা উচিত। এতদিন একথা তার মনেও হয় নাই আর সে দেখেও নাই। কিন্তু দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সবকটা লোক মিলিয়া যেন একেবারে মরিয়া হইয়া এমনিতরো দুঃখের জীবনকে বরণ করিয়া নিয়াছে। কয়েকটা থালায় শুধু সাদা ভাত—তাতে নুন মিশাইয়া তারা অবলীলাক্রমে গলাধঃকরণ করিতেছে। কিন্তু তাতেই যেন ওদের কত আনন্দ।

বিজয় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

সক্রিয়-মন মানুষের পক্ষে রাত্রি মিত্রও বটে শত্রুও বটে। তুমি যদি কোন জটিল সমস্যার সমাধান করিতে চাও তা-ও পারিবে আর যদি ঘণ্টার পর ঘণ্টা এলোমেলো ভাবে শুধু ভাবিয়া যাও তো, ভাবিয়াই যাইবে। দুই কারণেই নিদ্রা তোমার ত্রিসীমানায় ঘেঁষিবে না। কিন্তু প্রথমোক্ত ব্যাপারে রাত্রি তোমার মিত্র হইবে কারণ তুমি একটা কাজ করিতেছ আর শেষোক্ত ব্যাপারে শত্রুর মত কাজ করিবে—কারণ সে তোমায় কোন কাজও করিতে দিবে না, আর ঘুমাইতেও দিবে না।

বিজয়ের অনুভূতিপ্রবণ মনে কত কি কথা উঠিতে লাগিল এবং তারই ফলে সে ঘুমাইতে পারিল না। কাল সকালে সে অমলদের সহিত স্কোয়াডে বাহির হইবে। ইহা তার কাছে যেন এক নব-জীবনের ইঙ্গিত। ঐ ত্যাগী নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিকদের সহিত সে দেশের কাজে বাহির হইবে—ইহা কি কম গৌরবের কথা। লোকে তাকেও উহাদের একজন ভাবিবে। আনন্দে সে অধীর হইয়া উঠিল। চোখের সুমুখে তার ভাসিয়া উঠিল, কাল সকালে কি ভাবে পথ চলিবে তারই একটা কল্পিত ছবি। সে চলিয়াছে—হাতে তার নেতাদের মুক্তির জন্য দরখাস্ত, আগামী রবিবারে তারই জন্য জনসভার হ্যাণ্ডবিল আর, আর যেন একটা পতাকা ; পতাকার রঙটা ঘোর লাল, লালের উপর সাদা কাগজের কাস্তে আর হাতুড়ী। কত লোকের কাছে সে যাইতেছে, কত লোকের সঙ্গে কথা বলিতেছে। মনের চোখ দিয়া সে যেন দেখিতে পায় শহরের সেই পরিচিত পথগুলি—ঐ এখান দিয়া ওখান দিয়া পথগুলা মিশিয়া গিয়াছে একে অপরের সঙ্গে।

কিন্তু কেন সে চলিয়াছে ঐভাবে। যেদিন প্রথম সে হাসপাতালে হরিহরের কাছে আসিয়াছিল সেদিন মণিবাবুর নিকট হইতে সে শুনিয়াছিল, নেতাদের মুক্ত করিয়া আনিতে হইবে। কিন্তু কেনই বা নেতাদের মুক্তি ?

দেশের একদিকে জাপানী আক্রমণ, আরেকদিকে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ—এ অবস্থা হইতে দেশকে বাঁচিতে হইলে দেশের পক্ষে প্রয়োজন নিজেদের গভর্ণমেণ্টের।

তাই সে গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন নেতাদের বাহিরে আনা। তারপর অন্য সব করণীয় কাজ।

সহসা তার মনে হয়, এসব তো শুধু এইখানেই হইতেছে, সারা দেশময় আর কোথাও কি এইরূপ হইতেছে? তার নিজের গ্রামের কথাই ধরা যাক—সেখানে ওসবের কোনই ঢেউ গিয়া পৌঁছায় নাই। সেখানকার লোকেরা জানেও না যে, তাদের গ্রামের বাহিরে এতবড় একটা জগৎ পড়িয়া আছে এবং সে জগতের প্রাণ-প্রবাহ কখনও এমনিতরো, ঝটিকা-সঙ্কুল, কখনও উত্তাল, আর কখনও উদ্দাম।

বিজয় কাল অমলদের সহিত শহরে প্রচারে বাহির হইবে—একদিকে তার জীবনে এই নূতন উত্তেজনা আরেকদিকে গ্রামের কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় মনে এক প্রতিক্রিয়া, উভয়ে মিলিয়া তার মনে আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া অদ্ভুত এক তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া তুলিল।

এখানে যাই সে করুক, তা যে কোনকিছু করারই সামিল নয় একথা যেন তার কেমন করিয়া মনে হয়। দেশের কাজ বলিতে এই গোটা দেশেরই বুকে কাজ করিয়া বেড়ানো নয় এবং তা হইলেও বিজয়ের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। যেখানে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যেখানের মাঠঘাট, বনজঙ্গল, আকাশ বাতাস তার জীবনের প্রতিটি দিনকে সম্ভাবনায় সম্ভাবনায় ভবিষ্যতের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে, দেশ বলিতে তো তার কাছে সেই জায়গাটুকুই। তা ছাড়া আর যা কিছু সেও তো সেই সেখানকার পরিচিত মানুষগুলা—সেই মা, বউ, সেই কুসুম, শশীখুড়ো, শ্রীপতি ঠাকুর, সেই আশু ডাক্তার, পরমেশ, জীবন, পরাণ, দীনু, সেই ডিহিবাৎপুরের ইয়াসিন চাচা, শরৎ তাঁতী, রণবাগপুরের হারাণ কামার, কেষ্টবাটির দশরথ জেলে প্রভৃতি। দেশের কাজ করিতে গিয়া এই অতিপ্রিয় ও প্রতিদিনের দেশকে সে ভুলিবে কি করিয়া?

সেখানে কিছু হইতেছে না—বার বার করিয়া বিজয়ের এই কথাটাই মনে

পড়িতে লাগিল। এখানে আসিবার আগে সে দেখিয়া আসিয়াছে চাল চাল করিয়া গ্রামে কিরূপ হাহাকার উঠিয়াছে। তারপর কতদিন কাটিয়া গিয়াছে। এই শহরেই যখন এত বড় বড় লোক থাকিতে এখানে অবস্থা এরূপ সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে, তখন গ্রামে যে কি হইতেছে তা সহজেই অনুমেয়। শুধু কি তাই, শহরেও যেমন চোরাকারবারীরা মানুষের অন্নের গ্রাস লুণ্ঠন করিয়া লাভের অঙ্ক বাড়াইয়া নিতেছে তেমনি গ্রামেও তার চেষ্টা চলিবে, কারণ, সেখানে আছেন যোগেশবাবু, নফর ভট্চায, অধর কুণ্ডু ইত্যাদি লোক। মানুষের প্রতি তাদের নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা গ্রামের একটি শিশুর কাছে পর্য্যন্তও অবিদিত নাই।

কাল সকালে বিজয় প্রচারে বাহির হইবে একথা যেমন তার মনে পড়িতে লাগিল তেমনি তার গ্রামে ফিরিয়া যাইবার কথাও মনে হইতে লাগিল। অবশ্য গ্রামে সে এতদিন ফিরিয়া যাইত—যায় নাই কেবল হরিহরের জন্য। হরিহর বলিয়াছে সে হাসপাতাল হইতে ছাড়া পাইলে দুইজনে একসঙ্গে গ্রামে যাইবে। হরিহর সেই যে কবে গ্রাম ছাড়িয়া আসিয়াছে আর সে-মুখো হয় নাই। তা ছাড়া দেশ যখন একটা ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, তখন সেই দুর্দ্দিনের ঝাপটায় নিজের গ্রাম, জন্মভূমি কেমন আছে, তা দেখিতে মানুষের বড়ই ইচ্ছা করে। হরিহরের সেই আগ্রহটুকুর আন্তরিকতায় আটকাইয়া গিয়াই বিজয় আজও শহরে রহিয়া গিয়াছে। যাই হোক্ কাল সে প্রচার করিয়া ফিরিবার পথে হরিহরকে বলিয়া আসিবে, হাসপাতাল হইতে ছাড়া পাইতে যদি তার তেমন দেরী থাকে তবে সে আগেই চলিয়া যাইবে।

কিন্তু আগে গিয়াই বা করিবে কি? মনে মনে বিজয়ের একটা ধারণা আছে যে হরিহরেরা তার চেয়ে বেশি বোঝে। কি করিতে হইবে না হইবে, ইহারা তা প্রত্যক্ষ কাজের ভিতর হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছে। বিজয়ের সে শিক্ষা নাই। কাজেই সে একা গ্রামে ফিরিয়া গিয়া কি করিবে। সে জন্য

হরিহর যখন যাইতে চায় তখন তাকে সঙ্গে নিয়া যাওয়াই ভাল। তা ছাড়া আরও একটা কথা তার মনে জাগে। সে মণিবাবুকে একবার তাদের গ্রামে নিয়া যাইবে—গ্রামের লোককে শুনাইবে তিনি কেমন বক্তৃতা দেন। এবং মণিবাবুর সেই বক্তৃতা শুনিয়া গ্রামের লোকের নিশ্চয়ই চোখ খুলিয়া যাইবে।

এইসব ভাবিতে ভাবিতে বিজয়ের ঘুম কোথায় উবিয়া গেল। সে উঠিয়া বসিয়া একটা বিড়ি ধরাইল। বিড়ি ধরাইয়া দেখিল, অফিসের সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে কিন্তু পাশের ঘর হইতে যেন আলোর রেশ আসিতেছে। কি ব্যাপার? এত রাতে এইভাবে আলো জ্বলিতেছে কেন? ঘরখানার দিকে আগাইয়া গিয়া দেখে সেই বি-এ পাশ ছেলেটি, যে রান্না করে—অমর—একটা মোমবাতি জ্বালাইয়া কি যেন পড়িতেছে। বাতিটার স্তিমিত-আলোকে তার গৌরকান্তি মুখমণ্ডল এক অপূর্ব্ব আভায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, মাথার চুলগুলা ফুলিয়া ফাঁপিয়া কেমন যেন দৃঢ়তার প্রলেপ দিয়াছে মুখখানায়। এত কষ্ট করিয়া এত অক্লান্তভাবে ও আন্তরিকতার সঙ্গে ইহারা দেশের কাজ করে। বহির্জ্জগতের কে-ই বা ইহাদের জীবনের এই অপরিমেয় সাধনার কথা ভাবে!

যেমনভাবে বিজয় গিয়াছিল তেমনি ভাবেই সে ফিরিয়া আসিল। আজ আর তার ঘুম হইবে না। তবু সে শুইয়াই পড়িল। বাহিরে নিঃসীম কালো আকাশে রাতের পৃথিবীর যেন গান শোনা যায়।

সকালে তাকে চলিতে হইবে নব-জীবনের পথে।

ইতিমধ্যে গ্রামে ঝড় বহিয়া গিয়াছে। আর সেই ঝড়ের তাণ্ডবে গ্রাম, গ্রামের মানুষ—এমন কি গ্রামের প্রাত্যহিক জীবনধারা সবকিছুই তছ্‌নছ হইয়া গিয়াছে।

মানুষ সবকিছুর অভাব, সবকিছু দুঃখকষ্ট, নির্য্যাতন সহ্য করিতে পারে—পারে না কেবল ক্ষুধার উপর অত্যাচার সহ্য করিতে আর ভবিষ্যৎ বংশধরদের অনাহারক্লিষ্ট মুখখানা দেখিতে। তাই সে মরিয়া হইয়া উঠে, হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলে।

ফুড-কমিটি গ্রামের মানুষের জন্য হয় নাই—ফুড-কমিটি হইয়াছে পুরুষানুক্রমে যারা দস্যুবৃত্তি করিয়া সভ্য-ভব্য হইয়া সমাজে আসন করিয়া রাখিয়াছে তাদের জন্য। যোগেশবাবু, নফর ভট্‌চায, অধর কুণ্ডু, ইব্রাহিম, পঞ্চু আর সেই কান্তবাবু ও ধীরেনবাবু প্রভৃতি—ইহারাই ফুড-কমিটির হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা। গ্রামে যত চাল আসে তা যে কোথায় যায় তা কেউ জানিতেও পারে না। চাল আনিতে গেলে বলে, আরে বাপু গভর্ণমেণ্ট কি আর চাল দিচ্ছে যে তোদের দোব। গভর্ণমেণ্ট সব চাল মিলিটারীর জন্যে নিয়ে যাচ্ছে। লোকে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসে।

অথচ লোকে বেশ ভাল ভাবেই জানে যে বেশি দাম দিলেই চাল পাওয়া যায়। যতক্ষণ প্রত্যেকটি মানুষ বেশি দাম দিতে পারিল, তারা খাইতেও পাইল। কিন্তু লোকে রোজ রোজ বেশি দাম দিয়া চাল কিনিবার টাকাই বা পাইবে কোথায়? অনেকে জমি বেচিতে সুরু করিল। আবাদ করা সবুজ-ফসলে ভর্ত্তি জমি, জলের দরে বিকাইয়া দিতে বাধ্য হইল।

এমনিতরো যখন অবস্থা গ্রামের তখন একদিন ইয়াসিনদের সেই আশু ডাক্তারের সহিত সলা-পরামর্শ করা সভাটি হয়। সভার জন্য গোড়াতেই

চারিদিকে ঢেঁড়া দেওয়া হয়। একে লোকের মাথার উপর এমনিতরো দুর্দ্দিন নামিয়া আসিয়াছে, তার উপর তারই প্রতিকার করিবার জন্য সভা—সভার দিন লোক একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকলেই ফুড-কমিটির উপর ক্রুদ্ধ। ফুড-কমিটি সবাইকে—গ্রামের, সমগ্র ইউনিয়নের সমস্ত লোককে পথে বসাইয়াছে। তাই সভায় গোড়া হইতেই উত্তেজনা সৃষ্টি হইয়া গেল।

আশু ডাক্তার ফুড-কমিটির উপর সমালোচনা করিতে গিয়া ক্ষেপিয়া উঠিল। অনেক গরম গরম কথা সে বলিয়া ফেলিল। সকলে উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

ডিহিবাৎপুরের ব্যবসাদার রাখহরি, পশ্চিমপাড়ার দোকানী চন্দোর, তারাও আসিয়াছিল সভায়। তাদের বহু বৎসরের ব্যবসা—এই ফুড-কমিটি, কণ্ট্রোল প্রভৃতি হওয়ায় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কাজেই রাগ তাদের কম নয়। নিজ স্বার্থে ঘা পড়িলে মানুষ যেভাবে প্রতিশোধ-পরায়ণ হইয়া উঠে তারাও সেইরূপ প্রতিশোধ-পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে। তারা দুজনেই মানুষের এই সীমাহীন দুঃখ কষ্টের প্রতিকারের ধার দিয়াও গেল না—সোজাসুজি লোককে লুঠপাট করিতে উত্তেজিত করিল। সুমুখে পথ নাই, কোন পন্থা নাই, নাই কোন আশার আলো, লোকে রাখহরি আর চন্দোরের কথায় যেন কিছু একটা করিবার মত কাজ পাইল। সভাস্থলেই মুখে-মুখে চোখে-চোখে তাদের কি যেন অশুভ-ইঙ্গিতের ইসারা দেখা গেল।

চৌকিদার, দফাদার, প্রভৃতি যোগেশবাবু ও নফর ভট্‌চাযের লোক আগে হইতেই সভায় উপস্থিত ছিল। তারা যথাসময়ে প্রভুদের কাছে জনতার এই মারাত্মক সঙ্কল্পের কথা পৌঁছাইয়া দিল। সেই দিনই রাত্রিতে যোগেশ-বাবুর বিশেষ দূত চলিয়া গেল মহকুমা-শহর আরামবাগে। সেখানে এস-ডি-ও, সার্কেল অফিসার ও পুলিশ সাহেবকে ব্যাপারটা জানাইয়া অবিলম্বে শান্তিরক্ষার জন্য আবেদন জানানো হইল। কিন্তু আরামবাগ শহর পশ্চিমপাড়া হইতে বারো মাইল পথ—শান্তিরক্ষার আবেদন শুনিলেও ঝটিতি করিবার কিছুই নাই

আরামবাগ মহকুমা চির-অভিশপ্তের দেশ। এই বিংশ-শতাব্দীর মধ্যভাগে মানুষ যখন বিজ্ঞানের বলে কত বিস্ময়কর সব আবিষ্কার করিতেছে, মানুষের প্রাত্যহিক জীবনধারাকে বিজ্ঞানের মাধ্যমে সহজ হইতে সহজতর করিয়া তুলিতেছে, দেশ-দেশান্তরে পাড়ি দিবার মত সব দ্রুত যানবাহন তৈরী করিয়া ফেলিতেছে, তখন আরামবাগ সেই মান্ধাতা-আমলের বর্ব্বর যুগের রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে পড়িয়া পরিত্রাহি চীৎকার করিয়াও তার দুঃখের ভার লাঘব করিতে পারে না। আরামবাগ মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকায় দু-একটি পথ ছাড়া আর পথ নাই। মাঠের আলে-আলে, জঙ্গলের ভিতরে-ভিতরে, লোকের বাড়ীর উঠানে উঠানে মানুষকে পথ চলিতে হয়। এই পথ বহিয়া চট্ করিয়া যে পুলিশ আসিবে, এ ধারণা করা নিতান্তই ভুল। তাই তাড়াতাড়ি পুলিশ আসিতে পারিল না।

কিন্তু পরদিন, সারা ইউনিয়নে যারই বাড়ীতে ধান আছে সেই বাড়ীতেই লুঠতরাজ হইয়া গেল। রাখহরি ও চন্দোর দুইজনে মোটা টাকা খরচ করিয়া লোকজনকে মদ খাওয়াইল। গোড়া হইতেই আশু ডাক্তার লুঠপাটকারীদের সহিত ছিল। ডাক্তার সকলকে বুঝাইয়া বলিল, আমরা কারো কোন জিনিসে প্রথমে হাত দোব না—সোজাসুজি দেশের অবস্থা ব'লে লোকের কাছে ভিক্ষে চাইব। তারপর যদি দিলে তো মিটেই যাবে, তা নইলে মরাই ভাঙা হবে—মরাই ভেঙে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে সব ওজন ক'রে ক'রে আধ মণ হিসাবে ধান লোককে দেয়া হবে আর যাকে যা দেয়া হবে তা কাগজে লিখে রাখা হবে। মন্বন্তর পার হয়ে সব বেঁচেবর্ত্তে থাকলে আবার সেই কাগজ ধ'রে হিসেব ক'রে ক'রে যার-যার ধান তাকে ফেরৎ দেওয়া হবে।

সবাই বলিয়া উঠিল, এই যুক্তিই ভাল।

কিন্তু লুঠতরাজের মুখে কে কার কথা শোনে।

শ্রীপতি, দীনু, পরমেশ, জীবন নেতৃত্ব করিতেছিল উন্মত্ত জনতার।

বুড়া ইয়াসিন শরৎ তাঁতী, দশরথ হারাণ প্রভৃতি লোকগুলাকে সামলাইয়া নিয়া যাইতেছিল। আশু চলিতেছিল সবার পিছনে সেনাপতির মত।

রাখহরি ও চন্দোরের পয়সা ঢালা মদের ক্রিয়া তখন চড়িতে সুরু করিয়াছে। বর্ব্বর-উল্লাসে এই পথ-ভ্রান্ত ক্ষুধিত জনতা হুঙ্কার দিয়া উঠে। গ্রাম-গ্রামান্তরে সে হুঙ্কার ছড়াইয়া পড়ে। চারিদিকের মানুষ ঘর হইতে পথে বাহির হইয়া পড়ে। হিমেল-ঝড়ের কন্‌কনে ঠাণ্ডা যেমনভাবে মানুষের হাড়ে হাড়ে কাঁপুনির সৃষ্টি করে তেমনি করিয়া এই উন্মত্ত জনতার তাণ্ডব গ্রামবাসীদের মনে ত্রাসের কম্পন সুরু করিল।

সর্ব্ব প্রথমেই তারা অধর কুণ্ডুর বাড়ীতে গিয়া পড়িল। অধর কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া জনতার সামনে দাঁড়াইল। শ্রীপতি বজ্রকণ্ঠে হাঁকিল, মরাই ভাঙো এখুনি!

মরাই, কাঁপিতে কাঁপিতে অধর বলিল, মরাই ভাঙ্‌তে হবে!

হ্যাঁ, দীনু কহিল, আপনার ভাঙ্‌তে মায়া হয় আমরাই ভেঙে নিচ্ছি। কিন্তু চাবীটা দিন—

শ্রীপতি দেখিল চাবীটা অধরের কোমরে ঝুলিতেছে। তার ইচ্ছা হইল সে নিজেই ছিনাইয়া নেয় কিন্তু সেটা যেন কেমন লাগে। তাই দীনুকে ইসারা করিল। দীনু মুহূর্ত্তের মধ্যে চাবীটা অধরের কোমর হইতে কাড়িয়া নিল এবং সোল্লাসে গোলাবাড়ীর দিকে যাইবার জন্য সমস্ত লোককে আহ্বান করিল। জনতা হুঙ্কার দিতে দিতে সেদিকেই ছুটিল।

অধর তখন ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। আশু ডাক্তার পিছন দিক হইতে ছুটিয়া অধরের কাছে গিয়া কহিল, ভয় কি কুণ্ডু মশাই—তুমি চলো আমাদের সঙ্গে, তোমার ধানের কোন ক্ষতি হবে না। আমি সবাইকে হিসেব ক'রে নিতে বল্‌ব। তারপর যখন দিন আস্‌বে, তখন সবাইকে তোমার ধান কড়ায়

গণ্ডায় শোধ ক'রে দিতে হুকুম দোব। তোমার তো অনেক আছে কুণ্ডু, তুমি ওদের বাঁচাও না, তাতে তোমার ভালই হবে।

আশু ডাক্তারের কথায় অধর কুণ্ডুর আর কিছু না হোক্ খানিকটা সাহস ফিরিয়া আসিল। সে ডাক্তারের দুটা হাত ধরিয়া করুণভাবে কহিল, ডাক্তার মরাইগুলো আমার অনেক দিনের মরাই—ওগুলো তুমি ওদের ভাঙতে বারণ করো। আমি নতুন মরাই থেকে ওদের ধান দোব। ওরা যত চায় আমি তত দোব—শুধু তুমি পুরনো মরাইগুলো ভাঙতে দিওনা!

আশু ডাক্তার কহিল, বেশ তাই হবে, তুমি চলো আমার সঙ্গে গোলাবাড়ীতে।

জনতা ঝড়ের বেগে গিয়া গোলাবাড়ীর চাবী খুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। অধর আশু ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে গোলাবাড়ীতে গেল। শুধু যাইতে যেটুকু দেরী হইয়াছে—ব্যস তারই মধ্যেই কয়েকটা মরাই একেবারে ভাঙিয়া ভূমিসাৎ করিয়া ফেলা হইয়াছে। খড়ের পাকানো দড়ির বেড়ে তৈরী মরাই, সেই বেড় খুলিয়া দড়িগুলা পাকাইয়া একদিকে জড়ো করা। মাটির উপরে ধান ছড়াইয়া পড়িয়াছে লক্ষ্মীছাড়া গৃহস্থের জিনিসপত্রের মত। এই দৃশ্য দেখিয়া অধর ডুক্‌রাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ধান ঐ ভাবে ছড়াইয়া ফেলা অন্যায়। কিন্তু তবু এই অন্যায় দেখিয়াও আশু ডাক্তার যেন ঠিক সেই মুহূর্ত্তটিতে অন্যায়কারীদের তিরস্কার করিতে পারিল না। তার দৃষ্টি পড়িল অধরের দিকে। অধর কাঁদিতেছে! তার কান্নার মধ্যে ডাক্তার যেন কি এক অপূর্ব্ব তৃপ্তি অনুভব করিল। মনে মনে সে হাসিয়া উঠিয়া কহিল, এরা তোমার বড্ড ক্ষতি করলে না কুণ্ডু মশাই!

অধর আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে দাঁড়িপাল্লা নিয়া দীনু ধান ওজন করিতে সুরু করিয়া দিয়াছে। শ্রীপতি কয়েক টুক্‌রা কাগজে পেন্সিল দিয়া একটি একটি করিয়া হিসাব রাখিতেছে। এবং তারই মাঝে এক-একজন করিয়া কাপড়ের খুঁটে, গামছায়,

বস্তায় বা ধামায় ভরিয়া ভরিয়া নিয়া চলিয়া যাইতেছে। অধর হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সব দেখিতেছে। আজ তারই ধান তারই সুমুখ দিয়া লোকে এমনি করিয়া নিয়া যাইতেছে কিন্তু সে কিছুই করিতে পারিতেছে না এবং যেন তার করিবারও কিছু নাই। কে জানে সময় বিশেষে হয়ত মানুষের এমনিই হয়।

ডাক্তার এবার যেন একটু নরম হইয়া গেল। গায়ে-গতরে খাটিয়া, রোদে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া যারা লাঙল চালায় মাঠে আশু ডাক্তার তাদের জাত নয়—কাজেই তাদের সে ক্রোধ আশু ডাক্তারের অন্তরে নাই। সেজন্য তার মন নরম হইয়া আসিবেই। ডাক্তার পকেট হইতে একটা শিশি বাহির করিয়া গলায় ঢালিয়া দিল।

কিন্তু ঐ ওরা, ঐ চাষীরা, ওদের যেন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। মরাইয়ের পর মরাই রাগে অন্ধ হইয়া ভাঙিতে লাগিল—ইচ্ছামত ধান নিয়া পালাইল, ছড়াইল, তছ্‌নছ করিল, চীৎকার করিল। লুণ্ঠনকারীদের মধ্যে রাখহরি ও চন্দোরের লোক ছিল, তারা আরও বীভৎস কাণ্ডে মাতিয়া উঠিল। সব তছ্‌নছ করিয়া দিয়া আসিবার সময় আগুন লাগাইয়া দিয়া আসিল।

এই উন্মত্ত জনতার সম্মুখে দাঁড়াইবার কেহ নাই। চোখের সুমুখে অধরের একশো-দেড়শো ধানের মরাই যেন কি হইয়া গেল!

সেদিন শুধু অধর কুণ্ডুর ধানের মরাই লুঠ হয় নাই—আরও অনেক জায়গায় খণ্ড খণ্ড ভাবে লুঠ পাট চলিয়াছিল। কোথা হইতে যে জনতা আসে বোঝা যায়না। আসে আর পঙ্গপালের মত সবকিছু শূন্য করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। সারাগ্রাম, আশেপাশের সমস্ত পরিচিত এলাকায় সর্ব্বত্রই যেন সেদিন মানুষের লুণ্ঠন প্রবৃত্তি পাশব-প্রেরণায় দুকূল ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। সেদিন যোগেশবাবু, নফর ভট্‌চায প্রভৃতির বাড়ীও এই লুঠপাট হইতে বাদ যায় নাই। কিন্তু যোগেশবাবুর বন্দুক ছিল, তিনি যতক্ষণ তাঁর কাছে কার্তুজ ছিল ততক্ষণ ধরিয়া গুলী চালাইলেন। সেই গুলীবৃষ্টির মুখে জনতা অগ্রসর হইতে সাহস

করিল না, ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল কিন্তু সে পলায়ন নয়—আরও হিংস্র-আক্রমণের প্রস্তুতি।

কিছুক্ষণ পরেই সেই ছত্রভঙ্গ জনতা আশু ডাক্তারের নেতৃত্বে দানা বাঁধিয়া উঠিল। ঝড়ের বেগে তারা প্রবেশ করিল নফর ভট্‌চাযের বাড়ীতে। বাড়ীটা দু'মহলা, বাহির বাড়ীতে মরাইয়ের পর মরাই। জনতা যেমন করিয়া অধরের বাড়ীতে লুঠপাট চালাইয়াছিল, যেমন করিয়া সবকিছু তছ্‌নছ করিয়াছিল, তেমনি করিয়াই ভট্‌চাযের বাড়ীতেও লুঠপাট চালাইতে লাগিল। আশু ডাক্তার ইতিমধ্যে অনেক বারই মদ্যপান করিয়াছিল। সাধারণভাবে সে যেরকম মদ খায় সেদিন ঐ লুঠপাটের সময়টুকুর মধ্যেই সে তার প্রায় তিনগুণ খাইয়া ফেলিয়াছিল। তাই সে যেন কেমন একটু বেসামাল হইয়া পড়িতেছিল। মাঝে মাঝে প্রলাপের মত অর্থহীন দু-একটা কথাও বলিয়া ফেলিতেছিল। ক্ষিপ্ত ক্রোধান্ধ দুঃসাহসিক জনতার মাঝখানে বলির পাঁঠার মত নফর ভট্‌চায যখন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিজের বহুদিনকার সঞ্চিত ধানের মরাইগুলিকে ধ্বংস হইতে দেখিতেছিলেন তখন মাঝে মাঝে আশুডাক্তার মাতালের কণ্ঠস্বরেই তাঁকে প্রশ্ন করিতেছিল, ছোটবউ আছে নাকি এখানে ?

ভট্‌চায কথা বলিতে পারিতেছিল না। আশু ডাক্তার তার সামনে আগাইয়া গিয়া ভট্‌চাযের দুই কাঁধে ঝাঁকানি দিয়া বলিয়া উঠিল, বল না ছোট বউ কি আমার কেউ নয় ?

দীনু ধান তুলিতে তুলিতে একবার ডাক্তারের দিকে তাকাইয়া নিল। লোকটা অমন করিয়া ছোটবউ ছোটবউ করিতেছে কেন ?

কিন্তু সেই অশান্ত জনতার চীৎকার ও গোলমালে কে কার কথা ভাবে। লুঠপাট পুরাদমেই চলিতে লাগিল। শুধু তাই নয়—সমস্ত জনতারই যেন ভট্‌চায লোকটার উপর একটু বেশি রাগ। অনেকে রাগের মাথায় তার মুখে থু-থু করিয়া থুতুও ফেলিয়া দিল। নিরুপায় ভট্‌চায ক্ষয়-ক্ষতিতে রাগে দুঃখে অপমানে আর নির্যাতনে যেন মরিয়া যাইবার উপক্রম

হইলেন। ডাক্তার কিন্তু এই ফাঁকে কখন গিয়া অন্দর মহলে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল।

পরিপূর্ণ মাতাল তখন আশু ডাক্তার। চোখ দুইটা জবাফুলের মত রাঙা। ছোটবউ অর্থাৎ ভট্চাযের দ্বিতীয় স্ত্রী—তাকে যেদিন হইতে ভট্চায এই বাড়ীতে আনিয়া তুলিয়াছে সেদিন হইতে আশু ডাক্তার আর কখনো ভট্চাযের বাড়ীতে আসে নাই। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পরে সেদিন সেই সর্ব্বপ্রথম পা দিয়াছিল। অন্দরে ঢুকিয়াই সে দেখে দালানের ভিতর ছোটবউ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পঁচিশ বৎসর আগে ডাক্তার তাকে যেমন দেখিয়াছিল প্রায় সেইরকমই আছে। শুধু বয়সের সামান্য একটু ছাপ লাগিয়াছে মুখে। তাকে দেখিতে পাইয়াই ডাক্তার হাঁকিল, পারুল?

ডাক্তারের মূর্ত্তি দেখিয়া পারুল চমকাইয়া উঠিল। ডাক্তার কিন্তু অগ্রসর হইল না। একটু আগে পর্য্যন্ত যে লোকটা অসম্ভব রকমের মাতাল হইয়া উঠিয়াছিল, সে যেন আর সে মানুষই নয়। ধীর স্থির মূর্ত্তিতে ছবির মত শুধু ভট্চাযের দ্বিতীয় স্ত্রী, যাকে ডাক্তার সেইমাত্র পারুল বলিয়া ডাকিল তার দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পারুল পিছন দিকে তাকাইয়া দেখিল। পিছনেই দাঁড়াইয়া ছিল ভট্চাযের প্রথম বউ শ্যামা। শ্যামা দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, পোড়ারমুখি ঘরে ঢোকোনা—শ্বশুর বংশের নাম ডোবাবে?

ডাক্তার হঠাৎ যেন স্বাভাবিক মানুষ। টানিয়া টানিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, না না শ্বশুরের বংশের নাম ডোবাবে না পারুল। আমি আর কেউ নয় আশু ডাক্তার—আশু ডাক্তার ক্রীতদাসীর গায়ে হাত দেয় না।

পরক্ষণেই শ্যামা কিন্তু ঘরের ভিতর গিয়া বাহির মহলের দিকে উদ্দেশ করিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল। সেই বলির পাঁঠার মত মানুষ নফর ভট্চায সহসা ছুটিয়া আসিয়া কেমন করিয়া যেন সাহস সঞ্চয় করিয়া পিছন হইতে ডাক্তারের মাথায় লাঠি বসাইয়া দিল।

ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিল। ডাক্তার ঘুরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু শীকারে বিফল মনোরথ হইলে সিংহ যেমন আর কোন চেষ্টা না করিয়া শান্ত হইয়া যায় ঠিক তেমনিভাবেই আশু ডাক্তার তার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া নিয়া ছোটবউ পারুলের দিকে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, শুধু তোমার মুখ চেয়ে পারুল তোমার এই অপদার্থ স্বামীকে ক্ষমা করে গেলুম।

দীনু বুঝি ভট্‌চাযকে অন্দরের দিকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়াছিল। প্রথমতঃ সে ডাক্তারকে খুঁজিল দেখিতে পাইল না, তারপর ভট্‌চায-ও অন্দরের দিকে ছুটিয়া গেল। অন্দরের দিকে নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটিতেছে। তাই কি ভাবিয়া সে ছুটিয়া আসিল। আসিয়াই দেখে ডাক্তারের মাথা দিয়া অজস্রধারে রক্ত ঝরিতেছে। ব্যাপার কি?

ডাক্তার তখন বলিয়া চলিয়াছে, আর শোনো ভট্‌চায। পারুলকে তুমি বিয়ে করেছ? বিয়ে করনি! গরীবের সুন্দরী মেয়েকে টাকা দিয়ে কিনেছ। আসলে সে আমারই স্ত্রী। প্রথম যৌবনে বন-বাদাড়ের ফুলে মালা গেঁথে আমরা মালা বদল করেছিলাম। স্বামী-স্ত্রীর মত আমরা একসঙ্গে অনেকদিন কাটিয়েওছিলাম কিন্তু জাতিভেদ প্রথায় আমরা আইনতঃ স্বামী-স্ত্রীর অধিকার পাইনি। অবশ্য গায়ের জোরে আমি ওকে অনেকদূরে নিয়ে চলে যেতে পারতাম। যাইনি ওরই কল্যাণের জন্যে। আজও ওরই কল্যাণের কথা ভেবে আমি তোমাকেও ছেড়ে দিয়ে গেলাম। ভেবনা আমি ভীরু। আজ এই উন্মত্ত জনতাকে যদি একটুখানি সঙ্কেত করি—

দীনু বলিয়া উঠিল, ডাক্তারবাবু।

চুপ, ডাক্তার কহিল, আমার নাম আশু ডাক্তার। আশু ডাক্তার মাতাল হ'তে পারে কিন্তু চিকিৎসা ক'রে মানুষ বাঁচায়। আশু ডাক্তার ধান লুঠ করাতে আসতে পারে কিন্তু সর্ব্বনাশ করবে না কারও। ভট্‌চায তুমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারো। আর পারুল—

সহসা ডাক্তারের কথার মাঝেই পারুল ডাক্তারের দিকে ছুটিয়া আসিতে

আসিতে কহিল, তুমি দাঁড়াও—আমার বাড়ী থেকে আমি তোমাকে এভাবে যেতে দোবনা !

ভট্‌চায পারুলের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া হাঁকিল, ছোট বউ ?

সরে যাও তুমি, গায়ের যত শক্তি সমস্ত দিয়া পারুল ভট্‌চাযকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া আশু ডাক্তারের কাছে আসিয়া কহিল, মাথায় বড্ড রক্ত পড়ছে। একটু কিছু বেঁধে নিয়ে যাও। আমি জল এনে দিচ্ছি।

ছোট্ট মেয়ের মত চল্লিশবছর বয়সের পারুল ছুটিয়া ঘটি করিয়া জল আনিল। আশুকে দালানে বসাইয়া নিজের শাড়ীর আঁচল ছিঁড়িয়া তার মাথায় পট্টি বাঁধিয়া দিতে লাগিল। ভট্‌চায চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সব দেখিল। বড় বউ ঘরের ভিতর হইতে বলিল, ঘেন্নাও করে না, লজ্জা'ও করে না !

ডাক্তার শুধু টানিয়া টানিয়া হাসিল।

তারপর যাইবার আগে বলিয়া গেল, দেখলে ভট্‌চায কে হারল কে জিতলে ? ইহার পর পারুলের দিকে তাকাইয়া কহিল, দেখ পারুল এরপর লুঠতরাজের মামলা হবে হয়তো কিন্তু লুটতরাজ করতে আমি আসিনি। এইকথাটাই বলে গেলাম।···

···সেদিনের সেই লুঠতরাজের পর গ্রামময়, সারা ইউনিয়নময় চলিয়াছে প্রচণ্ড দমননীতি। লুঠতরাজকারীদের একটি লোকও আর বাকী নাই, বাছিয়া বাছিয়া সবাইকে তারপর পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। কয়েকদিন হইল সকলেই জেলহাজতে। শুধু আশু ডাক্তার বাঁচিয়া গিয়াছে, পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে নাই, এমন কি দারোগা, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্তে আসিলে আশু ডাক্তারের নাম পর্য্যন্ত কেহ করে নাই। কেমন করিয়া এরূপ হইল কে জানে। গ্রামের চারিদিকে কথাটা ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে আশু ডাক্তার বাঁচিয়া গিয়াছে শুধু ভট্‌চাযের ছোট বউটার জন্য।

বিজয়ের মা, বনমালা ও কুসুমের অবস্থা একেবারে শোচনীয় হইয়া

উঠিয়াছে। একে তো গ্রামে চাল পাওয়া যাইতেছিল না, তার উপর যাও বা মিলে তাও বেশি দাম না দিলে পাওয়া যায় না। কুসুম একা হইলে তো কথাই ছিল না। কিন্তু একা সে নয়। কেমন করিয়া যেন সে বিজয়ের সংসারে জড়াইয়া পড়িয়াছে। বিজয়ের মা বা বনমালা তার কেউ নয়, তবু সে তাদের দুঃখ কষ্ট দেখিতে পারে না। ঘনশ্যাম, বিজয় সেই যে গিয়াছে আর ফিরিবার নাম নাই। ঘনশ্যাম না ফিরুক, শহরেই তার সবকিছু পড়িয়া আছে কিন্তু বিজয়ের তো ফেরা উচিত ছিল, কারণ তার সবকিছুই তো গ্রামে! লোকটার উপর রাগ হয় কুসুমের।

ইতিমধ্যে কুসুম একটি একটি করিয়া তার অলঙ্কারগুলি খুলিয়া দিয়াছে, বিজয়ের মা ও বনমালাকে বাঁচাইবার জন্য। এক-একখানা অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাওয়া গিয়াছে তাতে আধমণ চালও কেনা যায় না তারপর নিজের জন্যও কুসুমকে ভাবিতে হইয়াছে—মন্বন্তর আসিয়া পড়িয়া সবকিছু যেন উল্টাইয়া দিয়াছে। কোথাও কোন কাজ পাওয়া যায় না, পয়সা উপায়ের কোন পথ নাই। তাকেও তাই নিজের জন্য অলঙ্কার বিক্রয় করিতে হইয়াছে।

ইহা ছাড়াও তাকে আবার মাঝে মাঝে দান-সাহায্যও করিতে হইয়াছে। পঞ্চুর বউ সৌরভ, হরিপদর ভাই-ঝি মতি, বিষ্ণুর বোন মাধবী, ইহারাও কখন-সখনো আসিয়া কিছু কিছু চাহিয়া নিয়া যায়। পঞ্চু আজকাল আর বাড়ীমুখোই হয় না। যোগেশবাবু, ভট্‌চায প্রভৃতি নাকি ভদ্রেশ্বরের ওদিকে গৌরহাটি না কোথায় মিলিটারীর ঠিকাদারী পাইয়াছেন—পঞ্চু দিনরাত সেইখানেই পড়িয়া থাকে। মাঝে মাঝে গ্রামে আসে, আর আশেপাশের দু-চারিটা গ্রাম হইতে মেয়েদের নিয়া সরিয়া পড়ে। তাই সৌরভটার যেন দুঃখের শেষ নাই। বউটা প্রথম প্রথম দীনুর উপর নির্ভর করিতেছিল কিন্তু তার গ্রেপ্তারের পর সে আর এমন একজনকেও খুঁজিয়া পায় না, যার উপর নাকি নির্ভর করিবে।

কয়েকটা দিন উপর্য্যুপরি ভারী বৃষ্টি হইতেছিল। আকাশ মেঘে মেঘে

অন্ধকার। অবিশ্রান্ত বর্ষাধারার যেন শেষ নাই। গ্রামের পুকুর, ডোবা, খাল, বিল মাঠ সব জলে ডুবিয়া গিয়াছে। একে তো এতদঞ্চলে পথঘাট বলিয়া কিছু নাই, তার উপর এই বৃষ্টি। কোন কোন জায়গা হয় জলে ডুবিয়া গিয়াছে নয় তো কাদায়-কাদা হইয়া গিয়াছে। ঘর হইতে একপাও কোথায় নড়িবার যো নাই।

এবারে আগে বর্ষা নামে নাই—নামিয়াছে অনেক দেরীতে। তাই বোধকরি বর্ষার এত তেজ। নামী বর্ষার লক্ষণ কখনও ভাল হয় না।

কুসুম ভোরবেলা ঘুম হইতে উঠিয়া চুপ-চাপ দাওয়ায় বসিয়া ছিল। কদিন ধরিয়াই সে ভাবিতেছে মতিকে দিয়া সে একবার ডাক্তারবাবুকে ডাকাইবে। ডাক্তারবাবুকে ডাকাইয়া সে বিজয়দের খবর দিবার জন্য বলিবে। এ অবস্থায় তারা না ফিরিলে আর তো চলে না। কিন্তু যে বৃষ্টির প্রাবল্য তাতে তার ইচ্ছা আর সফল হয় নাই। গ্রামের অধিকাংশ পুরুষ মানুষই আজ জেলে। তাদের পরিবারগুলির স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনশন সুরু হইয়া গিয়াছে। এমন কি অনেকে আবাদকরা জমি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া ফেলিতেছে। কি করিবে মানুষ, নিরুপায় হইলে এইরূপই করিতে হয়।

ভোরের দিক হইতে বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বাতাস সুরু হইয়াছিল। সে বাতাস যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল।

অতো বৃষ্টির মধ্যেও টোকা মাথায় দিয়া কিন্তু সৌরভ আসিয়া পড়িল। বাতাসের ঝাপটায় তার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে। কুসুম তাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, কিরে এত জলে তুই যে বাইরে বেরিয়েছিস?

কি করব, টোকাটা খুঁটির একদিকে ঠেকাইয়া রাখিয়া আঁচল দিয়া মুখখানা মুছিতে মুছিতে সৌরভ বলিল, কোন্ সুখে ঘরে থাকব বলতে পারিস?

তা যা বলিছিস, কুসুম কি যেন ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, থাক্ এসে পড়িচিস ভালই হয়েছে। চ দিকি দুজনে একবার মতিদের বাড়ী যাই। তাকে দিয়ে একবার ডাক্তারবাবুকে ডাক করাই?

ডাক্তারবাবুকে কেন রে, সৌরভ উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল, অসুখবিসুখ করেছে নাকি?

আঃ মর অসুখবিসুখ করতে যাবে কেন, কুসুম কহিল, সিদিন কথা হোল না যে মতিকে দিয়ে ডাক্তারবাবুকে ডাকিয়ে একবার তাদের খবর দেব?

ও হরি তাই বল, আঁচল দিয়ে পায়ের জল মুছিতে মুছিতে সৌরভ বলিল, কিন্তু তোমার মতিবিবি ভাগ গিয়া, তুমি যাবে কার কাছে?

কুসুম জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সৌরভের দিকে তাকাইল। সৌরভ বলিয়া উঠিল, পরশু রোজ তারিখে পঞ্চুবাবু এসেছিলেন।

মর্ পোড়ারমুখী, কুসুম কহিল, অম্‌নি ক'রে মেয়ে মানুষে সোয়ামীর নাম ধ'রে বলে বুঝি?

আর বলিস নি বাবা সোয়ামীর কথা, সৌরভ কহিল, এমন সোয়ামীর চেয়ে মেয়েমানুষের পর-পুরুষ নিয়ে ঘরকরা ঢের ভালো। মতিবিবি পঞ্চুবাবুর সঙ্গে উধাউ।

—বলিস্ কিরে!

—শুধু মতিবিবিই নয়। মাধবীরাণীও—

—সব ব্যাপার কি বলদিকি?

—কি ক'রবে, গাঁয়ে খেতে পাচ্ছে না ক'রবে কি। ওখানে মিলিটারীদের কাছে গেলে তারা খেতেও দেয় ভাল—আর পয়সাও দেয়। পঞ্চুবাবু যে এই ব্যবসা জুড়েছে।

কুসুম যেন রাগতভাবেই বলিয়া উঠিল, লোকটার কি জ্ঞান-গম্যি ব'লে কিছু নেই রে?

জ্ঞান, সৌরভ বলিল, ওসব লোক মরলে জ্ঞান হবে। আমার মতন বউকে যে একটা দিনের তরে সুখী করতে পারলে না সে আবার মানুষ কিরে? কাজেই সেই লোক যদি মেয়েমানুষের ব্যবসা না ক'রবে তো ক'রবে কে?

হুঁ, কুসুমের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল সমস্ত গ্রামখানার চেহারা।

প্রতি ঘরে স্ত্রীলোক আছে। প্রতি ঘরে মন্বন্তরের হাহাকার বিষাক্ত বাতাসের মত বহিয়া যাইতেছে। পঙ্কুর মত লোকেরও অভাব নাই। তবে কি পশ্চিমপাড়া গ্রামের প্রতি টি ঘরের মেয়েদের ভাগ্য ঐ একই পথে? কুসুম শিহরিয়া উঠিল। নিজের নিরাভরণ দেহের দিকে একবার তাকাইয়া নিয়া একটা বেদনাদায়ক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

বৃষ্টির বিরাম নাই। বাতাসের ঝাপটাও যেন ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে। কুসুম দাওয়া হইতে উঠিয়া ঘরে গেল। আর দেরী নয়—আর দেরী নয়। আর দেরী করিলে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে। সমস্ত রাগ গিয়া পড়ে বিজয়ের উপর। মানুষটা কি পাগল না নির্ব্বোধ? দেশের এমনিতরো অবস্থা অথচ সে বেশ বসিয়া আছে বাহিরে! সহসা তার মনে পড়ে, সে এখানে তার উপর রাগ করিতেছে, কিন্তু ওদিকে এমনও হইতে পারে তো যে লোকটা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে! বলা যায় না তো মানুষের আপদ-বিপদের কথা। তাই একদিকে গ্রামের, তাদের, তাদের চারিপাশের সর্ব্বত্র যখন মন্বন্তরের দাপাদাপি তখন আবার ওদিকে বিজয়ের শুভাশুভ কল্পনায় কুসুমের মনটা যেন হু হু করিয়া উঠিল। ঘর হইতে বাহির হইয়া দরজায় তালা লাগাইয়া কুসুম কহিল, জ্যাঠাইয়ের কাছে যাই। বুড়ীকেই পাঠাই একবার ডাক্তারবাবুর কাছে।

বেশ তোর টোকাটা নে, সৌরভ একেবারে টোকা মাথায় দিয়া উঠানে নামিয়া পড়িল। কুসুমও আর বিলম্ব করিল না।

পথে জল আর কাদা।

টোকা মাথায় দিয়া কুসুম ও সৌরভ কাদা প্যাচ্ প্যাচ্ করিতে করিতে চলিল দিগন্তবিস্তৃত ফসলের মাঠ। জলে সমুদ্র হইয়া উঠিয়াছে। জলের এই বিস্তৃতরূপ কি যেন এক উদার মহিমায় পরিপূর্ণ। পথে লোকজন নাই। শুধু তারা দুইজন যাত্রী। কুসুমের মনে প্রকৃতির এই

বর্ষণ-মুখর মূর্ত্তি আর সমুদ্র সমান মাঠের চেহারা বেশ গভীরভাবেই রেখাপাত করিল। কিন্তু মন্বন্তরের ক্রমবর্দ্ধমান বিস্তৃতি আর বিজয়ের অশুভ কল্পনায় মনটা তার এমনিই যেন কেমন ভারী হইয়া ছিল। তার উপর প্রকৃতির এই অপরিমেয় রূপরাশি তার মনে যে রেখাপাত করিল, সেই রেখাপাত তার অন্তরের গুরুভাবের উপরেই দাগ কাটিয়া গেল।

সৌরভ কিন্তু অন্যরকমের মেয়ে। প্রকৃতি তাকে হাতছানি দিয়া ডাকে। জীবনে ঘর বাঁধিতে সে পারে নাই। তাই বাহিরকে তার ভাল লাগিয়াছে। পথেঘাটে জলকাদা, মাঠের বুকে সমুদ্রের উচ্ছ্বাস, রক্তে যেন তার প্রচণ্ড কলরোল তুলিয়া দিল। আবেগময় ভাষায় সে আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

কুসুম ছপ্ ছপ্ করিয়া পা ফেলিতে লাগিল। মাথার উপর টোকায় বৃষ্টির জলতরঙ্গ।

সৌরভ সুন্দরী মেয়ে। তার আঁট-সাঁট দেহ। চোখে তার অকথিত ভাষা। বুকে তার অফুরন্ত ক্ষুধা। নিজের এই অবস্থা সম্বন্ধে সে রীতিমত সচেতন। স্বামী তার চরিত্রহীন লম্পট। স্ত্রীকে নিয়া ঘর করিতে সে অক্ষম। জীব-ধর্ম্মের নিয়মানুসারে যৌনবৃত্তির দিক হইতে সে বিপথগামী। স্ত্রীলোক তার ভাল লাগে না বরং স্ত্রীলোকদের প্রতি নির্ম্মমতায় সে নিষ্ঠুর হইয়া অন্য পুরুষ দিয়া তাদের উপর অত্যাচার করাইতেও আনন্দ পায়। তার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য সৌরভের কাছে একান্তভাবেই বেদনাদায়ক।

কিন্তু দুঃখ-বেদনা নিয়াই মানুষ জীবনের সমস্ত পথটুকু চলিতে পারে না। পথ তাকে খুঁজিতেই হয়। সৌরভও পথ খুঁজিয়া নিয়াছিল। কিন্তু দুঃখ ও বেদনা যাকে পাইতেই হইবে, তার জীবনে সুখের পথ কয়েক পদক্ষেপেই ফুরাইয়া যায়। সেইকথা মনে করিয়া সৌরভ যেন আরও মরিয়া হইয়া উঠে।

পথ চলিতে চলিতে সৌরভ বলিয়া উঠিল। কুসুম মাঠটা কেমন হয়েছে !

হুঁ, কুসুম বলিয়া উঠিল।

এমনিধারা দিন, সৌরভ বলিল, আর পুরুষমানুষ নেই ।! কথাগুলো বলিয়া ফেলিয়াই তার মনে পড়িল কুসুমেরও তো পুরুষ-মানুষ নাই। তাই সে নিজের আবেগকে একটু সংযত করিয়া কুসুমের সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, আচ্ছা কুসুম একটা কথা জিজ্ঞেস করব তোকে ?

—কি বল ?

—আচ্ছা পুরুষ মানুষ না নিয়ে তুই থাকিস্ কি ক'রে ভাই ?

কুসুম হাসিল।

—বল না ?

—আমি তো তোর মত পুরুষ মানুষের সঙ্গে ঘর করি নি কোন দিন।

ঐ যা বলিছিস্, সৌরভ বলিল, একবার ঘর করলে আর থাকা যায় না। আমার যে কি হয়েছে তা কি বল্‌ব !

মুখ টিপিয়া কুসুম প্রশ্ন করিল, কি হয়েছে ?

সবই তো জানিস্ ভাই, সৌরভ বলিতে লাগিল, ভেবেছিলুম শশীখুড়োর ছেলেকে নিয়ে হয়ত দিনগুলো ভালই কাটবে। কিন্তু তাকেও তো নিয়ে গেল জেলে।

কুসুম কহিল, তা হ'লে ওর সঙ্গে তোর ব্যাপার ছিল ?

ছিল বৈকি, সৌরভ চলিতে চলিতে বলিতে লাগিল, তা সে আমায় ভালবাসতে পারেনি। শুধু আস্‌তই যা।

কুসুম কৌতূহলের বশে জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁরে সেই যে একদিন শুনেছিলুম দীনু তোর ঘরে ছিল আর পঞ্চু শেকল তুলে দিয়েছিল, সে ব্যাপারটা সত্যি ?

সৌরভ হাসিতে হাসিতে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হুঁ-উ !

—লজ্জা করে না রে পোড়ারমুখি !

—লজ্জা আবার কি।

সত্যই, কুসুম ভাবিল লজ্জা আবার কি! নিজেকে বঞ্চিত করিয়া রাখার নাম যদি ভালমানুষী হয় তবে সে ভালমানুষীর দরকার কি? যাই হোক্ সে কথা না তুলিয়া বলিল, দীনু চলে যেতে তোর তা হ'লে বড় অসুবিধে হয়েছে বল্?

—সত্যিই আমার অসুবিধা হয়েছে। যদিও সে আমায় ভালবাস্‌তে পারেনি তাহ'লেও ঐ রকম জোয়ান ছেলে আমার ভারী পছন্দ।

—দীনু আর কাউকে ভালবাসে নাকি?

—না। ভ্যাখ মানুষ একবারই ভালবাস্‌তে পারে। সে ভালবেসে ছিল জঙ্গলপাড়ার সেই বউটাকে। কাজেই সে তা ভুলে যায় কি ক'রে?

—তা না হয় বুঝলাম। তুই আর কোথাও চেষ্টা করিস্ না!

একটা লোক তো কদিন যাতায়াত করছে, সৌরভ বলিতে লাগিল, শুনলুম কলকাতা থেকে নাকি দুটি বাবু এসেছে। তারা পঞ্চুবাবুকেও চেনে। আমাকেও নাকি দেখেছে। তারা চায় আমাকে। বলেছে যত চাল লাগে দেবে, পয়সা দেবে, কাপড় দেবে। তাদের হয়ে যে লোকটা আসে আমার কাছে, লোকটার নাম সতীশ না কি—সেই কথাবার্ত্তা চালাচ্ছে।

কুসুম কহিল, তোর শাশুড়ী কোথায়?

শাশুড়ী তো গেছে ছেলের সঙ্গে, সৌরভ বলিল, গেছে আমি বেঁচেছি। থাকলে আমার হাড় মাস ছিঁড়ে খেত।

চলিতে চলিতে কুসুম ভাবিতে লাগিল, সৌরভের কথা। কি করিয়া যে ইহারা পাঁচজনের সঙ্গে জুটিতে পারে তা বোঝা তার বুদ্ধিরও অগম্য।

জলে জলে বিজয়দের খোড়ো ঘরের ছাউনি একেবারে পচিয়া গিয়াছে। এখানে ওখানে কাঠবিড়ালী ও শালিক-ছাতারের ধান খোঁজার উৎপাতে চালের মধ্যে মধ্যে গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। জায়গায় জায়গায় সবুজ ধানের চারা

বাহির হইয়াছে। খড়-পচানি জল কাঠবিড়ালী ও পাখ-পাখালির অত্যাচারে সৃষ্টি হওয়া গর্ত্ত দিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া মেঝেয় পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। ঘরের দেওয়ালে জল লাগিয়া উত্তর দিককার দেওয়ালটা খানিকটা ধ্বসিয়া গিয়াছে।

দাওয়াটাও জলমগ্ন। বসিবার একটু ঠাঁই পর্য্যন্ত নাই। পাঁচনের রঙের মত খড় ধোয়া জল সারা দাওয়াটায় শুধু থৈ থৈ করিতেছে।

উপবাসে উপবাসে বনমালাটা যেন কি হইয়া গিয়াছে। চক্ষু কোটরাগত, সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। কুসুমের দেওয়া অর্থে তো আর প্রতিদিন চলে না। তাই সময় সময় খাওয়া হইলেও, তার অর্থ এই নয় যে তাইতেই মানুষ সোজা থাকিবে। সকাল হইতেই দাওয়ার এককোণে সে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। শাশুড়ী ঘরের এককোণে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় চুপচাপ পড়িয়া ছিল।

আকাশের এই দুর্য্যোগময় মূর্ত্তি বুঝি আর অন্তর্হিত হইবে না। লোকটাও সেই যে কবে গিয়াছে ফিরিবার আর নামটি পর্য্যন্ত নাই। এদিকে সবকিছু যাইতে বসিয়াছে। এইসব ভাবিতে ভাবিতে কখন বনমালার দুই চোখ সিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, অলক্ষ্যে কখন কয়েকটা ফোঁটা গালের উপর দিয়া গড়াইয়া গিয়াছিল তা সে বুঝিতেও পারে নাই।

সহসা সে চমকাইয়া উঠিল—কাদের যেন পায়ের শব্দ শোনা যাইতেছে।

বনমালা দেখিল আসিতেছে কুসুম ও সৌরভ। তাদের দেখিয়াই বনমালা বলিল, কিরে, তোরা এই এত জলে বেরিয়েচিস!

কুসুম একেবারে দাওয়ার কাছে আসিয়া কহিল, তোর একি ছিরি হয়েছে কদিনে!

ম্লানভাবে বনমালা হাসিল।

কুসুম দাওয়াটা জলে ভাসিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, একি হয়েছে রে?

আর বলিস নি, বনমালা এদিক ওদিকে তাকাইয়া কহিল, তোদের যে উঠে আসতে বলব তারও তো উপায় দেখছি না।

আচ্ছা তা না হয় না হ'ল, কুসুম কহিল, জ্যাঠাই কোথায়?

ঐ আধমরা অবস্থায় ঘরের এককোণে পড়ে আছে, বনমালা উঠিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল, কেন কি দরকার জ্যাঠাইকে?

ভেবেছিলুম একবার ডাক্তার বাবুর কাছে পাঠাবো, কুসুম বলিতে লাগিল, জ্যাঠা-ট্যাঠাকে তো একবার খবর দিতে হয়। তা নইলে এরকম ক'রে আর চল্‌বে কদ্দিন?

দরকার নেই—দরকার নেই, বনমালা ফুঁসিয়া উঠিল, মা-বউকে রেখে এলুম গাঁয়ে, এই বাজারে তাদের দিন চলবে কি ক'রে—এটুকু বোঝবার যাদের জ্ঞান নেই তাদের খবর দিয়ে লাভ কি?

এবার সৌরভ বলিল, আমিও সেই কথাই বলি। এই ছ্যাখনা, আমার মত একটা সোমত্ত বউকে ঘরে রেখে আমার সোয়ামী আর শাশুড়ী পালালো। আমার বয়ে গেছে তাদের খবর দেবার।

সৌরভের এই কথায় বনমালা ও কুসুম মুখ চাওয়াচায়ি করিল। অর্থাৎ তার অর্থ এই যে কিসে আর কিসে সৌরভ তুলনা করিতেছে। সৌরভের কথাই স্বতন্ত্র।

কুসুম কহিল, তা হ'লে জ্যাঠাই যেতে পারবে না কি বল?

উঠতেই পারবে না, বনমালা কহিল। কুসুম কহিল, আর দুদিন এরকমভাবে চল্‌লে তোরও অবস্থা হবে অমনি। তা তুই এভাবে না থেকে চল্‌দিকি আমাদের সঙ্গে। চ আজ দুপুরে তিনজনে রান্নাবান্না করে খাইগে।

বনমালা হাসিল।

হাসছিস যে, কুসুম কহিল, বুঝতে তো পারছি শেষ পর্য্যন্ত কি হবে। সেই যখন মরতেই হবে সবাইকে তখন মরার আগে একবার বাঁচার আনন্দ ভোগ ক'রে নিই।

বনমালা কহিল, তবে দাঁড়া শাশুড়ীকে একবার বলে যাই।

পরক্ষণেই শাশুড়ীকে বলিয়া আসিয়া বনমালা কুসুম ও সৌরভের সহিত বাহির হইয়া পড়িল।

আবার সেই পথ।

১৭

হরিহর হাসপাতাল হইতে বাহিরে আসিয়াছে।

কথা ছিল বাহিরে আসিলেই সে বিজয়ের সহিত গ্রামে যাইবে। কিন্তু গ্রামে সে যাইতে পারে নাই। শ্রীরামপুরে তার বহু কাজ। আসামের প্রান্তরে যুদ্ধ চলিতেছে আর এদিকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বহু দূরে দেশ চলিয়াছে ভাঙনের পথে। যুদ্ধ, দুর্ম্মূল্যতা, চোরাকারবার দুর্ভিক্ষ—এই সমস্তই মিলিয়া দেশে এক অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এ অবস্থায় রণক্ষেত্রে শত্রু-সৈন্যকে বাধা দেওয়া যায় না, সে দেশে ঢুকিয়া পড়িবেই। তাই সেকথা উপলব্ধি করিয়া অন্ততঃপক্ষে যাতে শিল্পাঞ্চলগুলিও তৈরী থাকিতে পারে তার জন্য এইসব এলাকায় প্রাণপণে সংগঠনের কাজ চলিয়াছে।

হরিহর শ্রমিকদের মধ্যে খুব প্রিয়। তা ছাড়া তার সংগঠন ক্ষমতা ও প্রত্যেকটা ছোটখাটো সংগ্রামে নেতৃত্ব করিবার কৌশল এত সুন্দর যে দেখিয়া শুনিয়া প্রত্যেকটি শ্রমিক মুগ্ধ হইয়া যায়। তাই হরিহরের আর কোথাও যাইবার যো নাই।

হরিহর যখন যাইবে বলিয়াও যাইতে পারিল না এবং শহরেই কাজের মধ্যে আটকাইয়া পড়িল তখন বিজয় হতাশ হইয়া গেল। তার মন আর শহরে টিঁকিতে চাহিল না। গ্রামে যে কি হইতেছে তা কে জানে!

একদিন বিজয় সকাল সকাল ঘুম হইতে উঠিয়া সোজা অফিস হইতে হরিহরের বাসায় আসিয়া তাকে কহিল, হরিহর আমি অনেক আশা করেছিলুম কিন্তু তুই তো গেলি না। তা আমি আর এখানে থেকে কি ক'রব বল্ দিকি?

হরিহর কহিল, গাঁয়ের দিকে মন টান্‌ছে?

মন টানা নয় শুধু, বিজয় ক্ষুণ্নভাবে কহিল, ছাখ, এখানে একটা না একটা কিছু হচ্ছেই। গ্রামে কিছু হচ্ছে না। তা ছাড়া যে অবস্থায় সবাইকে রেখে এসেছি তা আর কি বল্‌ব। এক তো চাল চাল ক'রে হাহাকার সুরু হয়ে গেছে দেখে এসিছি। তারওপর তাদের হাতে তেমন পয়সাকড়িও দিয়ে আস্‌তে পারি নি।

তা এ অবস্থায় এলি কেন, হরিহর যেন একটু বিরক্তভাবেই বলিয়া উঠিল।

কেন যে সে আসিয়াছিল তা সে নিজেই ভালভাবে জানে না। প্রথমতঃ আহত হরিহরকে তার দেখিতে আসিবার প্রয়োজন ছিল, দ্বিতীয়তঃ সে আসিয়াছিল সীতার কঙ্কাল মাটির ভিতর হইতে উঠায় গ্রামের যে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তার হাত হইতে খানিকটা নিষ্কৃতি পাইবার জন্য এবং খানিকটা নিজে শান্তি পাইবার জন্য।

এইভাবে আসিয়া এখানে সে এমনভাবে জড়াইয়া পড়িবে তা সে ভাবে নাই। প্রথম দিকে সে এক নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়া ইহাদের সহিত কাজে নামিয়া পড়িয়াছিল।

এখানের কাজেরও কেমন যেন একটা মাদকতা ছিল। দেশ, জাতি, সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, দেশরক্ষা, মুক্তিযুদ্ধ তার গ্রাম্য-জীবনের অভিজ্ঞতার বাহিরে এইসব কথাগুলি—এগুলির অর্থ সে ঠিক ঠিক ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। সেজন্য তার মুস্কিলও হইয়াছে। সে শহরের কাজ হইতেও সম্পূর্ণভাবে আলাদা হইয়া থাকিতে পারিতেছে না এবং শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি, সর্ব্বদলের সম্মিলিত খাদ্য আন্দোলনে কিম্বা কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের দ্বারা ফ্যাসিস্ট শত্রুদের প্রতিরোধ, সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বদলে জাতীয় সরকার প্রভৃতির প্রচার ও সংগঠনে লাগিয়া থাকিতেছে।

কিন্তু তবু যেন বিজয়ের কোথায় একটা ফাঁক রহিয়া যাইতেছে। শুধু সে গ্রামে ফিরিয়া যাইতে চায় বলিয়াই যে শহরের ঐসব কাজে ভাল করিয়া মন দিতে পারিতেছে না তা নয়। আসলে সে গ্রামের মানুষ, গ্রামের মানুষ শহরে

আসিয়া শহর জীবনের গতি-ধারার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারে নাই। মাছ জল হইতে উঠিলে যেমন হয়, যদিও সে উদাহরণটা এখানে ঠিক হইবে না, তবে অবস্থা তার প্রায় সেই রকমই। আসলে কথা হইতেছে 'বন্যেরা বনে সুন্দর—শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'। গ্রামের মানুষ শহরে আসিয়া জীবনধারার সহজ গতি খুঁজিয়া পাইতেছে না। শহর জীবনের সব কিছুতেই যেন কেমন একটা তীব্র গতিবেগ। এই গতিবেগ গ্রাম্য জীবনে নাই। তাই তাল রাখিয়া তার সহিত চলাও কঠিন।

এইসব নানা কারণে বিজয়ের প্রথম দিককার উৎসাহ-উদ্দীপনায় যেন খানিকটা ভাঁটা পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। সর্ব্বদাই সে যেন কি ভাবে। অবসর সময়ে তাই সে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। ঘনশ্যাম জ্যাঠারও যেন কি হইয়াছে। বুড়া সাংসারিক জীবনের আস্বাদ হয়তো ইদানীংকার জীবনে পায় নাই—তাই এখানে পুত্র, পুত্রবধু, নাতি নাতনী পাইয়া, ইহাদের মধ্যে আজকাল সে ডুবিয়া থাকে।

সেদিন ছুটির বার। ভোর ভোর উঠিয়াই দলের অফিস হতে বিজয় বাহির হইয়া পড়িল। এখানে আসিয়া ঘনশ্যাম জ্যাঠার বড় ছেলে কিঙ্কর ও শম্ভুর সহিত সে বড় একটা দেখা সাক্ষাৎ করে নাই। বরং তারা দুই ভাইয়ে দু-একবার আসিয়া হরিহরের বাড়ীতে দেখা করিয়া গিয়াছে। কাজেই তাদের দিক হইতে তারা কর্ত্তব্যে কোন ত্রুটি করে নাই—ত্রুটি করিয়াছে বরং বিজয়ই। সেজন্য বিজয় তাদের সঙ্গে একবার দেখা করিতে গেল।

কিঙ্কর ও শম্ভু প্রায় পাশাপাশিই বাস করে। কিঙ্করের বাসায়, খুঁজিয়া খুঁজিয়া সে উপস্থিত হইলে শম্ভুও আসিয়া সেখানে জুটিল।

কিঙ্করের তিন চারিটি ছেলে মেয়ে। ছেলেগুলার আটদশ বছর করিয়া বয়স হইয়াছে। কিন্তু হরিহরের ছেলেমেয়ের মত ইহারা সভ্য নয়। উলঙ্গ অবস্থায় উঠানে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। প্রথমটায় বিজয়কে অপরিচিত দেখিয়া কাছে ঘেঁসিলনা কিন্তু একটু পরেই আসিয়া পয়সা চাহিল। ঘর হইতে

তাদের মা চাপাগলায় চীৎকার করিয়া গালাগালি দিল। বিজয়ের কাছে তখনও কয়েক আনা খুচরা পয়সা ছিল। তা হইতে এক আনা করিয়া সকলের হাতে দিল। ইহাদেরই মুখে খবর পাইয়া শম্ভুর একটি ছেলে আর একটি মেয়ে, তারাও পয়সার লোভে আসিয়া দাঁড়াইল।

কিঙ্করের বড় ছেলে কহিল, কাকা এরা পয়সা চাইছে।

শম্ভু চোখ পাকাইয়া বলিয়া উঠিল, খবরদার!

ছেলে মেয়ে দুটা পিছাইয়া গেল। বিজয় যদিও মনে মনে বিরক্ত হইয়াছিল, তবুও মুখে প্রশান্তভাব বজায় রাখিয়া ছেলে মেয়ে দুটার দিকে হাত বাড়াইয়া দুটা আনি দিয়া কহিল, নাও—

ছেলে মেয়ে দুটা বাপের মুখের দিকে তাকাইল। বিজয় বলিল, নাও বাবা কিছু বলবে না।

তারা এবার সাহস করিয়া আগাইয়া আসিল। আড়চোখে একবার বাপের মুখের দিকে তাকাইয়াও নিল। শম্ভু কহিল, নাও আর কি হবে। আর কক্‌খনো যেন এমন না দেখি।

আনি দুটা দুইজনে নিয়া ঝটিতি সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

কিঙ্কর কহিল, বাঁচ্‌ল।

সবাই হাসিয়া উঠিল।

এ-কথায় সে-কথায় বিজয় শেষ পর্য্যন্ত উহাদের দুই ভাইকে প্রশ্ন করিয়া বসিল, হ্যাঁরে তোরা আর কেউ দেশে ফিরবি না?

কিঙ্কর কহিল, কি ক'রে যাই বল্‌?

কেন, বিজয় প্রশ্ন করিল, এই যে যারা ইছেপুর, কাশীপুর রাইফেল ফ্যাক্টরীতে কাজ করে তারাও তো হপ্তায় হপ্তায় বাড়ী যায়, আবার আসে।

—তা যাবে না আসবে না কেন। তাদের সবই গাঁয়ে পড়ে আছে। আমাদের সেখানে কি আছে বল্‌?

কিছু যে ইহাদের গাঁয়ে নাই তা বিজয়ও জানে। তবু সে কহিল, হাজার হোক্ সে তো তোদের জন্মস্থান।

শম্ভূ কহিল, তা ঠিকই কিন্তু জন্মস্থান আমাদের আর ঠাঁই দিলে কই ?

কোথায় যেন ইহাদের একটা পুঞ্জীভূত অভিমান। সে অভিমানের পাষাণ ঠেলিয়া নড়ানো যাইবে না, কারণ গেলে এতদিন নিশ্চয়ই যাইত—তাই বিজয় সেদিক দিয়া না গিয়া সোজাসুজি কহিল, গেলে ঠাঁই ঠিকই মেলে—এত মানুষের ঠাঁই হচ্ছে আর তোদের হত না ?

সেকথা অবিশ্যি আলাদা, কিঙ্কর কহিল, গাঁয়ে আমরা খাব কি বল্ ? না আছে তেমন জমি, না আছে তেমন পয়সা কড়ি। এখানে এ আমরা বেশ আছি।

হয়ত হইবে, ইহারা বেশই আছে। শহর জীবনের স্রোতোধারা ইহাদের ভাসাইয়া নিয়া চলিয়াছে, কাজেই গ্রাম্য-জীবনের টান ইহাদের টানিতে পারিবে কেন ? আরও নানারকম কথাবার্তা হইবার পর একসময়ে বিদায় নিল বিজয়। সময় মত হরিহরের বাসায় না আসিলে আবার তার বউটার নানারকম ঝঞ্ঝাট বাড়িবে !

কিঙ্করের বউ বিজয়কে চলিয়া যাইতে দেখিয়া শম্ভূর উদ্দেশ্যে কহিল, ঠাকুর-পো জিগ্যেস কর না বোনের সেই যে হাড় কখানা মাটি থেকে পেয়েছিল, তা কি হ'ল ?

কিঙ্করের বউ যথেষ্ট জোরে বলিয়াছিল, বিজয়ের শুনিতে আদৌ অসুবিধা হইল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে সে বুঝিয়া নিল যে, কথাটা ইহারাও আলোচনা করিয়াছে। তাই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সে কহিল, ঠাকুর মশাইয়ের বিধেন অনুযায়ী পুড়িয়ে দিয়েছি।

—তারপর ?

—ত্তেরাত্তির ওষুধ হয়েছিল আর কি।

—ও !

বিজয় পথে বাহির হইয়া পড়িল।

পথে বাহির হইয়া খানিকটা আসিতে না আসিতেই এক কাণ্ড ঘটিল। পথের পাশে একটা বাড়ী হইতে রেডিওর সংবাদে সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। রেডিওর বক্তা বলিতেছিলেন—'দামোদরের বাঁধ ভেঙে দুই তীর প্লাবিত হয়ে গেছে। বিশ ফুটেরও বেশী উঁচু জল গ্রামাঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে গেছে।' এই আওয়াজ কানে আসিতেই সে পথের উপর থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। দামোদরের দুই তীর প্লাবিত হইয়া গিয়াছে—বিশ ফুটেরও বেশী উঁচু জল গ্রামাঞ্চলের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু কোথায় বাঁধ ভাঙ্গিয়া দুই তীর ভাসিল, কোথায় জল বিশ ফুটেরও বেশি উঁচু হইয়া গ্রামাঞ্চলের উপর দিয়া বহিয়া গেল?

সোজা তার মন ছুটিয়া গেল পশ্চিমপাড়ার গ্রামখানির সর্ব্বত্র। সেই দামোদরের সহিত সংযুক্ত খাল, সামনে ধূ ধূ করা মাঠ, তারপরই দিকচক্রবালের দিগন্ত রেখার মত বাঁধের সীমাহীন গতি। তার দেশ জলের দেশ, বন্যার দেশ। প্রতিবৎসর পশ্চিমপাড়া ভাসিয়া যায়, বিস্তৃত জলরাশির ক্রুদ্ধ-গ্রাসে মানুষ পরিত্রাহি চীৎকার করে। তাই রেডিওয় দামোদরের কথা শুনিয়া সে জলপ্লাবনের সীমানাটা কোথায় তা জানিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

পরক্ষণেই রেডিওর আওয়াজ হইল, 'সুদূর বর্দ্ধমান থেকে হুগলী জেলার চাঁপাডাঙ্গা পর্য্যন্ত জলরাশি বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। প্রায় বারো লক্ষের মত লোক এই ভয়াবহ প্লাবনের করাল গ্রাসের মধ্যে পড়েছে। বর্দ্ধমানের দক্ষিণে শক্তিগড় ও গাঙপুরের কাছে রেল লাইন সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। সরকার নৌকা এবং দ্রুতগামী জলযান প্রভৃতির দ্বারা প্লাবিত অঞ্চলের বাসিন্দাদের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ব্যাপৃত আছেন।'

বিজয় চমকাইয়া উঠিল। বর্দ্ধমান হইতে হুগলী জেলার চাঁপাডাঙ্গা পর্য্যন্ত জলে ভাসিয়া গিয়াছে। কথাটা শুনিবামাত্র তার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।

বারো লক্ষের মত মানুষ এই ভয়াবহ প্লাবনের মধ্যে পড়িয়াছে। কে জানে তার গ্রাম, তার প্রিয় জন্মভূমি পশ্চিমপাড়ার অবস্থা কি। মনে মনে সে জানে, পশ্চিমপাড়া কোন বন্যা হইতে বাদ যায় নাই, হয়ত এ বন্যা হইতেও বাদ পড়িবে না। কিন্তু তবু যেন কোথায় একটা ক্ষীণ আশা, পশ্চিমপাড়া নাও ভাসিতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হয়—উত্তরে বর্দ্ধমান ভাসিয়াছে, দক্ষিণে চাঁপাডাঙ্গা ভাসিয়াছে আর পশ্চিমপাড়া তার মধ্যে অবস্থিত হইয়াও যে ভাসিবে না, ইহা হইতেই পারে না।

পথে সে আর দেরী করিল না। তার পায়ে যতটা জোর ছিল তা সমস্তই কেন্দ্রীভূত করিয়া যেন সে চলিতে লাগিল। হরিহরের বাসায় গিয়া সে খবরটা দিবে শুধু, তারপর ঘনশ্যাম জ্যাঠা যাক্ আর না যাক্, সে কোনরকমে দুপুরের ট্রেনটা ধরিয়া তারকেশ্বর অভিমুখে রওনা হইয়া যাইবে। পশ্চিমপাড়া —তার প্রিয় জন্মভূমি পশ্চিমপাড়া আজ বন্যা-বিপন্না।

পথে চলিতে চলিতে তার অনেক কথাই মনে পড়িল। মনে পড়িল মায়ের কথা, বনমালার কথা আর তার প্রিয়-বান্ধবী কুসুমের কথা। পশ্চিম-পাড়া জলের দেশ, বন্যার দেশ—কে জানে সেই জল-জল্‌তা দেশে তারা কেমন আছে।

পথে দলের অফিস পড়ে। হরিহর অফিসে আছে কিনা একবার তা দেখিয়া নিল। অফিসে তখন সেই বি-এ পাশ ছেলেটি, অমর ছাড়া আর কেহ ছিলনা। সে বসিয়া বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল। বিজয় কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই সে মুখ তুলিয়া বলিল, দেখেছেন বিজয়দা দামোদরে কি রকম বন্যা হ'য়ে গেছে।

লিখেছে নাকি কাগজে, বিজয় উদগ্রীব হইয়া প্রশ্ন করিল।

অমর কহিল, হ্যাঁ।

দেখি দেখি, বিজয় অমরের হাত হইতে প্রায় খবরের কাগজখানা একেবারে ছিনাইয়া নিল। অনভ্যস্ত কৃষক-চোখ তার, ভুল ও বেতালা উচ্চারণে

সবেগেই সে পড়িয়া যাইতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে সে বলিয়া উঠিল, কই রেডিওতে এসব কথা বল্‌লে না তো ?

—রেডিওয় বন্যার কথা বল্‌লে নাকি আজ ?

—হ্যাঁ।

অমর যেন স্বগতোক্তির মত বলিয়া উঠিল, তাহ'লে কাল বন্যার খবর দেয়নি রেডিওয়।

—কি জানি আজকে তো দিলে।

—ওরা এমনি দেরী করেই দেয়।

—কিন্তু খবরের কাগজের থেকে অনেক মিথ্যে কথা বল্‌লে তো রেডিওয়।

—তাই নাকি ?

—বল্‌লে নৌকো আর আরও কত কি দিয়ে লোকেদের সাহায্য করা হচ্ছে। অথচ খবরের কাগজে লিখ্‌ছে কোন সাহায্যের ব্যবস্থাই নেই সেখানে !

—রেডিওয় ঐরকম বাজে খবরই দেয়।

খবরের কাগজটা ফেলিয়া দিয়া বিজয় বলিয়া উঠিল, কিন্তু আমাদের ওদিককার কোন কথা তো লেখে নি।

কি ক'রে লিখ্‌বে, অমর কহিল, বিজয়দা খবরের কাগজের সংবাদ-দাতারা যে শহরেই থাকেন বেশি। গ্রামাঞ্চলের খবর তাঁরা পাবেনই বা কি ক'রে আর পাঠাবেনই বা কি ক'রে ?

আচ্ছা, বিজয় যেন কি বলিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। তারপর কহিল, আমি চল্‌লুম। হরিহর যদি এসে পড়ে তাকে এখুনি বাড়ী যেতে বলবেন একবার।

বাড়ীতে আসিয়া হরিহর ও ঘনশ্যাম দুইজনকেই বিজয় পাইল। একে একে বন্যার খবর বলিয়া তারপর কহিল, আমি কিন্তু আর একদণ্ডও থাকতে পারব না জ্যাঠা। ঠাকুরের গাড়ীতেই যাব।

বন্যার সংবাদ শুনিয়া ঘনশ্যামের মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল। তার উপর বিজয়ের এই অতিরিক্ত উৎসাহ দেখিয়া সে রীতিমত বিরক্তভাবেই কহিল, হ্যাঁরে দেশটা কি তোর একারই বিজয় ?

এরকম কথা শুনিবার জন্য বিজয় প্রস্তুত ছিল না। কেমন যেন একটু আহতও হইল। দেশ তার একার এমন কথা সে মনেও স্থান দেয় না এবং তার মনে তেমন অহঙ্কারও নাই। তবে দেশকে ভালবাসিবার আগ্রহে তার বৈশিষ্ট্য আছে। প্রচণ্ড আবেগ নিয়া দেশকে সে ভালবাসিয়াছে। আর তারই আবেগে সে ঐভাবে যাইবার কথাটা বলিয়াছে। তা ছাড়া তার মনে মনে কেমন যেন একটা রোমাঞ্চকর চেতনা ছিল। সেদিন দলের অফিসে বসিয়া বসিয়া একটি ছেলে গান করিতেছিল, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে—তবে একলা চল রে।' সেই গানটি তার মনের মধ্যে যেন প্রেরণার উৎসরূপে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে সেই আবেগ দেখিয়া ঘনশ্যাম অমন করিয়া তার উপর বিরক্তি প্রকাশ করিল কেন ?

অফিসে একদিন ঠিক এইরূপ কথাই আলোচনা হইতেছিল। তার মনে পড়িয়া গেল মণিবাবু বলিতেছিলেন, 'সেই হচ্ছে সত্যিকারের স্বদেশপ্রেমিক যে নিজেই শুধু এগিয়ে যায় না, সঙ্গে সঙ্গে অপরকেও টেনে নিয়ে যায়। নেতা যাত্রাদলের সেনাপতির মত লম্ফ-ঝম্ফ ক'রে হাততালি পেতে পেতে এগিয়ে যাবে আর দেশের জনসাধারণ দর্শকের মতো চুপ ক'রে বসে থাকবে তা কখনও করা উচিত নয়। আমাদের কথাই হচ্ছে—দু-পা এগুবে এক-পা পিছিয়ে আসবে। তাহ'লে দেশের জনসাধারণকেও তোমার যাত্রাপথে টেনে নিয়ে যেতে পারবে।' এই কথাটাই বিজয়ের ভাবা উচিত ছিল।

আবেগের সহিত সে অনেকখানি আগাইয়া পড়িয়াছিল এবং তার ফলে ঘনশ্যামের মনের নাগাল হইতে সে দূরে সরিয়া গিয়াছিল। তাই সে অমন করিয়া তাকে আঘাত দিয়া বলিয়াছে, দেশ কি তোর একারই রে।

যাইহোক কথাটা সে মানাইয়া নিয়া কহিল, না তা নয়। তবে, যেতে তো হবে সেখানে!

—তা যাব!

বিজয় কথাটাকে চাপা দিবার উদ্দেশ্যে সোৎসাহে বলিল, ব্যস্—ব্যস্।

হরিহর বিজয়কে একদিকে বসাইয়া অনেক কথা গুছাইয়া বলিয়া দিল। যদি বন্যার তেমন অবস্থা দেখিস্ তো সোজা এখানে চলে আসবি। কিছু একটা করতে তো হবে।

হ্যাঁ, বিজয় দুপুরের ট্রেনে তারকেশ্বর যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

হরিহরের বউ আসিয়া কহিল, কিন্তু না খেয়ে আমি যেতে দোবনা!

বিজয় কহিল, মনে থাকে ট্রেন ধরতে হবে।

ছেলে মেয়ে দুটা আসিয়া বিজয়ের হাত ধরিয়া বলিল, বিজয় কাকা চ'লে যাবে।

—হ্যাঁ।

বাড়ীটায় কেমন যেন একটা বিষাদ ছায়া নামিয়া আসিল।

এবারের জলপ্লাবন সাধারণ জলপ্লাবন নয়।

একে দামোদর পার্ব্বত্য নদ, তার উপর আবার একটি পার্ব্বত্য স্রোত-ধারার সহিত সংযুক্ত। উপর্য্যুপরি কয়েকদিন ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য অঞ্চলে ভীষণ বারিপাত হয় এবং সেই বারিপাতের জলধারা দামোদর ও বরাকর এই দুইটি পথ বাহিয়া ছুটিয়া আসে। আসানসোলের ক্রোশ ছয়েক উত্তরে বরাকর রেলওয়ে স্টেশনের নিকট যেখানে এই দুটি স্রোত-ধারা একত্র আসিয়া মিশিয়াছে, সেখানে দুই পার্ব্বত্য জলধারার উন্মত্ত মিলনে রুদ্র দামোদর একেবারে সংহার মূর্ত্তিতে ছুটিয়া আসিয়াছিল।

দামোদরের সেই দুর্ব্বার গতি 'শয়তানের শৃঙ্খলে'—কাণা দামোদরের বাঁধ এবং দামোদরের সাধারণ বাঁধে ধাক্কা খাইয়া আরও দুর্ব্বার হইয়া উঠিল।

বাঁধাবন্ধহারা উন্মত্ত জলস্রোত লক্ষ-কোটি ক্রুদ্ধ সর্পের মত ফণা বিস্তার করিয়া ছুটিতে লাগিল।

বর্দ্ধমানের কাছে আসিয়া সেই হিংস্র জলরাশি আর আপনার লোভাতুর বাসনা রুখিয়া রাখিতে পারিল না—তীব্র আবেগে সবকিছু ভাঙিয়া চুরিয়া, গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড পার হইয়া, ই-আই রেলের লোহার পাটিকে ভাসাইয়া নিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে কালনা ও হুগলীর পথে ছুটিয়া গেল। শুধু জলের গতি এই একদিকেই গেল না দক্ষিণ-পশ্চিমের পথে হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার দিকেও ছুটিয়া গেল। বেগুয়া, মুণ্ডেশ্বরী, রত্নাকর ও দারকেশ্বর উপচাইয়া গেল। মূল জলস্রোতের সহিত এই উপচানো জলরাশির মিলনে বিস্তীর্ণ এক ভূখণ্ড জলে জলে সমুদ্র হইয়া গেল।

লোকের ঘর দোর, বনজঙ্গল, পথ-প্রান্তর সব কিছু জলে জলে থৈ থৈ করিতেছে। আর তার মাঝে বন্যাপীড়িত মানুষের হাহাকার আকাশ-বাতাস পর্য্যন্ত ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছে।

পশ্চিমপাড়ার চারিদিকেই জল। পূর্ব্বদিকেও তারকেশ্বর অবধি জল গিয়াছে। যে যেমন করিয়া পারিয়াছে ডাঙ্গার দিকে পালাইয়া গিয়াছে। তারকেশ্বর স্টেশন, তারকেশ্বরের প্রায় সমস্ত জায়গাই বন্যাপীড়িতদের ভিড়ে ভরিয়া গিয়াছে।

অপরাহ্ণ বেলায় ঘনশ্যাম ও বিজয় তারকেশ্বরে আসিয়া পৌঁছিল। চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল—শুধুই ধূ ধূ করা বিস্তীর্ণ জলরাশি। একটু পথ নয় যে সাঁতরাইয়া চলিয়া যাইবে। দীর্ঘ পাঁচ ক্রোশ পথ। এই বিস্তীর্ণ এলাকা সাঁতরাইয়া যাওয়া যায় না। তাও যদি একটানা স্রোত হইত তা হইলেও না হয় কথা থাকিত। বন্যার জলের কোথায় কেমন স্রোত তা বোঝা দুষ্কর।

বিজয় কহিল, কি ক'রবে গো জ্যাঠা?

ঘনশ্যাম কহিল, উপায় তো কিছু দেখ্‌ছি না।

—কিন্তু চেষ্টা তো কিছু একটা ক'রতে হয়।

—তা তো ক'রতে হয়। কিন্তু নৌকো বা শাল্‌তি ছাড়া এই বানের জলে কি ক'রে যাওয়া যেতে পারে ?

—এসো না একটা নৌকোই দেখি।

—কোথায় দেখি বল্‌ ?

—চল না ঘুরে-ঘারে দেখি।

—বেশ চল্‌।

এদিক ওদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া তারা নৌকার সন্ধান করিতে লাগিল। চারিদিকে বন্যাপীড়িত মানুষ থৈ-থৈ করিতেছে। তাদের দেখিলে চোখ ফাটিয়া জল আসে। গৃহস্থালীর জিনিসপত্র, ছেলেপিলে গরুবাছুর নিয়া যে যেখানে পারিয়াছে আশ্রয় নিয়াছে। জলকাদা, ভাত-তরকারী, মলমূত্র, গোবর-চোনা সবই প্রায় পাশাপাশি—দেখিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। এই বুঝি বা মহামারী বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তবু বন্যাপীড়িতদের এমনি করিয়াই কাটাইতে হয়।

চারিদিকে নৌকার সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ একজায়গায় আসিয়া হরিপদর ভাই-ঝি মতি ও বিষ্ণুর বোন মাধবীর সহিত দেখা হইয়া গেল। রাস্তার ধারে একটা বাঁধানো চাতালের একদিকে তারা দুইজনে দুইটা গাঁটরির উপর বসিয়া আছে। হঠাৎ তাদের দেখিলে চেনা যায় না। মনে হয় কোন বড় ঘরের মেয়ে। দিব্যি দামী শাড়ী তাদের পরণে, হাতে সোনার চুড়ি, কানে সোনার দুল। ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া খোঁপা বাঁধা। তাদের এভাবে দেখিবার কল্পনা ওরা করে নাই।

বিজয় প্রথমটায় ভাবিল, এড়াইয়াই চলিয়া যাইবে এবং তদনুযায়ী ঘনশ্যামকে কথাটা বলিলও। ঘনশ্যাম ইতঃস্তত করিল। কে জানে এতবড় প্লাবনে, উহাদের যে কোন ক্ষতি হয় নাই তাই বা বুঝা যাইবে কি করিয়া ? যদি কোন ক্ষতি হইয়া থাকে তা হইলে উহাদের দেখিয়া এড়াইয়া যাওয়া ঠিক

হইবে না—কারণ তা মানুষের কাজ নয়। এইসব কথা ভাবিতে ভাবিতে যে সময়টুকু অতিবাহিত হইয়া গেল, তারই মধ্যে মাধবী একেবারে সাম্‌নে আসিয়া বিজয়কে বলিয়া উঠিল, কি গো বিজয়দা তোমরা কোত্থেকে ?

বিজয় কহিল, তোমরা ?

মাধবী বলিল, আমরা তো আস্‌ছি ভদ্দেশ্বর থেকে—

ভদ্দেশ্বর থেকে, ঘনশ্যাম ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল।

মাধবী কহিল, সে কথা আর কেন জিগ্যেস্‌ করছ জ্যাঠা ?

বিজয় ও ঘনশ্যাম দৃষ্টি বিনিময় করিল।

পায়ে পায়ে মতি আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে কহিল, তোমরা কি গাঁয়ে যাবে নাকি গা ?

মতি হরিপদর ভাই-ঝি। হরিপদ ঘনশ্যামকে জ্যাঠা বলে। কাজেই সেই সূত্রে তার ভাইঝির সহিত ঘনশ্যামের নাতনী সম্বন্ধ হইবে। নাতনী সম্পর্ক ধরিয়াই ঘনশ্যাম কহিল, হ্যাঁ গো।

মাধবী হাসিয়া উঠিল।

ঘনশ্যাম কহিল, তা তোমাদের সঙ্গে আছে কে ?

মাধবী ও মতি মুখ চাওয়াচায়ি করিল। মাধবী মতির গা টিপিয়া বলিল, —[না।

বিজয় ব্যাপারটা অনুমান করিল। মাধবী ও মতির সম্পর্কে সে সবই জানে এবং ইহারা ভদ্রেশ্বর হইতে আসিতেছে—কাজেই এই ভদ্রেশ্বর যাওয়া ও ভদ্রেশ্বর হইতে আসা ইহা যে বিনা কারণেই হইতেছে তা নয়। তবে কারণ সে যাইহোক্‌, সেই কারণের মধ্যে গ্রামের দুটি মানুষই শুধু জড়িত থাকিতে পারে এবং সে দুটি মানুষ হইতেছে পঙ্কু ও বলাই। তাই সে কহিল, কে নয় শুধু জ্যাঠা—কে কে আছে ?

মাধবী বিজয়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিল। মতি কহিল, আমাদের সঙ্গে আছে পঙ্কুদা আর বলাই।

হুঁ-উ, বিজয় হাসিয়া উঠিয়া ঘাড় নাড়িল।

ঘনশ্যাম কহিল, তা এখন সব গাঁয়েই যাওয়া হবে তো?

—তা বৈকি।

—কিসে যাওয়া হবে?

—নৌকোয়।

—নৌকো কোথায়?

—পঞ্চুদা আর বলাই নৌকো আন্‌তে গেছে।

ঘনশ্যাম কহিল, তা হ'লে তো ভালই হয়েছে। আমরা এদের নৌকোতেই তো যেতে পারি!

অন্য সময় হইলে বিজয় হয়ত বলিত, প্রয়োজন নাই কিন্তু এখন পৌঁছানোর গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সে কহিল, বেশ তো।

ঘনশ্যাম মতির উদ্দেশ্যে কহিল, কি গো নাতনি আপত্তি নেই তো?

—আপত্তি আবার কিসের!

কিছুক্ষণ পরে পঞ্চু ও বলাই নৌকা নিয়া আসিলে তাদের সহিত ঘনশ্যাম ও বিজয় নৌকায় উঠিয়া বসিল। নৌকা প্রথমে উত্তর দিকে গেল। খাড়াই নৌকা পাড়ি দিবার সামর্থ্য কারো নাই। দামোদরের দুর্ব্বার জলস্রোত মোচার খোলার মত নৌকাকে কোথাও ভাসাইয়া-ছুটাইয়া নিয়া গিয়া তুলিবে। তাই মাঝি প্রথমে তারকেশ্বরের উত্তরে কালিকাপুরের দিকে নিয়া যাইতে লাগিল।

বিজয় কহিল, ওদিকে নিয়ে যাচ্ছো কেন মাঝি?

মাঝি কহিল, ওদিকে না গেলে দামোদর পার হব কি ক'রে? যা স্রোত, ঠেলে যাওয়া যায় না। জল যেন কল্ কল্ ক'রে ছুটে চলেছে। এমন বন্যে আর কখনো হয়নি।

তখন অপরাহ্ণ শেষ হইয়া সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিতেছিল। দিগন্ত

বিস্তৃত সেই অসীম জলরাশির বুকে অন্ধকারের বুক চিরিয়া তাদের নৌকা চলিতে লাগিল।

তারপর দুর্ব্বার দামোদরের বুকে দীর্ঘ তিন মাইল ব্যাপী পথে সংগ্রাম করিয়া মাঝি মূল জলস্রোত হইতে নৌকা পশ্চিম পাড়ার দিকে আনিল।

গ্রামে পৌঁছিতে অনেকটা রাত হইয়া গেল।

জলের উপর গ্রামখানি যেন ভাসিতেছে। চারিদিকে শুধু জল। অন্ধকারের বুকে মাঝে মাঝে দু-একটা উঁচু ঢিবি, ঝোপ-ঝাড় দেখা যায়, কোথাও কোথাও জোনাকির আলোক-বিন্দুর মত দু-একটা আলোও নজরে পড়ে।

গ্রামে আজকাল নৌকা আসিতে দেখিলেই চারিদিক হইতে প্রশ্ন করে লোকে। 'কারা আসে গো', 'কারা আসে গো' শব্দে সেই বিস্তীর্ণ জলময় গ্রাম যেন মুখর হইয়া উঠে।

জলের বুকে দাঁড়ের ছপ্ ছপ্ শব্দ শুনিয়া গ্রামের চারিদিক হইতে প্রশ্ন উঠিল, কারা আসে গো?

আমি পঞ্চু গো, পঞ্চুই আগে উত্তর দেয়।

গ্রামে নৌকা করিয়া শুধু একজনই আসে না। আরও অনেকে আসে। লোকেও জিজ্ঞাসা করে, আর কে?

তাই পুনরায় প্রশ্ন আসিল। এবার উত্তর দিল ঘনশ্যাম।

—তা হ'লে পঞ্চু এসেছ, ঘনশ্যাম জ্যাঠা এসেছ আর কে এসেছ?

—আর এসিছি আমি, বি-জ-য়।

কথাটা সম্ভবতঃ কুসুমের কানে গিয়া লাগিয়াছিল। সে প্রতিদিন কান খাড়া করিয়া থাকে, সতর্ক দৃষ্টি মেলিয়া থাকে। কাজেই শুনিবামাত্র সে একখানা ডোঙা নিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। বন্যার জলে যখন সবকিছু ভাসিয়া গেল তখন জলের উপর উলটি-পালটি খাইতে খাইতে এই ডোঙাটিকে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া সে ধরিয়া রাখিয়া দিয়াছিল—কি জানি কবে দরকার লাগিয়া যায়। কৃষকের ঘরের মেয়ে সে, তারপর বন্যার দেশে বাস করে,

কাজেই তার ডোঙা চালানো নিয়া কোন প্রশ্নই উঠিবে না। সে ডোঙা চালাইয়া একেবারে বিজয়দের বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিল।

বিজয়দের যেখানটায় বাড়ী সেখানটায় শুধুই জল। ঘরের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। বিজয় কহিল, একি হয়েছে গো জ্যাঠা!

তাই তো দেখছি, ঘনশ্যাম কহিল, তোর মা বৌমা—এরা সব গেল তা হ'লে কোথায়?

বিজয়ের দুই চোখ ফাটিয়া গেল যেন। সেই অন্ধকারময় জলরাশির বুকে নৌকার উপর হইতে বিজয়ের যেন জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে ইচ্ছা করিল। সে কহিল, আর কি তারা আছে জ্যাঠা?

জলের উপর দাঁড়াইয়া কথা বলিলে অনেকদূর অবধি শোনা যায়। পিছন হইতে কে যেন বলিল, তারা ঠিকই আছে—ছিলে না শুধু তুমি।

বিজয় বলিয়া উঠিল, কে?

—আমি কুসুম।

—কুসুম?

হ্যাঁ, বলিয়া লগি ঠেলিতে ঠেলিতে কুসুম তার ডোঙা নিয়া একেবারে বিজয়ের নৌকার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিজয় কহিল, তারা ঠিকই আছে কুসুম?

—হ্যাঁ।

—কোথায় তারা?

—আমার বাড়ীতে। নৌকোয় পঞ্চুদা আছে শুনলুম যে—

হ্যাঁ, পঞ্চু কহিল।

কুসুম কহিল, আর কে কে আছে?

পঞ্চু কহিল, মাধবী, মতি, আর বলাই।

ওরা এই দুর্দ্দিনে গাঁয়ে এল কেন, কুসুম কহিল, গাঁয়ের অকল্যাণ হবে যে!

মাধবী কহিল, কুসুম আজকাল কথা বলতে শিখেছে দেখ্‌ছি।

কেন শিখব না বল্ তো, কুসুম কহিল, তা সে যাক্ এখন কোথায় গিয়ে সব উঠ্‌বি? ভাইপোটা মানে পরাণটা—সে তো রয়েছে জেলে। ঘরখানাও গেছে ভেসে।

আমাদের ঘরটা, মতি প্রশ্ন করিল।

তোদেরও সেই অবস্থা, কুসুম উত্তর দিল, তবে তোর ভাবনা নেই তোর কাকা সবাইকে নিয়ে গিয়ে উঠেছে যোগেশবাবুর বাড়ীতে। শুনলুম হরিপদদা জমি জায়গাগুলো সবই নাকি তুলে দিয়েছে যোগেশবাবুর হাতে।

পঞ্চু এখনো সৌরভের খোঁজ লয় নাই। কুসুম সেজন্য বেশ একটু চিমটি কাটিয়াই কহিল, পঞ্চুদা যে বোয়ের কোন খোঁজ নিলে না বড়?

মরেছে না বেঁচে আছে, পঞ্চু নির্ল্লজ্জের মত প্রশ্ন করিয়া বসিল।

কুসুম হাসিয়া নিয়া কহিল, খোঁজ নিও গিয়ে। তারপর ঘনশ্যামের উদ্দেশ্যে কহিল, জ্যাঠা আর দেরী কোরনা, তোমরা এসো। তুমিই বা আর কোথায় গিয়ে উঠবে, তোমার সেই মাঠের মাচা জলের তোড়ে কোথায় ভেসে গেছে। তা ছাড়া শশীখুড়োর বাড়ীতে গিয়েও যে উঠ্‌বে তার কোন পথ নেই। শশীখুড়ো জেলে আর তার বউ মেয়ে ইরি মধ্যে মালা হাতে করে চলে গেছে ভিক্ষে মেগে খেতে—

বলিস্ কিগো, ঘনশ্যাম চমকাইয়া উঠিয়া কহিল।

কুসুম কহিল, এই হাল হয়েছে গাঁয়ের—জ্যাঠা।

কিন্তু এত সব জেল হয়েছে কেন বল্‌তো, ঘনশ্যাম কহিল, এই পরাণের জেল হয়েছে বললি অবার শশীর—

শুধু ওদেরই হয়নি জ্যাঠা, কুসুম কহিল, কত বল্‌ব। আজ গাঁয়ে একটা পুরুষ মানুষ নেই—সব জেলে বন্দী। শ্রীপতি ঠাকুরদা, শশীখুড়ো, দীনু, পরমেশ, জীবন, পরাণ, আরও সব এগাঁ ওগাঁর লোক; কে এক ইয়াসিন চাচা আছে তার সব দলবল—এমনি ক'রে এই তল্লাটটার প্রায় শতাধিক লোককে জেলে আটক রাখা হয়েছে।

—কারণ ?

—সে বড় দুঃখের কাহিনী জ্যাঠা। তোমরা চলো সব বল্‌ব'খন। শুধু শুনে রাখো খেতে না পেয়ে লোকে ধান চাইতে গেস্‌ল ব'লে, তাদের ধ'রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বিজয় প্রশ্ন করিল, ডাক্তারবাবু কোথায় ?

ডাক্তারবাবু আছেন, বলিয়া কুসুম ডোঙার মুখ ফিরাইল।

বলাই এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই। এবার সে কহিল, কুসুম আমাকে তোমার বাড়ীতে একটু জায়গা দেবে ? পঞ্চার সঙ্গে আমি আর যাচ্ছিনা—শালা আমেরিকান সোলজারদের বুটের ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে আমার পাছাটা ইটের মত হয়ে গেছে।

বাস্তবিক। অনেক দুঃখে বলাই কথাটা বলিয়াছিল। ভদ্রেশ্বরের একটা পল্লীতে পঞ্চু মাধবী, মতি, এবং আরও অনেক মেয়েকে নিয়া গিয়া তোলে। সেখানে নিয়মিতভাবে আমেরিকান সৈন্যরা আসিত। বলাই কখনও তাদের সোডা ওয়াটার, কখনও মদ, কখনও সিগারেট আনিয়া দেওয়া—এই সব হুকুম তামিল করিত। ইহাতে সে সৈন্যগুলার পরিচিত হইয়া গিয়াছিল। তাই সৈন্যগুলা কোন হুকুম করিবার আগেই বলাইয়ের পাছায় একটা করিয়া সবুট লাথি মারিত। বলাই পাছায় হাত বুলাইতে বুলাইতে তাদের হুকুম তামিল করিতে যাইত।

অনেকদিন পরে সে গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাই আর সে কোথাও যাইতে চাহে না। কুসুমের কাছে সেজন্য সে অমন মিনতি করিয়া বলিতেছে। কুসুম তাকে চিনে, তাই সে গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিল, না।

পঞ্চু নৌকার মাঝিকে বলিল, চল হে ওদের পৌছে দিয়ে আমাদের ওদিকে দিয়ে আস্‌বে। পঞ্চু সম্ভবতঃ যোগেশবাবু কিম্বা অধর কুণ্ডু বা নফর ভট্চাযের বাড়ীর দিকে যাইবে।

মাঝি কুসুমকে অনুসরণ করিবার উদ্দেশ্যে নৌকা ঘুরাইল।

নৌকা আসিল একেবারে কুসুমের উঠানে। বাহিরের মাটির দেয়াল জলের তোড়ে ধসিয়া গিয়াছে। দাওয়াটা অনেকখানি উঁচু, তাই জলের আক্রমণ হইতে এখনও টিঁকিয়া আছে। নৌকা হইতে লাফাইয়া ঘনশ্যাম ও বিজয় দাওয়ায় উঠিয়া পড়িল। মা মরণাপন্ন অবস্থায় দাওয়ার একদিকে শুইয়া আছে। অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে বনমালা।

পঞ্চুদের নৌকা ফিরিয়া গেল। কুসুম ডোঙা হইতে নামিয়া কহিল, এই অন্ধকার—এর মাঝে আমাদের এমনি ক'রে দিন কাটাতে হয়।

আলো নেই, বিজয় প্রশ্ন করিল।

কুসুম কহিল, আলো কোথায়? গাঁয়ে কোথাও এক ফোঁটা কেরাসিন নেই। আর তা থাকলেও আমাদের কেউ দেয় না।

সেই অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া বিজয় মায়ের বিছানার পাশে গিয়া বসিল। কুসুম কাছে গিয়া কহিল, ও জ্যাঠাই, জ্যাঠাই—কে এসেছে ছাখো না গো।

বুড়ী ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, কে?

মায়ের কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বিজয় কহিল, আমি বিজয়—মা।

বিজয়, বুড়ী অন্ধকারে ছেলের মুখে কপালে হাত বুলাইয়া তাকে অনুভব করিতে লাগিল। তারপর কেমন যেন নিশ্চিন্ত হইয়া কহিল, ভাল আছিস্ বাবা।

—হ্যাঁ মা।

বনমালা ইতিমধ্যে আসিয়া বিজয়কে একটা প্রণাম করিয়া গেল। অন্ধকারে কেহ বুঝিতে পারিল কিনা কে জানে। কিন্তু বিজয় বুঝিল।

ঘনশ্যাম এবার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, অসুখটা কি?

কুসুম কহিল, অনাহার।

অনাহার! কথাটা বিজয়ের বুকে তীক্ষ্ণ শেলের মত গিয়া যেন বিঁধিল। তার মত একজন উপযুক্ত ছেলে থাকিতে তার মাকে অনাহারের

ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে। ভাবিয়া বুকখানা তার হাহাকার করিয়া উঠিল।

আহারাদির কোন বালাই ছিল না রাতে। ব্যাপকভাবে অনশন সুরু হইয়াছে সমস্ত এলাকাটাতে। কুসুম বিজয় ও বনমালাকে ঘরে শুইতে পাঠাইয়া দিয়া নিজে দাওয়ায় বুড়ীর কাছে এবং দাওয়ার অপর দিকে ঘনশ্যামের শুইবার ব্যবস্থা করিল। কিন্তু বনমালা বেশিক্ষণ ঘরে রহিল না। শুধু স্বামীকে গোটা কয়েক কড়া কড়া কথা শুনাইয়া আসিয়া সে কুসুমের পাশে শুইয়া পড়িল।

গ্রামের উপর দিয়া ঝড় বহিয়া গিয়াছে।

সেই সবেমাত্র চালের জন্য লাইন দেওয়া সুরু হইয়াছে বিজয় দেখিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তারপর এই সময়টুকুর মধ্যে গ্রামের অবস্থা এইরূপ হইয়াছে। ভাবিতেও বিস্ময় বোধহয় বিজয়ের। ফুড-কমিটি হইয়াছিল, লোকে চাল পায় নাই; পেটের দায়ে ধান চাহিতে গিয়াছিল, তাদের একদিকে উস্কাইয়া লুঠ করানো হইয়াছে, আরেকদিকে জেলে পুরা হইয়াছে। তারপর আসিয়াছে এই বন্যা। গ্রামে পুরুষ মানুষ বলিতে একজনও নাই। কে ইহার প্রতিকার করিবে? ডাক্তারবাবু আছেন বটে কিন্তু তিনি কি একলা কিছু করিতে পারিবেন?

ঝড়ের পরই এমনি অবস্থা মানুষের।

আজ শুইয়া শুইয়া ঘুম আসেনাকো বিজয়ের। এমনিতরো রাত তার জীবনে অনেক আসিয়াছে। আজ একদিকে পেটে ক্ষুধা—সেই সকালে হরি-হরদের বাড়ী হইতে যাহয় করিয়া দুটি খাইয়া আসিয়াছিল, ব্যস সেই পর্য্যন্তই—এখানে আসিয়া আর খাওয়া হয় নাই। আরেকদিকে তাকে আবার চিন্তায় পাইয়া বসিয়াছে। না খাইয়া রাতে ঘুমানো যেমন কষ্টকর তেমনিই কষ্টকর বিনিদ্র রজনীতে চিন্তা করা।

এই গ্রামে সে পৃথিবীর আলো দেখিয়াছে, এই গ্রামের প্রতিটি ধূলিকণার সহিত মিলিয়া মিশিয়া তার জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, এই গ্রামের আকাশ-বাতাস মাঠ-ঘাট, গাছ-পালা, বন-জঙ্গল, প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি

জীবজন্তু, কাক-পক্ষী পর্য্যন্ত তার একান্ত প্রিয়। এই গ্রাম আজ মরিতে বসিয়াছে।

অথচ শহরে সে দেখিয়া আসিয়াছে এইভাবে দেশ ও জাতির মৃত্যুর বিরুদ্ধে কি কঠিন পণ সেখানে মানুষের। নবজীবনের অগ্রদূতের মত হাজার হাজার মানুষ সেখানে একযোগে একটি মানুষের মত রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিজয় কি তার এই প্রিয় জন্মভূমির জন্য সেরূপ কিছু করিতে পারিবে না?

পারে করিতে—নিশ্চয়ই পারে! কিন্তু শহর ও গ্রাম তো এক নয়। শহর-জীবনের ক্ষিপ্রতা, শহর-জীবনের আগ্রহ ও বোধশক্তি নাই গ্রামে। এখানকার মানুষ অত্যন্ত নীচ, অত্যন্ত দীন—পরস্পর হানাহানি ও কানাকানি করিতেই ইহারা ভালবাসে। একে একে মনে পড়িয়া যায় এই গ্রাম্য-জীবনে সে যে সমস্ত দুঃখকষ্ট ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, সেই সকল কথা। সেই সর্ব্বপ্রথম কুসুমের সহিত তার বিবাহ হইল না। কেন হইল না তা সে জানে না। কিন্তু হইল না কেন? তারপর কুসুমের বাড়ীতে হরিনামের আড্ডা, হরিনামের লোকেরা পছন্দ করিত না যে বিজয় সেখানে যায়। কিন্তু যেদিন কুসুমের উপর হরিনামের দলের জন্যই বিপদ আসিল, সেদিন সবাই কুসুমকে একাকিনী রাখিয়া পালাইল। আরও মনে পড়িয়া যায় সেই দারোগা আসিয়া কুসুমের চরিত্রে বদনাম দেওয়া, সেই তার বিরুদ্ধে বিজয়ের রুখিয়া দাঁড়ানো, সেই ভগ্নী সীতার কাহিনী, সেই আদর্শ গ্রামের জমিতে তার কঙ্কাল-প্রাপ্তি—এ সবই একে একে তার মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু এই ঘটনাগুলির প্রত্যেকটিতেই কোন সাধারণ মানুষ তো মুরুব্বিয়ানা করে নাই। প্রত্যেকটি ঘটনাতেই পরিচালকের অংশ নিয়াছে সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরা। হ্যাঁ বিজয়ের মনের মধ্যে কেমন যেন একটা সরল বিশ্বাসের দীপ্তি ফুটিয়া উঠে—তারই আলোয় সে যেন দেখিতে পায় এই উচ্চস্তরের মানুষ যেখানেই থাকিবে, দরিদ্র মানুষ, সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রাকে সে ঘোরালো-প্যাঁচালো করিয়া তুলিবেই। কারণ তা না হইলে তার বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব।

সেজন্য বিজয় মনে মনে ভাবিল, গ্রামের সব লোকই তো কানাকানি হানাহানি চায় না। বিশেষ করিয়া সাধারণ মানুষ, অর্থাৎ যারা উচ্চশ্রেণীর নয়, তারা সত্যই দুঃখী এবং দুঃখেরও প্রতিকার করিতে চায়।

তবে তাই যদি হয় তা হইলে শহরের সহিত গ্রামের আর তফাৎটা রহিল কোথায়?

আবার ভাবিল শহরে যদি সাধারণ লোকও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে তবে গ্রামেই বা পারিবে না কেন? আসলে যেখানে যত দুঃখী লোক আছে তাদের সমস্যার কথা চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া আঘাত করো তাদের মনে, নিশ্চয়ই তারা ফুঁসিয়া উঠিবে। হ্যাঁ, মনে মনে সে সঙ্কল্প করে এই দুঃখীদের নিয়াই সে তার প্রথম অভিযান গড়িয়া তুলিবে।

দেশের সুমুখে প্রচণ্ড যুদ্ধের ভবিষ্যৎ, আর পশ্চাতে দুর্ভিক্ষ, অনাহার, বন্যা, সামাজিক দুর্নীতি, চোরা কারবার, মিলিটারীতে মেয়ে-সাপ্লাই, দেশ ও জাতির চরম নৈতিক অধঃপতন। একথা বুঝাইয়া বলিয়া সকলের কাছে যদি প্রতিকারের আবেদন করা যায় তবে প্রত্যেকটি মানুষ আগাইয়া আসিবে। যুদ্ধ আগাইয়া আসিলে দেশ ছারখার হইয়া যাইবে, তা ছাড়া যারা ভারতের মাটিতে যুদ্ধ আনিতে চাহিতেছে তাদের জয়লাভে ভারতবাসীর কোনই সুবিধা হইবে না এবং একটা শিকলের বদলে আরেকটা শিকলই জাতিকে পরিতে হইবে। আবার অন্যদিকে দুর্ভিক্ষ, বন্যা, সামাজিক দুর্নীতি এগুলি বাঁচিয়া থাকিলে দেশের অভ্যন্তরে ভেদাভেদ, হতাশা, ভাঙনের সৃষ্টি করিবে এবং তার প্রতিক্রিয়া রণক্ষেত্রে সৈন্যদলের উপর গিয়াও পড়িবে। তাই তাকে ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেই হইবে। ইহা তার সামাজিক রাজনীতিক এমনকি মানব-প্রেমিক কর্ত্তব্য।

কিন্তু তার আগে তাকে ঠিক করিতে হইবে বনমালাকে। বনমালার জন্য, যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাতে জনসাধারণের ভেদাভেদের মত তারও কর্ম্ম-জীবনের

পশ্চাতে ভাঙন দেখা দিতে পারে তাই বনমালা ও কুসুমের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করিয়া দিতে হইবে।

বনমালা ঘর হইতে যাইবার আগে বেশ কয়েকটা কড়াকড়া কথা শুনাইয়া দিয়া গিয়াছে। এতদিন কি বিজয় মা ও বনমালার কথা ভাবিবার সময় পায় নাই—ইহাই তার অনুযোগ। বনমালা বলিয়াছে—আসলে তার কুসুমের উপর লোভ আছে তাই এমন করিয়া সে বনমালা ও মাকে কুসুমের হাতে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে। কুসুম একটি একটি করিয়া তার গহনাগুলি বেচিয়াছে। আর সেই গহনা বেচা টাকায় বনমালাকে ও মাকে খাওয়াইয়াছে। কুসুম এসব কেন করিয়াছে তা কুসুমই জানে কিন্তু বনমালার এটা আদৌ ভাল লাগে নাই বরং সে ইহাও মনে করিয়াছে যে বিজয় কুসুমকে দিয়া এইভাবে তার ও শ্বাশুড়ীর চিত্তজয় করিবার চেষ্টা করিয়াছে। উঃ বনমালা কি সাঙ্ঘাতিক রকমের হিংস্র।

পরক্ষণেই সে আবার ভাবিল, না ইহা বনমালার অভিমানও হইতে পারে। কেননা ইহা যদি বনমালার হিংস্র স্বভাবের প্রকাশ হইত তা হইলে সে কখনই কুসুমের গহনা-বিক্রীর টাকায় কেনা অন্নের গ্রাস মুখে তুলিত না, কুসুমের কাছে এমন করিয়া পড়িয়া থাকিত না। আসলে কুসুমের সহিত তার মিলিয়াছে ভালো। তাই সে বনমালার কড়া কড়া কথার কোন মূল্যই দিল না। তবে বনমালার এম্‌নিতরো মনোভাব যদি কিছু থাকিয়া থাকে, তা হইলে তা দূর করিয়া দিতেই হইবে।

কিন্তু গ্রামের এই অবস্থায় করাই বা যায় কি? সকালে হরিহরের বাড়ীতে জ্যাঠা তাকে বলিয়াছিল, দেশ কি তোর একারই? হ্যাঁ, ঠিক কথা। দেশ তার একারই নয়—সবারই। তাই সবাইকে ডাক দিতে হইবে, সবাইকে ডাকিয়া প্রতিকারের কথা তুলিতে হইবে। কিন্তু প্রতিকারই বা করিবে কি দিয়া? আসিবার সময় হরিহর তাকে বলিয়াছিল: বন্যার ফলে তেমন ক্ষতি হয়েছে দেখিস্ তো সোজাসুজি এখানে চলে আসিস্। একটা কিছু ক'রতে

হবে তো ? হরিহরের সেই কথাটা মনে পড়িয়া গেল বিজয়ের। সহসা তার মন যেন বলিয়া উঠিল, কিছু করা যাইবেই—কিছু করা যাইবেই।

মনে সে ভাবিল, ভোর ভোর উঠিয়া সে কুসুমের ডোঙাটা নিয়া আশু ডাক্তারের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িবে। তারপর দেখিবে যে নৌকাখানা করিয়া আজ তারা আসিয়াছিল, সে নৌকাখানা উত্তরপাড়ার ওদিকে আছে কিনা। যদি থাকে তবে সেই নৌকাতেই সে তারকেশ্বর চলিয়া যাইবে—ওখান হইতে একেবারে শ্রীরামপুরে। এই ভয়াবহ প্লাবনের করাল গ্রাস হইতে মানুষকে, গ্রামকে বাঁচাইতেই হইবে।

রাত্রি কত কে জানে। প্লাবিত পল্লীর চারিদিক হইতে কেমন যেন ঠাণ্ডা বাতাস বহিয়া আসে। কান পাতিয়া থাকিলে বুঝি জলের ভাষা শুনিতে পাওয়া যায়।

ভোরে উঠিয়াই ডাক্তারের সহিত দেখা করিয়া সে আবার শহরে চলিয়া গেল।

৬৯

যে মানুষের মনে স্বদেশপ্রেমের তীব্র প্রেরণা আসে সে মানুষ কখনো চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না।

শহরে হরিহরের কাছে আসিয়া জলপ্লাবনের সেই ভয়াল বিস্তৃতি বর্ণনা করিয়া বিজয় অবিলম্বে সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিল। হরিহর তাকে দলের অফিসে নিয়া গেল। দলের সবাই মিলিয়া পরামর্শ করিয়া কতকগুলি স্কোয়াডে বিভক্ত হইয়া শহরের রাস্তায় রাস্তায় গ্রামোফোনের চোঙা নিয়া বক্তৃতা করিল। পথচারীদের কাছে, হাটেবাজারে, দোকানে, লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে সাহায্য প্রার্থনা করিল। দেশের একাংশে মানুষের এই দুরবস্থা শুনিয়া লোকে মুক্ত হস্তে দান করিল। কাপড়-চোপড় জামা-গেঞ্জী টাকা-পয়সা চাউল ইত্যাদি মন্দ উঠিল না।

বিজয় কহিল, যা উঠেছে ঐ আমায় দেয়া হোক্। আর দু-একজন লোক যাক্ আমার সঙ্গে। আমি একদণ্ডও আর দেরী করব না এখানে।

অবশ্যই অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তদনুযায়ী ব্যবস্থা হইয়া গেল। দেশের বিভিন্ন জায়গায় ইতিপূর্ব্বেই বন্যা হইয়া গিয়াছিল, তার সঙ্গে মহামারীও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল—তজ্জন্য দেশের সর্ব্বদলের প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি শিক্ষাব্রতী প্রভৃতিদের নিয়া 'পিওপ্‌ল্‌স্‌ রিলিফ কমিটি' নামে একটি রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছিল। হরিহর তার উল্লেখ করিয়া কহিল, কলকাতায় লিখে আমরা যত তাড়াতাড়ি পারি খাবার দাবার, কাপড় চোপড়, ওষুধ-পত্তর পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোরা কিন্তু কাজ চালিয়ে যা—

স্থির হইয়াছিল যে, অমল ও অমর এই দুইজন বিজয়ের সহিত যাইবে। চাল-ডাল কাপড়-চোপড়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কয়েকটা পুঁটুলী হইয়াছিল। একটা

গাড়ী ডাকিয়া সেগুলা শ্রীরামপুর স্টেশনে আনিয়া ট্রেনে উঠানো হইল। বন্যা রিলিফের জিনিস বলিয়া ভাড়া দিতে হইল না।

আবার সেই নৌকা করিয়া আগের দিনের মতই গ্রামে আসা, আবার সেই কুসুমের উঠানে আসিয়া নৌকা ভিড়ানো। নৌকা ভিড়াইয়া বিজয় মালপত্রগুলা দাওয়ার উপরে তুলিল।

চারিদিকে অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। শুধু দূরে জলের অপরূপ দ্যুতি। বিজয় অমল ও অমরের উদ্দেশ্যে কহিল, দেখ্‌ছেন এখানকার অবস্থাটা —একটা আলো জ্বালাবার পর্য্যন্ত উপায় নেই।

অমল ও অমর একসঙ্গেই বলিয়া উঠিল, হুঁ।

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল, জ্যাঠা কোথায়?

কুসুম উত্তর দিল, ডাক্তারবাবুর ওখানে গেছে।

অমল ও অমরকে নিয়া বিজয় সেই নৌকাতেই সোজা আশু ডাক্তারের ওখানে গিয়া উঠিল। ডাক্তারখানার দাওয়ার সঙ্গে ঘনশ্যামের ডোঙাটা বুঝি লাগানো। নৌকা হইতে ঘরের ভিতর গিয়া সে কহিল, ডাক্তারবাবু!

কে বিজয়, আশু উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, মানুষ জন্মেছিলি বটে! খুব খাট্‌তে পারিস্ তো—সদ্য গেলি সদ্য এলি!

কি করি কিছু তো আন্‌তে হবে, বিজয় কহিল, তাই আর দেরী করলুম না—

—কিছু টিছু সব আবার কি আনলি?

—কেন, চাল-ডাল, কাপড়-চোপড়।

বলিস্ কিরে, আশু ডাক্তারের দুইচক্ষু আনন্দে অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল, এর মধ্যে এসবও এনে ফেলিচিস্?

বিজয় সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল, আমাদের দল কি সোজা ডাক্তারবাবু। কিন্তু সে যাইহোক্ আমার সঙ্গে দুটি ভদ্দর লোক এসেছেন, এদের থাকবার ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকে।

কই কারা এসেছেন, আশু প্রশ্ন করিল।

বিজয় হাঁকিল, ও অমরদা অমলদা—ভেতরে আসুন না আপনারা?

অমল ও অমর ভিতরে গিয়া যুক্তকরে আশুকে নমস্কার জানাইয়া তারপর পাশে ঘনশ্যামকে দেখিতে পাইয়া ঘাড় নাড়িল। অমল কহিল, এই যে আপনিও এখানে।

হ্যাঁ, ঘনশ্যাম কহিল, এইসব কি করা যায় গাঁয়ে তাই একটু জিগ্যেসপড়া করছিলুম ডাক্তারবাবুকে।

অমল বলিল, এতো ভীষণ বন্যা হয়েছে!

হ্যাঁ, ঘনশ্যাম কহিল, এরকম বন্তে আর কখনো হয়নি। সেই তেরশো বিশ সালের বন্তে—সেও এরকম হয়নিকো।

বিজয় কহিল, আমি কিন্তু আর দেরী করব না। চললুম—সকালবেলা যাদের যাদের অবস্থা সবচেয়ে কাহিল তাদের তাঁদের বাড়ী গিয়ে খবর নিয়ে আসতে হবে। তারপর তাদের সাহায্যের ব্যবস্থা ক'রতে হবে।

অমল কহিল, তা হ'লে আমরা আজ এইখানে থাকব?

হ্যাঁ, বিজয় কহিল, থাকুন আজ ডাক্তারবাবুর এখানে। সেই কাল সকালে দেখা হবে।

ঘনশ্যাম কহিল, আমিই বা আর বসে কি করব?

আশু বলিল, তুমিই বা আর যাবে কোথায় ঘনশ্যাম—আমার এখানেই থাকোনা। এঁরাও রইলেন—

তা মন্দ নয়, বিজয় কহিল, ছাখো জ্যাঠা! কেন না তা'লে নৌকো ছেড়ে দিয়ে আমি ডোঙা নিয়ে যাই।

ঘনশ্যাম কি যেন ভাবিয়া নিয়া কহিল, তাই যা—

বেশ, বিজয় বাহির হইয়া পড়িল।

ওদিকে উত্তরপাড়ায় নফর ভট্চায, অধর কুণ্ডু, প্রভৃতি চুপ করিয়া ছিল না।

ওপাড়ায় অনেকগুলা পাকা বাড়ী। বাড়ীগুলাতে বন্যাপীড়িতদের স্থান দেওয়া হইয়াছে। যোগেশবাবু ছিলেন না—ছিলেন ভদ্রেশ্বরে মিলিটারী কন্ট্রাক্টরীর কাজে। তিনিও আসিয়া পড়িয়াছেন। যোগেশবাবু ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, কাজেই এত বড় একটা প্লাবনে তিনি তাঁর দায়িত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না। সেইজন্য তাঁকে আসিতেই হইয়াছে।

সেদিন সন্ধ্যায় সবাই আসিয়া যোগেশবাবুর বোর্ড অফিসে জুটিল। সেই কান্তবাবু, ধীরেনবাবু, ইব্রাহিম প্রভৃতি সবাই। পঞ্চু তো আগের দিনেই আসিয়াছে।

যোগেশবাবু বলিলেন, আমি ডি-এম, এস-ডি-ও, সার্কেল অফিসার—এদের সঙ্গে কথা ব'লে এসেছি। মানুষের যখন এই অবস্থা তখন একটা কিছু তো করতে হবেই।

নফর ভট্চায শিখা দোলাইয়া কহিলেন, তা বৈকি!

সেইজন্যে একটা স্কীম করা হয়েছে, যোগেশবাবু বলিতে লাগিলেন, তাই তোমাদের একটু খাট্তে হবে। আমার তো মোটে সময় নেই। কাজেই—

নফর ভট্চায কহিলেন, তা না হয় হ'ল কিন্তু স্কীমটা কি শুনি না আগে?

সার্কেল অফিসার বলেছেন, যোগেশবাবু কহিলেন, আমার বাড়ীতে গ্রুয়েল কিচেন করা হবে। দেশের সমস্ত লোক এসে খাবে।

অধর প্রশ্ন করিল, গ্রুয়েল কিচেনটা কি?

যোগেশবাবু গ্রুয়েলের বিশদ বর্ণনা করিতে করিতে বলিলেন, ক্ষুদ, চাল, ডাল, আনাজ কোনাজ মিশিয়ে একটা বিস্বাদ খিঁচুড়ী তৈরী করা হবে—যাতে লোকে বেশি না খেতে পারে অথচ তাই দিয়ে বেশি লোক খেতে পায়, এই আর কি।

অধর কহিল, তার মানে?

মানে আর কি, যোগেশবাবু আবার বলিলেন, পরিমাণে লোক কম খাবে—

কিন্তু মাথা গুণতিতে বেশি লোক খাবে। অর্থাৎ কোন রকমে খেয়ে বেঁচে থাকা।

অধর একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াই যেন বলিল, তা এরকম না ক'রলেও চল্‌তো।

ভট্‌চায কহিলেন, তা কি করা যাবে। যা হয় ক'রে মানুষকে তো বাঁচাতে হবে।

সেই জন্যেই, যোগেশবাবু কহিলেন, এই স্কীম করা হয়েছে।

ভট্‌চায কহিলেন, কবে থেকে হ'চ্ছে তা হ'লে ?

—জিনিসপত্তরগুলো এসে পড়তে যা দেরী।

হুঁ, ভট্‌চায কহিলেন, তা হ'লে জনকতককে তো ভার নিতে হয় এসব বন্দোবস্ত করবার।

যোগেশবাবু কহিলেন, ভার আবার নেবে কে—ভার ফুড-কমিটিকেই নিতে হবে। তবে তার মধ্যে থেকে কে কে দেখাশুনো ক'রবে, সেটা অবিশ্যি আমাদের আজকের সভায় ঠিক ক'রে নিতে হবে।

ভট্‌চায বলিলেন, দেখাশুনো আবার কে করবে—সবাইকেই দেখ্‌তে হবে।

যোগেশবাবু বলিলেন, তা হ'লে তো মিটে গেল গণ্ডগোল ?

অধর কহিল, তা বৈকি !

কান্তবাবু কহিলেন, তা কতটি লোকের গ্রুয়েল রোজ রান্না হবে ?

যোগেশবাবু কহিলেন, তা সাত-আটশো লোকের তো বটেই !

ওরে বাপ্‌রে, কান্তবাবু টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে চমকাইয়া উঠিলেন।

ভট্‌চায কহিলেন, এতটি লোকের ?

হুঁ, যোগেশবাবু বলিলেন, আরে বুঝতে পারছ না ঐ অমনি একহাতা একহাতা ক'রে লোকের পাতে দিয়ে যাবে। ব্যস্‌।

আসল ব্যাপারটা বুঝিয়া সকলেই একরকম মানিয়া নিল। কিন্তু সমস্যা হইতেছে রান্নাবান্নার। একে একে সেই সব প্রশ্নও উঠিল। যোগেশবাবু

বলিলেন, আমার চৌকিদার দফাদাররা রইল—তাছাড়া যারা খেতে আসবে তাদের দ্বারাও কাজকর্ম্ম করিয়ে নিতে পারা যায়।

তা না হয় হ'ল, কান্তবাবু অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে বলিলেন, গোড়ার দিকটা আপনার থেকে গেলে ভাল হোত।

যোগেশবাবু কহিলেন, আমি কি ক'রে থাকি। সমস্ত কাজ ফেলে আমি এসেছি। তা ছাড়া—তা ছাড়া তাঁর আর মুক্তি নাই। সুমুখে তাঁর অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য—অর্থ, সম্মান, প্রভাব, প্রতিপত্তি। একদিকে মিলিটারী কণ্ট্রাক্টরী। বড় বড় অফিসারদের কিছু কিছু দিলেই ব্যস্, মোটা মোটা টাকার বিল পাশ হইতে দেরী হয় না। আর একদিকে সেই টাকায় দেশের উৎখাত, দারিদ্র্যপীড়িত, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের জায়গা জমি, বাস্তু ভিটা—যে যা বিক্রয় করিতে আসে তাই জলের দরে কিনিয়া নেওয়া। প্রথম কাজটি চালান তিনি নিজে আর দ্বিতীয় কাজটি ভট্চায অধরকুণ্ডু প্রভৃতি। তাঁরা কয়েকজনে মিলিয়া চালাইয়াছেন এম্‌নিতরো এক যৌথ-কারবার। এখানে ভট্চায, অধর কুণ্ডু প্রভৃতি রহিয়াছে। কিন্তু শহরে কেহ নাই—এক তিনি ছাড়া। পঞ্চুকে হাত মুড়কুৎ হিসাবে তিনি নিয়া গিয়াছেন বটে কিন্তু সেও যেন নিজে একটা কি করে, তাকেও সব সময়ে পাওয়া যায় না। তিনি একা—তা ছাড়া আর কিছুই নয়, তিনি একা।

এবার ইব্রাহিম কথা বলিল। সে কহিল, সবই তো শুন্‌লুম কিন্তু একটা কথা তো উঠল না?

যোগেশবাবু কহিলেন, কি?

—শুরুয়েলে মুসলমানদের কি ভাবে ব্যবস্থা হবে?

সে একটা কথা বটে, যোগেশবাবু বলিলেন, তবে যদি মুসলমানরা এক জায়গায় খেতে চায় তো কোনো গণ্ডগোলই নেই আর তা না হ'লে আলাদা ব্যবস্থাই ক'রতে হবে।

ভট্‌চায কহিলেন, আরে মুসলমানরা একসঙ্গে খেতে চাইলেও হিঁদুরা তাতে রাজী হবে কেন?

ইব্রাহিম কহিল, তাই তো!

তবে একটা আলাদা ব্যবস্থা কোরো, বলিয়া যোগেশবাবু উঠিয়া পড়িয়া কহিলেন, তা সেই আলাদা ব্যবস্থার ভারটা তো ইব্রাহিম নিলেই পারো।

সেই ভাল, ভট্‌চায কহিলেন, তা হ'লে—

তা হ'লে আমি চলি, যোগেশবাবু কহিলেন, নৌকো অপেক্ষা করছে!

পরদিন সকাল হইতেই ডোঙা বাহিয়া বাহিয়া বিজয় লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে লাগিল। এখানে সেখানে যেখানে যেখানে মানুষ আশ্রয় নিয়াছে, সে সব জায়গায়ও গেল। যাদের হাতে আদৌ খাবার নাই, পরনের কাপড় নাই, তাদের সকলের একটা তালিকা তৈরী করিয়া ফেলিল। তারপর তাদের দুপুর বেলায় আশু ডাক্তারের ডিস্পেন্সারীতে আসিতে বলিল। ডিস্পেন্সারীর পাশে আশু একখানা ঘর দিয়াছে—তাতেই প্রকাণ্ড একটা বাঁশে কাস্তে-হাতুড়ী চিহ্নিত লাল পতাকা উড়াইয়া অফিস হইয়াছে। পতাকাটি দূর হইতে নজরে পড়ে।

তদনুযায়ী দুপুর বেলায় আশু ডাক্তারের ডিস্পেন্সারীতে ভিড়ে ভিড় হইয়া গেল। যাদের নাম লিখিয়াছিল বিজয়, তারা তো আসিলই,—সঙ্গে সঙ্গে যাদের নাম লিখে নাই তারাও আসিল। একপো, আধসের করিয়া চাল, একটুকরা আধটুকরা করিয়া কাপড় ইত্যাদি তাদের দেওয়া হইল।

শহর হইতে যা কিছু সংগ্রহ করিয়া আনা হইয়াছিল তা একদিনেই ফুরাইয়া গেল। আশু বিজয়ের এই অমানুষিক পরিশ্রমে ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তা ছাড়া চোখের সুমুখে মানুষের এই অনন্ত বিস্তৃত হাহাকার—ইহাও যেন তাকে কেমন অভিভূত করিয়াছিল। সে কহিল, বিজয় কি হবে রে—সব যে ফুরিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে সবাই-ই মুখ চাওয়া-চায়ি করিল।

আশু কহিল, আমি অবিশ্যি ব্যবস্থা ক'রতে পারি। তবে……বলিয়া কি যেন ভাবিল। তারপর আবার কহিল, কিন্তু তাতে কি কাজ হবে?

বিজয়, ঘনশ্যাম, অমল, অমর সকলেই তার মুখের দিকে জিজ্ঞাসুভাবে তাকাইল। আশু কহিল, আমি আমার জমানো টাকাগুলো সব দিতে পারি—

বেশ তো, অমল কহিল, আপনি যদি টাকা দেন তবে ব্যবস্থাও একটা হতে পারে।

কি ব্যবস্থা বলুন তো, আগ্রহান্বিতভাবে আশু জিজ্ঞাসা করিল।

অমল বলিল, টাকা নিয়ে সোজা এস-ডি-ওর কাছে গিয়ে বলুন—এই নিন্ টাকা আর এই নিন্ বন্যাপীড়িতদের লিস্টি। দিন চাল, মানুষকে বাঁচাই।

আশু সোৎসাহে ডিস্পেন্সারী রুমের টেবিল চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিল, দ্যাট্‌স্ রাইট। আমি আজই যাব এস-ডি-ওর কাছে।

হ্যাঁ, অমল কহিল, আপনি যদি এ-ও মনে করেন যে আমাদের কেউ গেলে কাজ হবে তবে আমাদেরও একজনকে নিতে পারেন—

তা হ'লে তো ভালই হয়, আশু কহিল, বেশ একসঙ্গে যাওয়াও যাবে। তা ছাড়া আপনাদের এসব বলা টলা অভ্যেসও আছে। তা বলুন কে যাবেন?

অমল কহিল, আমিই যাব।

আর উনি, অমরের দিকে হাত দেখাইয়া আশু কহিল।

অমল কহিল, ওঁকে পাঠাবো শহরে। ও যাক্ শহরে—আমরা যাই এস-ডি-ওর কাছে। কোনদিক থেকে না কোনদিক থেকে কিছু না কিছু এসে পড়বেই। ব্যস্ আমাদের রিলিফের কাজও ঠিক চলতে থাকবে। কিন্তু কত টাকা আপনি নিয়ে যাবেন বলুন তো?

আশু কহিল, কত নোব বলুন তো?

অমল হাসিয়া কহিল, টাকা আপনার, আপনি নেবেন—কত নেবেন তা আপনিই হিসেব ক'রে নেবেন।

আশু কহিল, তবু কত টাকা নিয়ে গেলে হবে—আমি তো জানি না।

দেখুন সেটা বলা একটু কঠিন, অমল কহিল, আপনি কি রকম খরচ করতে পারবেন না জেনে আমার পক্ষে বলাটা কেমন দেখায় না?

ঘনশ্যাম ঘাড় নাড়িল।

আশু কহিল, আমি হাজার পাঁচেক টাকা দিতে পারি।

কথাটা অসম্ভব রকমের উৎসাহ ব্যঞ্জক ও খানিকটা ঔদ্ধত্যপূর্ণ বলিয়াই মনে হইল। সকলের মুখের উপর আশু ইহার ছায়া দেখিতে পাইয়া কেমন যেন একটু সামলাইয়া নিল। তারপর আন্তরিকভাবে ও উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলিতে লাগিল, জীবনে আমি অনেক টাকা রোজকার করেছি। কিন্তু সবই আমি উড়িয়েছি মদের পিছনে। চব্বিশঘণ্টা আমি মদ খেয়ে থাকতুম। মদ ছাড়া জীবনে আমার কোন বন্ধু ছিল না। সেদিন ধানলুঠের পর থেকে জীবনে আর কখনো আমি মদ ছোঁবনা ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছি। কথাগুলা বলিতে বলিতে আশুর চোখ দুটা ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। একটু থামিয়া সে আবার বলিল, অনেকদিন পরে বাক্সটা সেদিন নেড়ে চেড়ে দেখছিলুম—দেখতে গিয়ে এই পাঁচহাজার টাকা পেলুম।

অমল বলিল, এই পাঁচহাজারই শুধু আপনার আছে?

হ্যাঁ, আশু কহিল, আরও যে কত হাজার থাকৃত!

তা যাই হোক্, অমল বলিল, এই পাঁচহাজার দিলে আপনার চলবে কি ক'রে?

সে ঠিক চলে যাবে, আশু বলিতে লাগিল, যে আগ্রহ নিয়ে একদিন লোকের বাড়ীতে ধান লুঠ ক'রতে গিয়েছিলুম সেই আগ্রহ নিয়েই আমি আজ টাকাগুলো দিতে চাই! আজ দেশের কি অবস্থা!

কথাগুলো সবাইকেই কেমন যেন অভিভূত করিয়া ফেলিল। অমল প্রশ্ন করিল, কিন্তু ধানলুঠের ব্যাপারে পুলিশ যে আপনাকে বড় রেহাই দিলে?

কেন যে তাকে পুলিশ রেহাই দিয়াছিল, তা আশু মনে মনে জানিলেও

মুখ ফুটিয়া ইহাদের কাছে বলিতে পারিবে না। বলা তার পক্ষে সম্ভবও নয়। তাই সে এক বেদনা-মিশ্রিত হাসি হাসিয়া কহিল, কি জানি—এমনিই হয়ত রেহাই দিয়েছে!

বিজয় কহিল, পুলিশের খেয়ালের কথা তো বলা যায় না। খেয়াল হয়েছে রেহাই দিয়েছে।

এবার আশুই উদ্‌গ্রীব হইয়া কহিল, ওকথা যাক্। এখন কি করা যাবে বলুন?

অমল কহিল, এক্ষুনি পাঁচহাজার টাকা আপনার খরচ ক'রে কাজ নেই। বরং টাকাটা আপনি রেখে দিন। আরও অনেক বড় কাজে লাগানো যাবে। ওর থেকে শ-পাঁচেক মাত্র নিয়ে চলুন আমরা এস-ডি-ওর কাছে যাই—

সেই ভাল, ঘনশ্যাম কহিল।

বিজয় কহিল, তা হ'লে একটা নৌকো দেখ্‌ব নাকি?

নৌকো না হ'লে যাব কি ক'রে, আশু কহিল, তবে আমাদের বেশিদূর নৌকোয় যেতে হবে না—খানিকটা গিয়েই ওদিকে হাঁটা পথ। তারপর অমরকে দেখাইয়া কহিল, তবে উনি যদি যান্—ওঁকে সবটাই নৌকোয় যেতে হবে।

দুখানা নৌকো মেলাই তো দুষ্কর, বিজয় উঠিয়া পড়িল।

ঘনশ্যাম কহিল, ছাখ্‌না চাঁপাডাঙা-টাঙা থেকে যদি কেউ এসে থাকে।

হ্যাঁ তাই দেখ্‌ছি, বলিয়া বিজয় বাহির হইয়া পড়িল।

বিজয়ের বরাত ভাল। তাকে বেশি ঘুরিতে হয় নাই। গত রাত্রিতে যোগেশবাবুকে নিয়া যে নৌকাখানি তারকেশ্বর গিয়াছিল, সেটি তাঁর জিনিসপত্র নিয়া যাইবে বলিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। বিজয় দেখিল, সেই নৌকাতে অমরকে শহরে পাঠানো যাইবে। মাঝির সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া বিজয় যখন আরেকখানি নৌকার সন্ধানে বাহির হইতেছিল তখন দেখিতে পাইল ডিহি-বাৎপুরের রাধহরির মালপত্র পৌছাইয়া একখানি নৌকা পুরশুড়ার দিকে

যাইতেছিল। বিজয় তাড়াতাড়ি তার মাঝিকে ডাকিয়া একেবারে আশুর ডিস্পেন্সারীর সুমুখে নিয়া আসিল।

আশু বলিল, বিজয় যে কাজে হাত দেবে—তা' একেবারে সফল হবেই।

অমল কহিল, কেমন নামটি তো দেখ্‌তে হবে।

বিজয় কহিল, তার মানে ?

অমল কহিল, যার নাম বিজয় তার কখনো পরাজয় হয় ?

সবাই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বিজয় কহিল, আর কিন্তু দেরী নয় ডাক্তারবাবু—অমরদাকে একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে। তা না হ'লে আবার যোগেশবাবুর নৌকো চলে যাবে।

বেশ, আশু কহিল, আমি ওঁকে খাইয়ে দিচ্ছি—

হ্যাঁ তা হ'লে খেয়েদেয়ে আপনারা বেরুন, বিজয় কহিল, আমি চলি।

ঘনশ্যাম কহিল, তাই যা। গিয়ে একটু বিশ্রাম নিগে যা ! আর দ্যাখ্‌ আসবার সময় আমার পুঁটুলিটা আনিস্ তো !

আচ্ছা, বিজয় চলিয়া গেল।

আশুর বাড়ীতে আছে একমাত্র এক বুড়ী পিসীমা। আশু ভিতরে গিয়া তাঁকে ভাত দিতে বলিল।

যে মানুষের চোখের সামনে খুলিয়া গিয়াছে নূতন জগতের সিংহদ্বার, সে মানুষের পিছন ফিরিয়া তাকাইবার অবসর কোথায় ? প্রতিটি মুহূর্ত্তে সে কেবল সামনের পথই দেখিতে পায়—অনন্ত প্রসারিত সে পথ। আশা-আকাঙ্ক্ষায় আর উৎসাহ-উদ্দীপনায়, উত্থান আর অভ্যুদয়ে সে পথ রাঙা। সেই রাঙাপথের হাতছানি মানুষের মনকে আলোড়িত করে, আশান্বিত করে, দুর্নিবার বেগে কোথায় কোন্ প্রশান্ত-প্রসন্ন সুখলোকে মহাসমারোহে টানিয়া নিয়া যায়।

তারই টানে বিজয় চলিয়াছে। পিছন ফিরিয়া তাকাইবার তার আর

অবসর নাই। প্লাবনের ভয়াল বিস্তৃতি কঠোর সত্যের মত নির্মমরূপে চারিদিক ছাইয়া রহিয়াছে। দিকে-দিকে গ্রামে-গ্রামে গৃহে-গৃহে মানুষের হাহাকার। এ অবস্থায় করণীয় কর্তব্য বিজয়কে করিতেই হইবে।

নিজের সংসারে হাহাকার, কুসুম তার জন্য তার গয়না-গাটি সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াছে, মা মৃত্যু-শয্যায়, বনমালা রোগা কাঠ হইয়া গিয়াছে। বিজয় যেন এসব দেখিতেও পায় না। এক তো আসিল কতদিন পরে। তারপর শুধু কাজ, কাজ! তা ছাড়া বিজয়ের নিজেরই বা কি হইয়াছে। অনাহারে, অনিয়মে আর অতিরিক্ত পরিশ্রমে সেও যেন কেমন একটা বে-পরোয়া মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। শুধু তার অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে চোখ দুটা। চোখের দিকে তার চাওয়া যায় না—রোগা হইয়াছে বটে সে কিন্তু চোখগুলা যেন কেমন তীব্র এক দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই দীপ্তি-বিচ্ছুরিত উদ্ভাসিত চোখ দুটাই যেন জীবনে তার নবজীবনের আশীর্ব্বাদ। এই চোখ দুটার দিকে তাকাইয়াই আজকাল আর কিছু বলা যায় না তাকে।

খাইতে দিয়া কুসুম কহিল, একটু চেয়ে দেখবে না কোনো দিকে?

বল কোন্ দিকে দেখব, খাইতে খাইতে বিজয় কহিল।

মা বউ, কুসুম কহিল, ওরা যে গেল! কি হাল হয়েছে বউটার দেখেছ চেয়ে?

বনমালা আগাইয়া আসিয়া আঁচাইবার জল দিল। বিজয় তার দিকে তাকাইয়া তারপর কুসুমের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া কহিল, হালটা একটু খারাপই যাচ্ছে দেখছি—

বনমালা পাক খাইয়া কুসুমের দিকে তাকাইয়া কহিল, ত্থাখদিকি!

বিজয় কহিল, জ্যাঠার কি পোঁটলা আছে দাও তো—

কুসুম ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল, এখুনি বেরুতে হবে?

বিজয় কহিল, হ্যাঁ।

কুসুম পোঁটলাটা আনিয়া রাগতভাবে বিজয়ের কাছে বসাইয়া দিল। বিজয় হাসিয়া সেটা নিয়া ডোঙায় উঠিয়া পড়িল।

কুসুম সেইখানে দাঁড়াইয়া বিজয়ের ডোঙার দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল, এ মানুষকে এমনভাবে শাসন করা যায় না। ইহাদের জাতই আলাদা। কুসুম মনে মনে স্থির করিল, আচ্ছা সেও পথে বাহির হইয়া পড়িবে। বিজয়ের পথ, কুসুমেরও পথ।

২০

মহা উৎসাহে রিলিফের কাজ চলিতে লাগিল।

দামোদরের বন্যা শুধু দামোদর-প্রবাহিত অঞ্চল সমূহেরই যে ক্ষতি করিয়াছিল তা নয়—দামোদর সারা ভারতেরই ক্ষতি করিয়াছিল। রেল লাইন বিধ্বস্ত হইয়া যাওয়ার ফলে সারা উত্তর ভারতের সহিত বাংলাদেশের যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া গেল, শিল্পাঞ্চল হইতে আসানসোল ও বিহারের খনি অঞ্চলের কোন রকম যোগসূত্র রহিল না। ফলে খাদ্য-দ্রব্য, সমর-সম্ভার আমদানী-রপ্তানী, শিল্পাঞ্চলের উৎপাদন প্রভৃতিতে রীতিমত ঘা দিল। কলকারখানা কয়লাভাবে বন্ধ রাখিতে হইল, শ্রমিকদের হাতে কোন কাজ রহিল না, অন্যদিকে দেশে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ, সমগ্র দেশ হাহাকারের চরম দশায় গিয়া পৌঁছিল।

যুদ্ধের নামে, দেশ রক্ষার নামে আমলাতন্ত্র এত বড় দুইটা বিরাট জেলার এই বিস্তীর্ণ এলাকায় এতটুকু নজর দিবার সময় পর্য্যন্ত পাইল না। এমন কি যে মুসলিম লীগ মন্ত্রিমণ্ডলী মুসলমানের তথা সারা বাংলার কল্যাণের জন্য মন্ত্রিত্বের গদিতে বসিয়াছিলেন সেই মুসলিম লীগ মন্ত্রিমণ্ডলী সারা বাংলার তো দূরের কথা, মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলিতে গিয়া এই অনন্যমেয় বিপদের মুখে তাদের একবার একটি আশ্বাসবাণী পর্য্যন্তও দিতে পারিলেন না।

কিন্তু দেশের জনসাধারণ আগাইয়া আসিল। দামোদরের বন্যা শুধু দামোদর তীরবর্তী অঞ্চল সমূহেরই সঙ্কট নয়—ইহা যে কোন জাতীয় সঙ্কটের মতই গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কট। স্বদেশ-প্রেমিক জনসাধারণ ইহা উপলব্ধি করিলেন। 'পিওপ্‌ল্‌স্‌ রিলিফ কমিটি' এই সঙ্কটের উপরে চারিদিকে আন্দোলন সৃষ্টি করিলেন। দেশবাসী তাঁহাদের যথাসাধ্য দান করিলেন। এখানে কৃষক-সমিতি মারফৎ

রিলিফের কার্য্য চলিতে লাগিল। পশ্চিমপাড়ার দিকে সমগ্র থানা অঞ্চল জুড়িয়া পুরশুড়া থানা কৃষক-সমিতি বলিয়া একটি সমিতি তৈয়ারী হইয়াছে। সকল গ্রামের কৃষকই আছে এই কমিটিতে। আশু ডাক্তার এই কমিটির সভাপতি, বিজয় সম্পাদক। মেয়েদের সম্পূর্ণ ভার নিয়াছে কুসুম। কুসুমের এই ভাবে কাজের মধ্যে আসায় বিজয় যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছে। কেমন করিয়া কুসুমের এমন পরিবর্ত্তন হইল কে জানে!

রিলিফ পাইয়া লোকে আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। লোকে এখন বাঁচিবার যেন রাস্তাও খুঁজিয়া পাইয়াছে। এই বিরাট সঙ্কটের মুখে পরস্পর পরস্পরের হাত ধরিয়া না দাঁড়াইলে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। তাই প্রতিদিনই মানুষ নূতন নূতনভাবে চিন্তাও করিতেছে।

ইতিমধ্যে একটু একটু করিয়া জলও কমিতে সুরু করিয়াছে।

একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে ঘনশ্যাম কহিল, এবার কিন্তু লোকের একটু-আধটু কাজ কর্ম্ম দরকার বাবু।

বিজয় কহিল, জল একেবারে না মরলে তো তা হবে না।

সেই তো, আশু চিন্তিতভাবে বলিয়া উঠিল।

অমল কহিল, কিন্তু তার আগে ভালভাবে যাতে লোকে খাবার দাবার পেতে পারে তার ব্যবস্থা ক'রতে হবে। তা না হ'লে চোরাবাজারে যেতে যেতে মানুষের মন বিষিয়ে উঠ্‌বে। সেইজন্য আমি বলি কি আপনার সেই টাকাটা এবার কাজে লাগানো যেতে পারে।

তা ঠিক কাজেই লাগ্‌বে টাকাটা, বিজয় বলিয়া উঠিল, কিন্তু আরেকটা কথা আমাদের ভুললে চলবে না। ধান লুঠের মামলায় আমাদের সব লোক গুলোই প্রায় জেলে। তাদের আমাদের যেমন ক'রেই হোক ছাড়িয়ে আনতে হবে।

আশু কহিল, হ্যাঁ সে একটা মস্ত বড় কাজ। অন্ততঃ আমারই

সে কাজে এগিয়ে যাওয়া দরকার। তারা সবাই জেলে রইল আর আমি রইলুম বাইরে। লজ্জায় আমি মরে যাই।

আশুর শেষ কথাটায় সকলেরই মনে বেশ একটু দোলা লাগিল। কেন যে সে বাহিরে থাকিয়া গিয়াছে, তা সেই জানে। সেই কথাটা মনে পড়িতেই আশু চোখের সামনে যেন আরও একটা পথ দেখিতে পাইল। তাই উচ্ছ্বসিত ভাবে বলিয়া উঠিল, আমার যে টাকাটা কাজে লাগাবেন বল্‌ছেন—আমি তাতে আরও টাকা চাঁদা তুলে দিতে পারি।

অমল কহিল, বেশ তো—ভাল কথা।

আশু ডাক্তারের চোখের সুমুখে ভাসিয়া উঠিল নফরের ছোট বউ পারুলের মূর্তিখানা। এই ধান লুঠের মামলা হইতে সেই তাকে বাঁচাইয়াছে। স্বামীর হাতের লাঠির আঘাতে তার ফাটা-মাথায় পারুল সেদিন ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়াছে! দীর্ঘকাল পরেও এই যে পারুলের মমতা—ইহা সে ভুলিবে কি করিয়া? প্রেম ভালবাসা মানুষকে মহৎ করিয়া তোলে। পারুলও সেই মহৎ জীবনেরই অধিকারিনী। কাজেই দেশের এই বিপদের দিনে, দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও হাহাকারের দিনে যদি সে তার কাছে হাত পাতে তবে সে শূন্যহস্তে ফিরিতে পারে না। না না পারুল, সে মেয়ে নয়। আশু মনে মনে ভাবিল—সে একদিন কুসুমকে পারুলের ওখানে পাঠাইবে।

ওদিকে কিন্তু অবস্থাটা অন্যরকম।

হিন্দু ও মুসলমান দুটা গ্রুয়েল কিচেন চলিতেছে যোগেশবাবুর বাড়ীতে। অমল প্রভৃতি গ্রুয়েল কিচেনের নাম দিয়াছে ক্রুয়েল কিচেন। বন্যার সঙ্গে সঙ্গে যোগেশবাবু, নফর ভট্‌চায, অধর কুণ্ডুর বাড়ীতে প্রচুর লোক আসিয়া উঠিয়াছিল। তারা এখন এই 'গ্রুয়েল কিচেনে' খায় আর এই সব বাড়ীগুলায় থাকে। পঙ্কু এখানে থাকিবে না বলিয়াছিল কিন্তু সে এখনও এখানেই আছে। যোগেশবাবুর বাড়ীটা সম্পূর্ণভাবে তারই খবরদারীতে।

ইহাতে পঞ্চুরই সুবিধা হইয়াছে। বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আগত পরিবারগুলি তারই দয়ার উপর এখানে বাস করে। বন্যায় দেশ ডুবিয়াছে, খাদ্য-ফসল, চোরাবাজারের খিড়কী দিয়া চড়াদামে বিক্রয় হইতেছে, কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, গ্রুয়েল কিচেনে একবেলা খাইয়া মানুষের বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নয়—লোকগুলাও কেমন খিট্‌খিটে, আধ-পাগলা হইয়া উঠিতেছে। সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেছে পরস্পরের মধ্যে। পরাশ্রয়ে আছে বলিয়া যে লোকগুলার কোন রকম শ্লীলতা শালীনতা বজায় রাখিয়া চলা উচিত, তা তারা মনেও করে না।

সবচেয়ে খিট্‌খিটে হইয়াছিল দশরথ জেলের বউ আর মেয়ে। হারাণ কামারের মেয়েগুলা তো ইহারই মধ্যে দুর্ণাম কিনিতে সুরু করিয়া দিয়াছে। প্রথমে নৌকা আসিলে মিথ্যা কথা বলিয়া মাঝিকে তাদের নিয়া যাইতে বলে—তারপর এখানে সেখানে ভিক্ষা করিয়া দুই চারিদিন কাটাইয়া আবার এই গ্রুয়েল কিচেনে ফিরিয়া আসে। শরৎ তাঁতীর ছেলেগুলা ইহারই মধ্যে পাকা চোর হইয়া উঠিয়াছে।

দশরথের মেয়ের নাম আদুরী। আদুরী বিধবা। বয়স উনিশ কুড়ির বেশি হইবে না। বেশ আঁটসাট দেহ। দেখিয়া শুনিয়া পঞ্চু মাধবী ও মন্তিকে দিয়া আদুরীকে হাত করিয়া ফেলিয়াছে। আদুরী আবার হারাণ কামারের মেয়ে গোলাপ, পদ্ম যুঁইকে হাত করিয়াছে। এইভাবে পঞ্চুর একটা বেশ ছোটখাটো পরিবার গড়িয়া উঠিয়াছে।

গ্রুয়েলের উপকরণ, ক্ষুদ, মুগ, বজরা ইত্যাদি রান্নার আগেই কিছুটা সরিয়া যায়। সেখানে ভটচাযের হাতে ভাঁড়ার। কান্তবাবুও রান্নার সময়টায় কিছুটা সরান। বলাই কান্তবাবুর সঙ্গে রান্নার ব্যাপারে আছে, সেও যে কখনো কখনো কিছুটা সরায় না তা নয়। এমনি করিয়া সরাইতে সরাইতে যা রান্না হয় তা নিতান্তই কম। সকলকে দিয়া কুলাইবার জন্য তাই পৃথিবীর মত তিন ভাগ জল ও এক ভাগ স্থল এইভাবে গ্রুয়েল রান্না করা হয়। রান্না হইবার

পর ঘন অংশটুকু চলিয়া যায় পঞ্চু প্রভৃতির প্রিয়জনগুলার পাতে—বাকীটা সব লোককে গঙ্গাভাবে গঙ্গার জলের ছিটেফোঁটার মত বণ্টন করা হয়।

সেদিক দিয়া আদুরী গোলাপ, পদ্ম, যুঁই প্রভৃতি যে সুখেই আছে তা বলিতে হইবে।

হরিপদ যোগেশবাবুর বাড়ীতে আসিয়াই উঠিয়াছে। বেচারা শিক্ষক লোক। গ্রুয়েল কিচেনে তার খাইতে বাধে। তা ছাড়া লোকটা আত্মসম্মান নিয়া বাঁচিবে বলিয়া, জমিগুলা পর্য্যন্ত বেচিয়াছে। তাই জমি বিক্রীর পয়সায় সে চাল কেনে এবং পরিবারস্থ সকলে মিলিয়া খায়।

মতি আসিয়া হরিপদরই সংসারে উঠিয়াছে। অবশ্য মতি এমনিই খায় না। যথেষ্ট পয়সা দেয় সংসারে। ডলারের দেশের পয়সা আসে তার হাতে। কাজেই সে খরচও করিতে পারে ডলারের দেশের মতই।

পশ্চিমপাড়ার চালবিলি এখনও ভট্চাযই করেন। হরিপদ সেদিন সকালে মতির নিকট হইতে টাকা পাইয়া একবস্তা চাল কিনিতে গেল। ভট্চায বলিলেন, চাল কোথায় ?

হরিপদ কহিল, আপনার কাছেই তো পাওয়া যাবে শুনলুম।

ভট্চায বলিলেন, সে কণ্ট্রোলের চাল তো নয়—এমনি ব্ল্যাক থেকে এনে দিতে পারি। দাম লাগবে আশী টাকা।

হরিপদ চমকাইয়া উঠিল। তার কাছে ছিল মাত্র বাহান্নটি টাকা। ফিরিয়া আসিয়া কথাটা মতি প্রভৃতিকে বলিল। মতি বলিল, বুড়োর বিট্‌লে-পনা ভাঙ্‌চি রোসো—

তারপর মতি কথাটা পঞ্চুকে বলিল। পঞ্চু আবার ভট্চাযকে বলিল। ভট্চায কহিলেন, চাল কোথা রে পঞ্চু ?

পঞ্চু তো অবাক। প্রথমতঃ সে ফুড-কমিটির একজন সভ্য, দ্বিতীয়তঃ সে নিজেই ভট্চাযের বাগান-বাড়ীতে চাল লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছিল—সেইসব কথা স্মরণ করিয়া সে ভট্চাযের সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিল। সে মুখে কিছু

বলিল না বটে কিন্তু ভিতরে ভিতরে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। ভট্চায তাকেও ফাঁকি দিতে চায়। কথায় কথায় কথাটা সে হরিপদকে বলিয়া ফেলিল।

ভট্চায প্রভৃতির মনোভাব পঞ্চু বেশ বুঝিতে পারিল। যুদ্ধের বাজারে দুর্ভিক্ষের সুযোগে সবাই দু-পয়সা রোজকার করিতে চায়। কাজেই যে-যাহার নিজের মত পথেই চলিবে। তাই সেই বা কেন এখানে পড়িয়া থাকে—একদিন আবার মাধবী, মতি এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আদুরী, গোলাপ, পদ্ম আর যুঁইকে নিয়া ভদ্রেশ্বরে চলিয়া গেল। আমেরিকান সোলজাররা স্ত্রীলোক পাইলে বড়ই খুশি হয় এবং তজ্জন্য তারা পঞ্চুকে প্রচুর টাকা দেয়। পঞ্চুকে এই টাকা সংগ্রহ করিতেই হইবে।

পঞ্চুরা চলিয়া যাইতে গ্রুয়েল কিচেনের অন্যান্য লোকেরা খুবই আনন্দিত হইল। দশরথের বউই বলিয়া উঠিল, বেটিরা পেয়ারের লোক ব'লে গিল্তো কি—যেন হাতীর খোরাক। আমরা একটুকু ঘোনো খিঁচ্ড়ী কুনো দিনই পেলাম নি।

বাস্তবিকই তাই। কুসুম মেয়েদের কাপড়চোপড় দিবার জন্য মাঝে মাঝে এখানে আসে এবং এইখান হইতে এই সব খবর সংগ্রহ করিয়া নিয়া যায়।

তবু গ্রুয়েল কিচেন ঠিকই চলিতে লাগিল। সংবাদপত্রে ফলাও করিয়া, রেডিওয় প্রচার করিয়া, বিলাতে ভারত সচিব আমেরী বিবৃতি দিয়া জগত-বাসীকে বুঝাইতে লাগিলেন, সদাশয় বৃটিশ সরকার কি না করিয়াছেন ভারত-বাসীদের জন্য!

মানুষের দুঃখের রাত্রিও একদিন প্রভাত হয়।

দিন যায় রাত্রি আসে—আবার আসে দিন, সেদিনও কাটিয়া যায়। সময়ের চক্র এমনি করিয়াই পাক খাইতে খাইতে চলে। সহস্রকোটি ফণা বিস্তার করিয়া ফণিনীর মত যে বন্যা আসিয়াছিল সবকিছুকে গ্রাস করিয়া—সে বন্যার জলও একদিন নামিয়া গেল। আবার সেই প্লাবিত মাঠের বুকে আদিম

পৃথিবীর মত সবুজ শ্যাম ধরিত্রী—মাতৃ-জঠরের অন্ধকার হইতে শিশু যেমন মুক্তি পায়, তেমনিভাবে প্লাবনের বিস্তৃত জলরাশির তলদেশস্থিত অন্ধকার হইতে মুক্তি পাইল। সূর্য্যোকরোজ্জ্বল দিনের প্রশান্ত আলোকে শিশুর মত খুশির হাসি হাসিয়া উঠিল।

আবার মাটি জাগিয়াছে। ঘনশ্যামের ভাষায় তার 'মা' জাগিয়াছে। দুরন্ত শিশুর মত আবার সেই মাটি মায়ের স্তন আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে।

সবচেয়ে সুখের কথা, ধান লুঠের মামলায় প্রায় সব আসামীই মুক্তি পাইয়াছে। সে এক মজার ব্যাপার। এত সহজে যে তারা মুক্তি পাইবে সে কথা কেহ ভাবে নাই। কিন্তু হঠাৎ একটা সুযোগ ঘটিয়া গেল।

কিছুদিন যাবৎ বিজয় ও আশু ডাক্তার গ্রামে খাদ্যশস্য ও বীজধান আনাই-বার চেষ্টা করিতেছিল। প্রায়ই এসম্পর্কে তাদের এস-ডি-ও, সার্কেল অফিসার এবং সাপ্লাই অফিসারের নিকট যাইতে হইত। বিজয়দের হাতে কর্ত্তৃপক্ষ এই অজুহাতে খাদ্যশস্য দিতে নারাজ ছিল যে, ইউনিয়ন ফুড কমিটি যখন রহিয়াছে তখন অন্য কোন ব্যবস্থা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। বিজয় এস-ডি-ওকে বলিয়াছিল, ইউনিয়ন ফুড কমিটি তো চোরদের নিয়ে তৈরী হয়েছে। এস-ডি-ও রাগতভাবে বলিয়াছিলেন, প্রমাণ ক'রতে হবে একথা।

প্রমাণ করা অবশ্যই সহজ ছিল কিন্তু যে দেশের শাসনতন্ত্রে আমেরী সাহেব হইতে চৌকিদার পর্য্যন্ত ফিকিরবাজ তাদের কাছে প্রমাণ করিলেও তা গ্রাহ্য হয় না, সেজন্য প্রমাণের পিছনে খানিকটা ক্ষমতার প্রকাশ দেখাইতে হয় অর্থাৎ আটঘাট বাঁধিয়া রাখিয়া, চোরকে সাধু বলিয়া চালাইবার পথ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। অবশ্য তাই-ই হইল।

পাঠশালার শিক্ষক হরিপদ একদা ভট্‌চাযের কাছে চাল আনিতে গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল এবং সেই প্রসঙ্গে পঞ্চুর নিকট হইতে সে শোনে যে, ভট্‌চাযের বাগানবাড়ীতে প্রচুর চাল লুকানো আছে। একদিন বিজয়দের এখানে চালের আশায় আসিয়া সে কথাটা বলিয়া ফেলিল। তদনুযায়ী

বিজয়রা গ্রামের লোককে ডাকাডাকি করিয়া ভিন-গাঁয়ের লোককে আনাইয়া সাক্ষী রাখিয়া সকলের সুমুখে সেই লুকানো চাল বাহির করিয়া ফেলিল। ব্যস আর যায় কোথায়!

উক্ত ঘটনায় বিজয়রা দুই পাখীই মারিতে পারিল। এস-ডি-ওকে বুঝাইতে পারিল যে, খাদ্য ফসল জনসাধারণের কমিটির হাতে দিতে হইবে আর ভট্চাযদের বুঝাইল যদি ধান লুঠের মামলা তুলিয়া না নেওয়া হয় তবে, চোরাকারবারের অপরাধে তাঁদেরও জেলে যাইতে হইবে।

শুধু এই কারণেই সবাই ছাড়া পাইয়াছে। শ্রীপতি, শশী, পরমেশ, দীনু, পরাণ, ইয়াসিন চাচা, দশরথ জেলে, হারাণ কামার, শরৎ তাঁতী প্রভৃতি সকলেই আবার গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে।

সাধারণ লোকের সম্মিলিত-প্রচেষ্টায় সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে। আশুর টাকায় কিছু কিছু খাদ্য ফসল ও বীজ প্রভৃতি আনা হইয়াছে। নবীন উদ্যমে আবার চাষ-বাস চলিয়াছে।

কিন্তু গ্রামকে নূতন করিয়া গড়িতে হইলে আরও প্রচুর টাকার প্রয়োজন। আশু তার যথাসর্ব্বস্ব দিয়াছে। কিন্তু আর টাকা কোথায়?

প্রথমতঃ দুর্ভিক্ষের প্রথম ধাক্কায় এবং দ্বিতীয়তঃ বন্যার ফলে লোকের ঘর-দোর, পুঁজিপাটা, এমন কি গরুবাছুর পর্য্যন্ত সবই গিয়াছে। তা ছাড়া ধান-লুঠের মামলায় যে লোকগুলা আসামী হইয়াছিল, তারা বাহিরে আসিয়া দেখিল তাদের কিছুই নাই। ঘরের মানুষগুলাও পর্য্যন্ত তাদের আজ নিরুদ্দেশ। শশীর বউ এক হাতে মালা আর এক হাতে মেয়ের হাত ধরিয়া শহরে চলিয়া গিয়াছে, শরৎ তাঁতীর ছেলেগুলা চোর হইয়াছে, দশরথ জেলের মেয়ে আদুরী আর হারাণ কামারের মেয়েগুলা গোলাপ, পদ্ম, যুঁই প্রভৃতি গুণ্ডুর সহিত পালাইয়াছে। এই তো অবস্থা!

কারও কোন টাকা পয়সা দিবার সামর্থ্য নাই। উপরন্তু ইহাদেরও যদি কোন ব্যবস্থা না করা যায় তবে ইহাদেরও অমনিতরো ভাবে শহরে চলিয়া

যাইতে হইবে। আর শহরের রাস্তায় যে কি হইতেছে তা খবরের কাগজ খুলিলেই বুঝিতে পারা যায়।

আজকাল সবাই মিলিয়াই আলোচনা হয়। ধানলুঠের মামলায় সবাই-ই অফিসে আসিয়া বসে। গরু চাই কিছু, কিছু লাঙলও চাই—তা না হইলে চাষ করা অসম্ভব। অথচ এখন একটি দিন নষ্ট হইয়া গেলে আর এ বৎসর চাষ করা সম্ভব নয়। সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িল। আশু বিজয়কে ডাকিয়া কহিল, কুসুমকে একবার বাড়ীর ভেতর থেকে ডাক দিকি বিজয়!

কুসুম প্রত্যহ রিলিফের কাজে আশুর বাড়ীতে আসে। সে আসিতেই আশু তাকে বলিল, কুসুম একটা কাজ পারবে?

কুসুম জিজ্ঞাসুভাবে বলিল, কি?

—আমি একটা চিঠি লিখে দেব, তুমি সেটা নিয়ে এক জায়গায় যাবে?

—কোথায় যেতে হবে বলুন?

—নফর ভট্চাযের বাড়ীতে। চিঠিটা নফরের ছোট বউয়ের হাতে দেবে।

তা কেন পারব না, কুসুম কহিল, তিনি কি কিছু দেবেন নাকি?

আশু গভীর বিশ্বাস সহকারে কহিল, হ্যাঁ।

এবার বিজয় কহিল, কিন্তু তা না হয় হ'ল—এমনি ক'রে দু-একজন লোকের টাকায় আমরা গ্রামকে বাঁচাতে পারব না ডাক্তারবাবু। আমাদের সমস্ত দেশবাসীর কাছে আবেদন জানাতে হবে—সবাইকে অনুভব করাতে হবে, সবাইকে টেনে আন্‌তে হবে এর মধ্যে।

সে তো আমরা করছিই, আশু কহিল, তবু তার মধ্যে যেটুকু পাওয়া যায়।

—তা অবশ্য।

পরদিন কুসুম নফর ভট্চাযের বাড়ীতে একেবারে দালানে গিয়া ছোট বউ পারুলকে আশুর চিঠিখানা দিল। নফর ভট্চায তখন বাড়ীতে ছিল না।

পারুল এক নিঃশ্বাসে সেটা পড়িয়া নিয়া কহিল, টাকা পয়সা তো আমার কাছে কিছু নেই কুসুম—

কুসুম সম্ভবতঃ খুন্ন হইয়া ফিরিয়া আসিবার উদ্যোগ করিতেছিল। পারুল কহিল, আচ্ছা দাঁড়া দিকি ঘরে আছে কিনা দেখে আসি।

কুসুম সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সম্ভবতঃ নফরের বড় বউ-ও কাছাকাছি কোথাও ছিল না। পরক্ষণেই পারুল ফিরিয়া আসিল। তারপর কহিল, তুই কাপড় পাততো কুসুম।

কথাগুলা বলিতে যতটুকু দেরী হইয়াছিল। তাড়াতাড়ি একখানা একখানা করিয়া গায়ের গহনা খুলিতে খুলিতে পারুল বলিল, আমি একখানা একখানা ক'রে দিই আর তুই কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে ফ্যাল্। এগুলো বিক্রী করবার আগে যেন কেউ দেখতে না পায়।

কুসুম মন্ত্রমুগ্ধের মত পারুলের কথামত কাজ করিতে লাগিল। এক গা গহনা খুলিয়া দিয়া পারুল অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে কহিল, কুসুম এই আমার সম্বল ছিল। আমার আরও থাকলে আমি আরও দিতুম। ডাক্তারকে বলিস্—

কুসুম ফিরিয়া আসিয়া আশুকে সব বলিলে আশুর দুই চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল।

সেদিন ডাক্তারের বাড়ী হইতে ফিরিবার পথে কুসুম বিজয়কে কহিল, দেখলে ওদের ব্যাপার?

চলিতে চলিতে বিজয় বলিল, হুঁ।

—কতদিন বাদেও কেমন ভাবে মনে রেখেছে দেখ্‌ছ!

—হুঁ।

কুসুম হাসিয়া কহিল, তুমি শুধু হুঁ-হুঁ-ই ক'রছ। ব্যাপারটা কি বলো তো?

আমি শুধু ভাব্‌ছি, বিজয় কহিল, সারা গ্রামকে কেমন ক'রে দাঁড় করানো যাবে।

সবাই মিলে যখন লাগা গেছে, কুসুম যেন আশ্বাস দিয়া কহিল, তখন দাঁড় করানো যাবেই।

হ্যাঁ, সবাই মিলিয়াই গ্রামকে দাঁড় করাইতে হইবে। যে আকুল আগ্রহ নিয়া একদিন বিজয় পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, সেই আগ্রহ নিয়া সম্ভবতঃ কুসুমও আসিয়াছে এপথে। সেই কথাই যেন তার এই কথাগুলিতে ফুটিয়া উঠিল। পুরুষ ও নারীর এই চলার পথেই সৃষ্টি ও সভ্যতার অগ্রগতি। বিজয় মনে মনে উৎসাহ অনুভব করিল।

বনমালা কাজের মধ্যে পড়িয়া পথে বাহির হইয়া আসিতে পারে নাই, কুসুম আসিয়াছে। বনমালা ও কুসুমে এই তফাৎ। তা ছাড়া বিজয় একদিন না ভাবিয়া না চিন্তিয়া নিতান্ত আবেগ ভরেই বলিয়াছিল, বনমালা আমার ঘর আর কুসুম আমার বাহির। সেই আবেগপূর্ণ কথাটাই উত্তর-জীবনে সত্য হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আবার মাঠে পড়িয়া গেল নবজীবনের সাড়া। যার যা একটু আধটু জমি ছিল সেখানেই সে চাষ-আবাদ করিতে লাগিল। নামী বর্ষায় যেরূপ ভাবে চাষ হয় তেমনিতরো চাষ।

আবার সেই প্রত্যহ ভোরে উঠা, প্রত্যহ লাঙল গরু নিয়া মাঠে যাওয়া, সেই ঘনশ্যাম আসিয়া বিজয়কে ডাকা, সেই বেঁশোপুলের নিকট শরীর দাঁড়াইয়া থাকা। তবে এবারকার চাষের সঙ্গে জীবনের অন্যান্য বৎসরের চাষের কোন তুলনা হয় না। অন্যান্য সময়ে সকলে একা-একা চাষ করিয়াছে—এবারে কিন্তু সকলে সমবেত ভাবে।

প্রত্যেকটি লোকের হাল গরু নাই। কয়েকটা মাত্র হাল গরু নিয়া দফায় দফায় সকলের ক্ষেতে আবাদ করা হইল। যা বীজ পাওয়া গিয়াছিল তাই কোন রকমে ভাগ করিয়া যে-যার ক্ষেতে লাগাইল।

শরতকাল শেষ হয় হয়। আকাশে ক্রমবর্ণায়মান মেঘ আসে, আবার ভাসিয়া চলিয়া যায়। হঠাৎ কখনও একপশলা বৃষ্টি হয়, ব্যস্ তারপর আবার তীব্র রৌদ্রালোকে মাঠ ঘাট উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। মেঘ ও রৌদ্রের এই খেলার মধ্যে ধীরে ধীরে মাঠের রূপ ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

মাটি এখন সরস। তার উপর প্রচণ্ড বন্যায় পলি পড়িয়াছে মাঠে মাঠে। ফসলের হাসি ফুটিতে বিশেষ দেরী হইল না।

মাঠের দিকে তাকাইলে আশার দোলায় মন খুশি হইয়া উঠে। সকলেরই মনে যেন একটি মাত্র কথা—আমরা ঝড় কাটাইয়া উঠিয়াছি।

ওদিকে আশু ডাক্তারের টাকায়, নফরের ছোট বউয়ের চাঁদায় এবং জনসাধারণের দুই পাঁচ টাকা করিয়া শেয়ার দিয়া 'পশ্চিমপাড়া গণ-সমবায় সমিতি' গঠিত হইয়াছে। গণ-সমবায় 'সমিতি কর্ত্তৃক এখন গ্রামে খাদ্য-দ্রব্য সস্তা দামে বিক্রয় করা হইতেছে। মাঠে ফসলের দেবতা প্রসন্ন হাসি ছড়াইয়া দিয়াছেন।

বিজয় এতদিন কোনদিকে তাকাইবার অবসর পায় নাই। এবার যেন সে উপলব্ধি করিল তারও ঘর-সংসার আছে। মা আছে, বনমালা আছে, আর আছে কুসুম।

মা বুড়ী মরে নাই। জীবনের জোয়ার যখন চারিদিকে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে তখন মানুষ মরিতে পারে না। সকল দিক হইতেই সে বাঁচিয়া উঠে। মা-ও তাই বাঁচিয়া উঠিয়াছে।

একদিন সন্ধ্যায় মা, বনমালা ও কুসুমের সহিত বিজয় আলোচনা করিতে লাগিল—কি করিয়া আবার ঠিক ঠিক ভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।

কুসুম কহিল, কাঠ কুটো বাঁশ খড় যোগাড় ক'রে ঘরটা এবারে তুলে ফেল না।

—কিন্তু পয়সার যোগাড় তো চাই।

—তাতো চাই।

—ফসল না উঠলে তো আর হাতে পয়সা আসবে না।

কুসুম কহিল, আমি যদি যোগাড়-যাত ক'রে দিই।

বিজয় বলিয়া উঠিল, তুমি এর পর পয়সা পাবে কোথায় কুসুম?

আছে, কুসুম কহিল, যে দুর্দ্দিন গেল তার চেয়েও দুর্দ্দিন একদিন আস্‌তে পারে সেই ভেবে যখের ধনের মত কিছু পয়সা আমি রেখে দিয়েছিলুম। কিছুতেই খরচ করিনি।

মা কহিল, কুসুম আমার যে এত গুছিয়ে মেয়ে তা আমি জানতুম না।

কুসুম কহিল, কি করি জ্যাঠাই—বুঝে-সুঝেই আমাকে এমনিধারা হতে হয়েছিল। তা সে যাক। এখন পথ যখন হয়েছে, গাঁয়ে যখন চাল পাওয়া যাচ্ছে, ফসলও হবে ব'লে আশা করা যাচ্ছে তখন সেই টাকা দিয়ে ঘর দোর গুলো অনায়াসেই ঠিক করা যায়।

তা যায়, বিজয় কহিল, কিন্তু দিনকতক বেশ মন দিয়ে খাটতে হবে আমাকে।

সে না খাটলে চল্‌বে কেন, কুসুম কহিল।

বিজয় কহিল, হুঁ।

'হুঁ' অর্থে বাহিরের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া বিজয়কে ঘর তৈরীর কাজে লাগিতে হইবে। সে কতখানি সময় বাহিরের কাজ হইতে ছিনাইয়া নিতে পারিবে কে জানে!

২৭

ঘর বিজয়কে তুলিতেই হইল। মা আছে, বনমালা আছে—তারা তার উপরই ভরসা করে। ঘর না তুলিলে চলে ?

কুসুম টাকা দিল। বিজয় বাঁশ কিনিয়া আনিল, পাশের গ্রাম নিমডাঙী হইতে ঘরামী ডাকিয়া আনিল এবং নিজে দিল যোগাড়।

এমনিভাবে কয়েকটা দিন কাজ করিতেই বিজয়ের ঘর উঠিয়া গেল। শুধু ঘরটুকু তুলিতে যে কটা দিন গিয়াছিল—ব্যস্ আবার বিজয়কে বাড়ীতে মেলা ভার। আসে খায় আর চলিয়া যায়। অবশ্য বাহিরে তার কাজের সীমা নাই। পশ্চিমপাড়া গণ-সমবায় সমিতি, কৃষক-সমিতি প্রভৃতির কাজ এবং তার সঙ্গে নিজেরও রুজি-রোজকারের চেষ্টা। তাই এসব করিতে গেলে বাড়ীতে সে কতটুকু সময় থাকিতে পারিবে ?

কিন্তু বনমালা হাল ছাড়ে নাই। সে নূতন উদ্যমে ঘর বাঁধিতে লাগিয়াছে। সে যেন বুঝিতে পারিয়াছে, জীবনের কোথায় যেন তার ফাঁক রহিয়া গিয়াছে। সে ফাঁকটুকুকে তাকে নিজেই পূর্ণ করিতে হইবে। কাজেই ভাল করিয়া যদি সে ঘর না বাঁধিতে পারে তবে তার জীবনে এই ফাঁকটুকু থাকিয়া যাইবে।

কুসুম তাদের যতই করুক, কুসুমও তার মত মেয়েমানুষ। কুসুমকে বনমালা ভালবাসে, কুসুমের সখিত্বও সে চায় কিন্তু যেহেতু সে মেয়েমানুষ সেই হেতু সে কুসুমকে বিশ্বাস করে না। মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষের কখনো বিশ্বাস করিতে নাই—মেয়েমানুষ মেয়েমানুষের কাছে অত্যন্ত বন্ধু সাজিয়া আসে আর বন্ধুত্বের মর্য্যাদাও রাখে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায়, যার কাছে আসে তার মনের মানুষটিকে কাড়িয়া নিয়া পালায়। তখন আর কিছুই করিবার থাকে না। তখন বড়জোর এই কথাটাই বলিতে হয়—'ও তোর মনে এই ছিল! এমনি ক'রে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলি!' কিন্তু তাতে লাভ কি ?

সে কথা বলিয়া আর পুরুষ-মানুষকে ফিরিয়া পাওয়া যায় না। পুরুষ-মানুষের স্বভাব ভ্রমরের মত। এক ফুল হইতে আরেক ফুলে বসাই তার যেন চিরাচরিত রীতি। কাজেই নিজের মনের মানুষকে ঠিক নিজেরই কাছে রাখিতে হইলে, বাহিরের মেয়েমানুষ সে যতই আপনার হইয়া আসুক না কেন তাকে এবং তার সঙ্গে নিজের মানুষকে কখনও দৃষ্টির আড়ালে রাখিতে নাই—দৃষ্টির আড়াল করিয়াছ কি মরিয়াছ। সেজন্য বনমালা ঘর গুছাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কুসুমের আকর্ষণ লোকটা যেন কখনও অনুভব না করে।

কিন্তু তা করিলে কি হইবে। কুসুম যেখানে সোজাপথ ধরিয়াছে, বনমালা সেখানে ধরিয়াছে উল্টা পথ। চৌকাঠের বাহিরে পড়িয়া আছে বিস্তৃত জগত, অনন্ত প্রসারিত সে জগতের পথ। তার পথে পথে পা ফেলিয়া চলিয়াছে যে যাত্রী, সে যাত্রীকে তো ঘরের মায়া, ঘরের ক্ষুদ্র-গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। কে জানে বনমালা সম্ভবতঃ এইটুকু তেমন করিয়া বুঝিতে পারে নাই।

কুসুম সেদিক দিয়া আদৌ ভুল করে নাই বলিতে হইবে। সে ঠিক ঠিক বুঝিয়া নিয়াছে যে এ মানুষের জাতই আলাদা। ইহাদের শাসন করিয়া টানিয়া টুনিয়া ঘরের মধ্যে ধরিয়া রাখা যায় না। ইহাদের রাখিতে হয় বাহিরে গিয়াই—জীবনের পথে পথে ইহাদের সহচরী হইয়া জননীর মত সতর্ক প্রহরা দিয়া ইহাদের সঙ্গে চলিতে হয় এবং সেই হইতেছে এইসব মানুষকে ভালবাসিবার শ্রেষ্ঠপথ ও পন্থা। কুসুম তা বুঝিবামাত্র নিজেও বাহির হইয়া পড়িয়াছে পথে। সে রিলিফের কাজে, কৃষক-সমিতির কাজে অষ্ট-প্রহর লাগিয়া থাকে—কাজেই বিজয়কে যদি কেউ পাইয়া থাকে তবে সে-ই পাইয়াছে বলিতে হইবে।

বনমালা ঘরের মানুষ। ঘর নিয়াই সে ব্যস্ত। ঘরের গণ্ডীতেই সে বিজয়কে পাইতে চায়। এই গণ্ডীর মধ্যে যে সে বিজয়কে আদৌ পায় না তা নয়। তা ছাড়া বিজয়ও তো সে মানুষ নয়। ঘরে যখন সে আসে, তখন সে

বনমালারই। বিজয় একদিন কুসুমকে বলিয়াছিল, বনমালা আমার ঘর আর তুমি আমার বাহির। বাস্তবিক তার জীবনে সে তাই আছে—এতটুকুও বদলায় নাই।

এ জগত ধনী-শাসিত জগত। এ জগতের রীতি-নীতি ধনীদেরই অঙ্গুলি নির্দ্দেশে চলে। নারীকে বন্দী করিয়া তারা ঘরে পুরিয়াছে —পুরুষ তাকে ঘরেই পায়। কিন্তু পুরুষের জীবন কি শুধু ঘরটুকুর গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবার কথা? তা তো নয়। তাকে বাহিরে যাইতেই হয়। জীবনের রসসঞ্চয় মানুষ তো ঘরে বসিয়া করে না। বাহিরেই যে তার সব কিছু। পুরুষ খনি খোঁড়ে, পাহাড় কাটে, গহন অরণ্যে নগর বসায়, নদীশাসন করে হাটবাজার, অফিস-আদালত, কল-কারখানা, চালায়—পুরুষেরই শ্রমে, পুরুষেরই আপ্রাণ চেষ্টায় সভ্যতার অগ্রগতি। কিন্তু মুস্কিল এই, তার এতবড় বাহিরের জীবনে সে সব চেয়ে একা। পাশে নাই তার জীবন সহচরী, পাশে নাই তার নারী। অথচ জীবধর্ম্মের নিয়মানুযায়ী, প্রাণধর্ম্মের রীতি অনুসারে, একথা কে না বোঝে একান্ত কর্ম্মের মাঝখানে পরিশ্রম-কাতর মানুষ চায় শীতলবারি, একটুখানি জননীর স্পর্শের মত বাতাস। কিন্তু কে দিবে তাকে এসব? বন্দীনি নারী থাকে ঘরে—বাহিরের জীবনে তাই সে নারী পুরুষের কাছে কেউ নয়। এই সহজ সরল কথাটা মানুষমাত্রেই জানে তবু মনকে চোখ ঠারিয়া চলা ধনী-শাসিত জগতের নীতি, তাই বুঝিয়াও মানুষ চুপ করিয়া থাকে, অন্ধের মত হাতড়াইয়া বেড়ায়—কি যেন সে পায় নাই। সেজন্য যে নারী পারে বাহিরে আসিতে, বাহিরের জীবনে পুরুষ মানুষ যদি তার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে তবে সে তার দোষ নয়—তার জীবনের স্বাভাবিক নিয়মেই সে ইহা করিয়াছে। বিজয়ও তাই করিয়াছে—কুসুমকে বাহিরে সে যেমন পাইয়াছে, তেমনি বনমালাকেও সে ঘরের মানুষ হিসাবেই দেখে।

বনমালা দেখে সে স্বামীকে ঠিকই পাইতেছে কিন্তু তবু কোথায় যেন ফাঁক। বাহিরে লোকটা কি করে কে জানে। বনমালা নিজেকে সান্ত্বনা দেয়—

লোকটা বাহিরে যাহাই করুক সে তো আর তার চোখের সুমুখে কিছু করিতেছে না।

ইতিমধ্যে একটা অচিন্তনীয় ব্যাপার ঘটিয়া গেল। কুসুম সেদিন বৈকালে বনমালার কাছে আসিয়া গ্রামের সব অভাব-অনটনের গল্প করিতেছিল, এমন সময় সৌরভ ও দীনু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কুসুম বলিয়া উঠিল, ব্যাপার কি রে—তোরা যুগলে?

সৌরভ বলিয়া উঠিল, ও জেল থেকে ফিরলে আমরা তো যুগলেই আছি—সে কথা তো জানিস। কিন্তু তুই এবার যুগল হবি চল্‌দিকি?

কুসুম ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, তার মানে?

মানে আবার কি, সৌরভ হাসিতে হাসিতে বলিল, তোর কত্তা এসেছে।

কুসুমের বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল।

বনমালা বলিল, বলিস্ কিরে!

সৌরভ দীনুকে দেখাইয়া বলিল, জিগ্যেস কর্।

জিজ্ঞাসা করিবার আগেই দীনু বলিতে লাগিল, আমি মাঠের ওদিকে গিস্‌লুম ক্ষেতের ঘাস মারব ব'লে, দেখি একটা লোক পোটলা-পুটুলি কাঁধে নিয়ে গেরামের দিকে আসছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে থেকে যেই লোকটা কাছে এল—জিগ্যেস করলুম, কোথা যাবে গা? লোকটা বললে, এই গেরামেই। আবার জিগ্যেস্ করলুম—এই গেরামে, তা কাদের ঘরে? লোকটা বললে, কেষ্ট মাইতির বাড়ীতে। আমি ভেবে পেলুম না, সে কুসুমের বাবার নাম করলে কেন?

বনমালা প্রশ্ন করিল, তারপর?

তারপর আর কি, দীনু বলিতে লাগিল, আমি জিগ্যেসার পর জিগ্যেসা করতে লাগলুম। সেও একটার পর একটা ক'রে কথার উত্তর দিয়ে গেল।

বনমালা বলিয়া উঠিল, এ্যাদ্দিন ছিল কোথায়?

বললে তো আসামের চা-বাগানে ছিল, দীনু বলিল।

বনমালা বলিল, তা-ই! তা শুনিছিনু যে চা-বাগানে গেলে নাকি আর মানুষ ফেরে না?

কি জানি, দীনু বলিল, লোকটা কিন্তু বাবু বেশ রংদার আছে। মাথায় লাল টুপি, বুকে আমাদের কৃষক-সমিতির কাস্তে হাতুড়ী দেয়া লাল ঝাণ্ডার মত একটা টুকরো আঁটা।

বটে, বনমালা বলিল, তাহ'লে তো এদের সঙ্গে মিলবে ভাল।

কুসুমের মনে তখন ঝড় বহিয়া যাইতেছিল। তবু তারই বেদনা চাপিয়া রাখিয়া অল্প একটু হাসিয়া কহিল, হ্যাঁ।

সৌরভ কহিল, তা আর দেরি করিস্‌নি কুসুম—চ লোকটা এসে তোর দাওয়ায় বসে রয়েছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, বনমালা বলিল, চ—চ পোড়ারমুখী চ।

হ্যাঁ কুসুম যাইবে। কিন্তু গিয়া সে কি করিবে? স্বামীকে তো স্বামীরূপে সে পায় নাই। সেই কবে—সেই বাল্যকালে তার বিবাহ হইয়াছিল, সেই, তখন সে স্বামীকে দেখিয়াছিল, তারপর আর সে দেখেও নাই। আজ দেখিলে হয়ত সে চিনিতেও পারিবে না। দুঃখে বেদনায় কুসুমের মনের কূলে কূলে কান্নার ঢেউ বহিয়া গেল যেন। সেই বাল্যকালের, সেই স্বামী তার ফিরিয়া আসিয়াছে—আজ এতদিন বাদে যদি বা সে ফিরিয়া আসিয়াছে তবে সে তো কুসুমের আনন্দেরই দিন। কিন্তু আনন্দ সে অনুভব করিতে পারিল না। না পারিবার অবশ্য যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। বহুদিন, সপ্তাহ, মাস, বৎসর সে অপেক্ষা করিয়া থাকিয়াছে—হয়ত স্বামী ফিরিবে কিন্তু দুঃখের বিষয় সে ফিরে নাই। এমনি করিয়া যখন সে একরকম নিশ্চিন্ত হইয়াই স্বামীর ফিরিয়া আসার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল এবং তার পাশে পাশে নূতন জীবন-সৌধ নির্মাণ করিয়া তুলিয়াছিল তখনই আসিয়া পড়িল তার এই স্বামী। সেই লোকটা যখন ফিরিল তখন কিছুদিন আগে ফিরিল না কেন? যদি দুদিন আগে ফিরিত তবে সে

বিজয়ের সহিত এতদূর অগ্রসর হইতে পারিত না। আজ এতখানি সে আগাইয়া গিয়াছে যে তার আর ফিরিবারও উপায় নাই। অথচ লোকাচার সমাজ, এসবকেও সে অস্বীকার করিতে পারিবে না। স্বামীকে তার স্থান দিতেই হইবে। একদিকে এই স্বামী আরেকদিকে বিজয়—কোন পথে সে যাইবে?

তা ছাড়া সে তো এমন মেয়ে নয় যে আর পাঁচজন মেয়ের মত একদিকে অভিনয় করিয়া আরেকদিক বজায় রাখিয়া যাইবে? মনের মূল্য, হৃদয়ের মূল্য যে সব মানুষেরা বুঝিয়াছে তারা আর যাই পারুক, অভিনয় করিতে পারে না। বিজয়কে সে তার সর্ব্বস্ব দিয়াছে, কাজেই আজ সেদিক হইতে সে মুখ ফিরাইয়া নিয়া আবার স্বামীর প্রতি তার কর্ত্তব্য কি ভাবে করিবে? না-না, ইহা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

এই সব ভাবিতে ভাবিতে যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াও সে যেন যাইতে পারিতেছিল না। নীরবে নির্ব্বাক অবস্থায় সে শুধু দাঁড়াইয়া রহিল।

বনমালা কুসুমকে অতঃপর এক ঠেলা দিয়া কহিল, চ না লো—চ না।

হ্যাঁ, কুসুম পা বাড়াইল। সঙ্গে চলিল তার বনমালা ও সৌরভ। দীনু বলিল, আমি বিজয়কে খবর দিই গে'—

কুসুম নীরবে শুধু দীনুর দিকে তাকাইল।

*

বিজয় সে সময় আশুডাক্তারের দেওয়া সেই কৃষক সমিতির কার্য্যালয়ে ছিল। কি একটা গভীর বিষয় নিয়া যেন সকলে মিলিয়া আলোচনা করিতেছিল।

কৃষক-সমিতি, গণ-সমবায় সমিতি প্রভৃতি গঠিত হইবার পর পুরানো মাতব্বরদের সামাজিক নেতৃত্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এক কথায় তারা কোণ ঠাসা হইয়া পড়িয়াছিল। লোকে আজকাল তাদের কথা শুনিতে চাহে না। কাজে কর্ম্মে লোকে ছোটে কৃষক-সমিতির কাছে, গণ-সমবায় সমিতির কাছে। নূতন করিয়া যেন নূতন মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে চারিদিকে।

তাই অতি সহজেই বুঝা যায় যে পুরানো মাতব্বরদের অবস্থাটা কি! তাদের নেতৃত্ব চূর্ণবিচূর্ণ হইলেও, তারা কোণ ঠাসা হইয়া গেলেও, তারা কিন্তু চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র নয়। এই অবস্থা সহ্য করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন।

যোগেশবাবু গ্রামে ছিলেন না। মিলিটারী কন্‌ট্রাক্টরী নিয়া তিনি মাতিয়া আছেন। নফর ভট্‌চায আর অধরকুণ্ডু গ্রামের জমিজমা সস্তাদরে কিনিতে ব্যস্ত, ইব্রাহিম উহাদের পিছু পিছু ঘুরে, কান্তবাবু ও ধীরেনবাবু যে যার তালে আছে। একদিন সকলে মিলিয়া শহরে যোগেশবাবুর ওখানে গেল।

সম্ভবতঃ মাঠে মাঠে সবুজ ধানচারার বিস্তৃতি দেখিয়া তারা আর স্থির থাকিতে পারিল না। একে তো মানুষের মাঝে এই নবজীবনের স্পন্দন, ইহার উপর আবার ভালো ফসল হইবে বলিয়া মনে হয়—কাজেই এ অবস্থায় যদি চাষীর পথে কোন রকম কাঁটা বিছাইতে না পারা যায় তা হইলে তো আর রক্ষা থাকিবে না।

যোগেশবাবুর ওখানে গিয়া তাই ভট্‌চায কথাটা পাড়িলেন। যোগেশবাবুর কহিলেন, তা এ অবস্থায় আমাদের কি করা উচিত বল দিকি?

ভট্‌চায বলিলেন, আমি তো মনে করছি বাকী ট্যাক্সের জন্য লালচিঠি বের করব। কারণ এ অবস্থায় লালচিঠি বের না করার কোন মানে হয়?

পল্লীগ্রামে ইউনিয়ন বোর্ডের শাসনে বাকী ট্যাক্স আদায়ের জন্য যে ওয়ারেণ্ট বের করা হয় তাকে 'লালচিঠি' বলা হয়। যোগেশবাবু কহিলেন, কিন্তু এই মন্বন্তরের বছরে লালচিঠি আমাদের বের করা কি ঠিক হবে?

ভট্‌চায কহিল, কেন হবে না? আমাদের ইউনিয়নে মন্বন্তর কোথায়?

কিন্তু আমাদের ইউনিয়ন নিয়েই তো সারা দেশ নয়, যোগেশবাবু বলিলেন, ওরা যদি লেখালিখি করে তবে আমাদের অপদস্থ ক'রে ফেল্‌বে যে!

অধর কুণ্ডু বলিল, সে কথা কিন্তু খুব ঠিক।

তাহ'লে, ভট্চায পাল্টা প্রস্তাবের জন্ম যোগেশবাবুর মুখের দিকে তাকাইলেন। যোগেশবাবু ভ্রূ কুঁচকাইয়া কি যেন ভাবিলেন। তারপর কহিলেন, আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না?

কি, ভট্চায প্রশ্ন করিলেন।

আমরা যদি সবাই মিলে অফিসিয়াল রিসিভারের কাছে যাই, যোগেশবাবু বলিতে লাগিলেন, তাঁকে গিয়ে বলি, মশাই আপনি খাজনা আদায় করছেন না ব'লে আমাদের বোর্ড চালানো মুস্কিল হয়ে পড়ছে।

ভট্চায বলিয়া উঠিলেন, সে কি একটা যুক্তি হ'ল। তাদের খাজনা আদায় করা না-করার সঙ্গে বোর্ডের কি সম্পর্ক?

অধরও বলিয়া উঠিল, তাইতো।

যোগেশবাবু কহিলেন, আরে না হে না। যুক্তি আমি দোব ঠিকই। কথাটাই আগে শোনো না?

—কি?

বলব, যোগেশবাবু বলিতে লাগিলেন, বল্‌ব যে আপনারা খাজনা আদায় ক'রছেন না ব'লে আমাদের কাজে অসুবিধে হচ্ছে। লোকে বল্‌ছে যারা বেশি টাকা পায় আমাদের কাছ থেকে, অর্থাৎ রিসিভার, তারা তাগাদা দিচ্ছে না আর তোমরা বোর্ডের ট্যাক্স দেয়া হচ্ছে না ব'লে তাগাদার পর তাগাদা লাগাচ্ছো। কাজেই আপনাদের জন্যে মশাই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি।

অধর কুণ্ডু বলিয়া উঠিল, এ কিন্তু বেশ ভাল যুক্তি হবে।

তারপর আরও শোনো, যোগেশবাবু বলিলেন, শুধু এই কথাই বল্‌ব না—বলব যে হয় আপনারা খাজনা আদায়ের জন্ম আপনাদের নায়েব-গোমস্তাকে অর্ডার দিন, না হয় আমরা আরও ওপরে জানাই।

ভট্চায এবার আশ্বস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, তা অবিশ্যি বল্‌তে পারলে মন্দ হয় না। লাল চিঠি বের ক'রে আমরা শুধু নিমিত্তের ভাগী হই কেন?

তাতো বটেই, যোগেশবাবু বলিলেন, তা ছাড়া অফিসিয়াল রিসিভার যদি মন্বন্তরের কথা তোলেন তা হ'লে বল্‌ব যে, আমরা ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার— মন্বন্তর আমাদের ওদিকে কেমন হয়েছে তা তো আমরা জানি। কাজেই আমরা যখন বল্‌ছি তখন আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে অন্ততঃ। তাই এই ভাবে ওদের দিয়ে যদি আমরা চাষা ব্যাটাদের একবার ঠেঙাতে পারি তা হ'লে আমরা তো বাঁচবই আর সঙ্গে সঙ্গে এসব ব্যাপারে আমাদের অপদস্থও হ'তে হবে না।

সেই ভাল, অধর বলিয়া উঠিল।

ভট্‌চায বলিয়া উঠিল, তা হ'লে শুভস্য শীঘ্রং—

নিশ্চয়ই, যোগেশবাবু বলিলেন, বল তো কালই যেতে পারি আমি।

—বেশ!

কথামত ব্যবস্থা হইয়া গেল। অফিসিয়াল রিসিভারের অফিসে গিয়া খাজনা আদায়ের জন্য নির্দ্দেশ দিবার সিদ্ধান্ত পাকা করিয়া যোগেশবাবুরা ফিরিয়া আসিলেন। ব্যস তারপর হইতেই গ্রামের প্রতিটি বাড়ীতে হামলা স্বরু হইল আশ্বিন কিস্তী আদায়ের জন্য।

একে এই দুর্দ্দিন, মন্বন্তর—টাল খাইতে খাইতে মানুষের জীবনযাত্রা অতিবাহিত হইতেছে। ইহার উপর যদি খাজনা, ট্যাক্স আদায়ের জুলুম চলিতে থাকে তবে লোক বাঁচিবে কি করিয়া? তাই লোকে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কৃষক-সমিতির কার্য্যালয়ে তাই সেই কথারই আলোচনা হইতেছিল।

দীনু গিয়া কার্য্যালয়ের একপাশে দাঁড়াইল। যখন কোনকিছু আলোচনা চলিতেছে তখন সহসা কথা বলাটা ঠিক নয় ভাবিয়াই সে চুপ করিয়া রহিল।

বিজয় বলিতেছিল, এই খাজনা আদায়ের হুমকির বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে—তা না হ'লে আমরা কিছুতেই বাঁচতে পারব না।

আশু কহিল, তার জন্য তো সব লোককে এক জায়গায় করা দরকার।

বেশ, বিজয় প্রস্তাব করিল, আমি ভার নিচ্ছি—গোটা তল্লাটটায় খবর দিয়ে আমরা একটা মিটিং ডাকি। আমাদের সমিতির লোকেদের সব খবরও দেয়া হোক। তাঁরাও আসুন মিটিঙে। জ্যাঠা চলে যাক শহরে তাঁদের আনতে।

আশু কহিল, হ্যাঁ—আমরাও ইদিকে ঢোল সহরৎ ক'রে গাঁয়ে গাঁয়ে বৈঠ্‌কি ক'রে লোককে সব তৈরী করি। কিন্তু কে কে আসবেন শহর থেকে ?

বিজয় কহিল, আমাদের অমলবাবু অমরবাবু তো আসবেনই। তার সঙ্গে মণিবাবু, মণিবাবুর বোন লীলা আর আমাদের গাঁয়ের ছেলে হরিহর।

ঘনশ্যাম কহিল, কিন্তু সবাই এক সঙ্গে কি আস্‌তে পারবে ?

আসতে পারবে না মানে, বিজয় কহিল, তুমি ধরে নিয়ে আস্‌বে তাদের। এমনি এমনি নয়—আমরা আমাদের সমিতি থেকে তাদের নেমন্তন্ন করব।

বেশ, ঘনশ্যাম কহিল, তোমরা সমিতি থেকে আমাকে লিখে দাও। আমি কালই যাব।

ব্যস্‌, ব্যস্‌ ঠিক আছে, বিজয় উঠিয়া পড়িয়া বলিল, যেমন খাজনার জন্তে বাড়ী বাড়ী জুলুম সুরু হয়েছে এই দুর্দ্দিনে, তেমনি এই দুর্দ্দিনেই সে জুলুমকে আমরা রুখতে পারি কিনা একবার দেখি।

আলোচনা সভা শেষ হইয়া গেল। শ্রীপতি কহিল, এ ঐ ব্যাটাদের কাজ। তা নইলে এখানকার নায়েব বাবু তো লোক খারাপ নয়।

শশী বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ হ্যাঁ—ওপর ওয়ালাদের লাগিয়ে এসেছে এ আর বুঝতে পারছনি ?

লাগাক্ ওপরে, বিজয় কহিল, কতধানে কত চাল হয় এবার দেখুক একবার। তারপর ঘনশ্যামের দিকে তাকাইয়া কহিল, আর ভাখো জ্যাঠা শহরে গিয়ে ওদের বল্‌বে কাগজ ছাপিয়ে দিতে—সব্বায়ের নাম দিয়ে দিতে বল্‌বে। আর লেখাটা যেন খুব তেজী হয়।

আচ্ছা, আচ্ছা ঘনশ্যাম হাসিয়া কহিল।

দীনু দেখিল, এইবার কথাটা পাড়া যাইতে পারে। বিজয়কে ডাকিয়া সে কহিল, এই একটা খবর আছে।

বিজয় কহিল, কি ?

—কুসুমের বর এসেছে।

বিজয় সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কুসুমের বর !

—হ্যাঁ।

আশু কহিল, কি কি—কার বর এসেছে বল্‌লি দীনু !'

—কুসুমের।

কুসুমের বর আসিয়াছে। একে একে কথাটা সকলেই বিস্মিতভাবে গ্রহণ করিল ও তাই নিয়া আলোচনা সুরু করিয়া দিল। আশু কহিল, সেই জন্যেই বুঝি কুসুম আসেনি আমাদের আজকের এই আলোচনায় ?

বিজয় কহিল, কি জানি। আশু কহিল, কখন এল ?

দীনু কহিল, এই খানিক আগে।

—এ্যাদ্দিন ছিল কোথায় ?

—আসামের চা-বাগানে।

চা বাগানে, সবিস্ময়ে আশু কহিল, তা হ'লে লোকটাকে কি চা-বাগানে ধ'রে নিয়ে গিস্‌ল।

বিজয় কহিল, তা হবে।

দীনু কহিল, লোকটা কিন্তু বেশ রংদার। মাথায় লাল টুপি, বুকের কাছে জামার ওপর আমাদের এখানকার লাল ঝাণ্ডার মত টুক্‌রো একটা ঝাণ্ডা আঁটা।

বলিস্ কিরে, আশু কহিল, তা হ'লে কি আমাদেরই মত নাকি ?

দেখতে হয়েছে তা হ'লে বলিয়া বিজয় যাইতে উদ্যত হইল। আশু কহিল এসে তা হ'লে খবরটা দিস্।

আচ্ছা, বলিয়া বিজয় চলিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তার গেল পরমেশ, জীবন, পরাণ, শ্রীপতি এবং আরও অনেকে।

কুসুমের বাড়ী ইতিমধ্যেই লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। অপরাহ্ণ পার হইয়া তখন সন্ধ্যার ছায়া নামিতে সুরু করিয়াছে। সেই পোড়া ঘর খানার সাম্‌নেকার ঘরের দাওয়ায় আসিয়া বসিয়াছে কুসুমের স্বামী। দীর্ঘ ঋজু দেহ লোকটার, রঙটা ঈষৎ কাল্‌চে। মাথায় লাল টুপিটা তেমনি ভাবেই লাগানো। বুকে লালঝাণ্ডার ব্যাজ আঁটা। কুসুম বুঝি একখানা মাদুর পাতিয়া দিয়াছিল, তাতেই বসিয়াছে।

কুসুম ঘরের মধ্যে। ঘরে তার সঙ্গে আছে বনমালা, সৌরভ, গাঁয়ের আরও কতকগুলি বউ। কুসুম আজ সর্ব্বপ্রথম মাথায় ঘোমটা দিয়াছে। ঘোমটা দিয়া সে সকলের সহিত গল্প-গুজব করিতেছে। বনমালা বলিল, ওলো পোড়ারমুখি এমন ক'রে বসে থাকিস্‌নি—লোকটার খাবার দাবার যোগাড় কর।

লোকটার সঙ্গে প্রথম পরিচয় দীনু আর সৌরভেরই হইয়াছিল। সৌরভই কুসুমকে লোকটার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল। তাই সৌরভ যেন বেশ গর্ব্ব অনুভব করিল। সে কুসুমকে জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁরে ঠাকুর জামাইয়ের নাম কি রে?

কুসুম কহিল, জিগ্যেস ক'রগে না—

ঘর হইতে দাওয়ায় আসিয়া সে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ ঠাকুর জামাই—ভাই তোমার নামটি কি?

লোকটা বলিল, প্রদ্যুম্ন।

হ্যাঁ, নামটা কুসুমেরও মনে আছে। সৌরভ বলিয়া উঠিল, পোদ্দ্‌মনু—

হ্যাঁ, প্রদ্যুম্ন ঘাড় নাড়িল।

বিজয়, দীনু, শ্রীপতি, পরমেশ, জীবন, প্রভৃতিও আসিয়া পড়িল।

বিজয় আসিতে কুসুম অবাক হইয়া গেল। প্রদ্যুম্ন ফিরিতে কুসুমের মনে ঝড় বহিয়া যাইতেছে, কে জানে ভবিষ্যৎ তার কোনপথে। কিন্তু আশ্চর্য্য, বিজয় সোজাসুজি তার এখানে ছুটিয়া আসিয়াছে—মনে কোনরূপ তার চাঞ্চল্যও দেখা দেয় নাই। কে জানে পুরুষ মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী মন কেমন!

বিজয় আসিতেই কুসুম যেন কেমন কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি আরেকখানা মাদুর আনিয়া সে বিজয় ও আর সবাইকে বসিতে দিল।

শ্রীপতি আসিয়াই প্রদ্যুম্নকে প্রশ্ন করিয়া বসিল, ভায়ার নামটি কি জান্‌তে পারি?

প্রদ্যুম্ন হাসিয়া নাম বলিল।

বিজয় দেখিল দীনু ঠিকই বলিয়াছিল। লোকটা বেশ রংদার—মাথায় লাল টুপি, বুকে কাস্তে-হাতুড়ী চিহ্ন দেয়া লাল ঝাণ্ডার মত ঝাণ্ডা আঁটা। ঐ চিহ্নগুলা দেখিয়া লোকটাকে আর দুরন্তরের মানুষ বলিয়া মনে হয় না—যেন লোকটার সঙ্গে তাদের অনেক দিনের পরিচয়।

এতগুলি পুরুষ মানুষকে একসঙ্গে আসিতে দেখিয়া প্রদ্যুম্ন খুশি হইয়া উঠিল। সে যেন বেশ বুঝিতে পারিল—এগ্রামের মধ্যে লোকের বেশ ঐক্য আছে এবং ইহারা পরস্পর দল বাঁধিয়াই বাস করে। তাই এত সহজেই তারা তার আগমন উপলক্ষ্যে একেবারে এই বাড়ীটায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ছোট-খাটো তুচ্ছ ঘটনায় মানুষ কত বড় জিনিসের পরিচয় পায়—তা এই সামান্য ঘটনাটুকু হইতেই প্রদ্যুম্ন টের পাইল।

প্রদ্যুম্ন যেন এবার বাঁচিল। এতক্ষণ মেয়েদের মাঝখানে সে যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। এবার সে কথা কহিতে পারিবে। তাই উহাদের দিকে তাকাইয়া সে বলিয়া উঠিল, গ্রামখানা কিন্তু এসেই আমার ভাল লেগে গেল।

সৌরভ কহিল, লাগবারই যে কথা ভাই। এখানে তো তোমার সবই পড়ে রয়েছে।

সকলে হাসিয়া উঠিল।

প্রদ্যুম্ন বলিয়া উঠিল, না ঠিক তা নয়। তারপর মুহূর্ত্তখানেক থামিয়া বলিল, আচ্ছা পথে আসতে আসতে নজরে পড়ল প্রকাণ্ড একটা বাঁশে দুল্‌ছে একটা লাল ঝাণ্ডা। এখানে লালঝাণ্ডার কাজকর্ম্ম হয় তা হ'লে!

কুসুম এবার সকলের সুমুখেই বলিয়া উঠিল, হয় তা হ'লে মানে—ভালই হয়।

প্রদ্যুম্ন স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল—আমারও তাই মনে হয়।

কুসুম কখনও স্বামীর সহিত ঘর করে নাই। আর পাঁচ জন মেয়ে যে ভাবে স্বামীর সহিত বসবাস করিয়াছে, প্রথমটায় সে তাদেরই মত ঘোমটা টানিয়া পাঁচ জনের দৃষ্টির সম্মুখে লজ্জানত ভাবে চলিবার চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে দেখিল যে লালঝাণ্ডা প্রভৃতির কথা আসিয়া পড়িয়াছে সেই মুহূর্ত্তে সে নিজের সুমুখ হইতে সর্ব্বপ্রকার কৃত্রিম লজ্জা-বাধা পরিহার করিয়া সোজাসুজি কথা বলিতে আগাইয়া আসিল এবং সেই জন্যই সে অমন করিয়া বলিয়া ফেলিল।

কথাটা প্রথমটায় একটু বেসুরোই শুনাইয়াছিল। কিন্তু তা শুনাক। কুসুম যেন কেমন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে আজ যদি সে সকলের সুমুখেই নিজের অধিকার অর্থাৎ সে যে আলাদা একটা মানুষ, তার একটা অস্তিত্ব আছে এবং তা ছাড়া সে দেশ ও দশের—এই কথাটা সাব্যস্ত করিয়া না নিতে পারে তা হইলে তার সবকিছুই যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেও যাইবে।

প্রদ্যুম্ন তেমনিভাবেই প্রশ্ন করিল, এখানে লালঝাণ্ডার কর্ম্মী কারা?

এই তো সুমুখে রয়েছে, কুসুম আঙুল দিয়া বিজয়কে দেখাইয়া দিয়া কহিল, এই তো এখানে প্রথম লাল ঝাণ্ডা এনেছে।

তাই নাকি, প্রদ্যুম্ন বলিয়া উঠিল, আপনি তা হ'লে তো আমার একান্ত বন্ধু।

বিজয়ের মুখচোখ আরক্ত হইয়া উঠিল। কুসুম তাকে অমনভাবে স্বামীর

সহিত পরিচয় করাইয়া দিতেছে আর তার স্বামী তাকে অমন করিয়া কাছে টানিয়া নিতেছে। আরক্ত ভাবেই সে চুপ করিয়া রহিল।

প্রদ্যুম্ন কহিল, কি কথা বলছেন না যে বন্ধু! লাল ঝাণ্ডার কোন দেশ নেই। জগতের একদিক থেকে আরেকদিকে যেখানেই যাব, যার হাতে দেখব রয়েছে লালঝাণ্ডা সেই হবে আমার বন্ধু, আমার ভাই।

মুগ্ধ হইয়া বিজয় প্রদ্যুম্নের কথা শুনিতে লাগিল। কুসুম ও বিজয়ের মাঝে আসিয়া পড়িয়াছে এই লোকটা। এই লোকটার উপস্থিতি যেমন একদিকে তাকে পীড়া দিতেছিল, তেমনি আর একদিকে তার কথাগুলি তাকে অত্যন্ত আনন্দিত করিয়া তুলিতেছিল। দুঃখ ও আনন্দের এই দ্বৈত-সংঘাতে মনটা বিজয়ের কি যেন একটা পথ খুঁজিতেছিল। মনের ভিতর কে যেন বলিয়া উঠে, তুমি ভুলিয়া যাও—ভুলিয়া যাও কুসুমকে। এবার তোমার সরিয়া পড়ার পালা। কিন্তু কেন?

পৃথিবীতে সব কিছু মানুষ ভুলিতে পারে, সব কিছু হইতে মানুষ সরিয়া দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু ভালবাসা মানুষ ভুলিবে কি করিয়া? ভালবাসার পথ হইতে [সে সরিয়া দাঁড়াইবে কি করিয়া? ভালবাসা মানুষকে দুঃখ ও বেদনার পথ অতিক্রম করিয়া লাভ করিতে হয়। সেই দুঃখ দিয়া, বেদনা দিয়া সে যা অর্জ্জন করিয়াছে তাকে সে খোয়াইবে কেন, কিসের জন্য? মানুষ মানুষকে ভালবাসে কেন? কিসের জন্য কুসুমকে সে ভালবাসিয়াছে? যেদিন সীতার কঙ্কালটা দাহ করিয়া আসিয়া সেই নিশীথরাত্রে সে কুসুমের ওখানে গিয়াছিল সেদিন সে কুসুমকে বলিয়াছিল, আমি এসেছি একটুখানি নিঃশ্বাস ফেল্‌তে, দুঃখের জালা থেকে জুড়োতে। কেন সে নিঃশ্বাস ফেলিতে চায়, কেন সে দুঃখের জ্বালা হইতে জুড়াইতে চায়—সজীব মানুষ হইয়া আবার জীবনের চলার পথে চলিবে বলিয়াই তো? কাজেই কুসুম যে তার চলার পথের সাথী—তাকে রাখিয়া সে সরিয়া যাইবে কেন?

কিন্তু সহসা তার মনে হয় এই লোকটা না আসিয়া কুসুম যদি আজ মরিয়া

যাইত তা হইলে কি সে তার চলার পথে চলিয়া যাওয়া বন্ধ করিয়া দিত? কি করিত সে? কুসুম মরিয়াছে বলিয়া তো সেও সঙ্গে সঙ্গে মরিত না। সে বাঁচিয়াই থাকিত। তা হইলে? কুসুমের মৃত্যুর পরেও যদি সে পথ চলিতে পারে তবে আজই বা এই লোকটার আগমনে সে পথ চলিতে পারিবে না কেন? নিশ্চয়ই পারিবে। জীবনের পথে চলাটাই তো মানুষের জীবনে শ্রেষ্ঠ কামনা, শ্রেষ্ঠ সাধনা। যে ভালবাসা মানুষকে সেই কামনা পূর্ণ করিতে দেয় না, সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে দেয় না—সে ভালবাসা আর যাই হোক্ সমর্থন যোগ্য নয়।

কিন্তু এ সমস্তটাই তো নির্ভর করিতেছে কুসুমের উপরে—সে কি করিবে না করিবে তারই উপরে। তার প্রতি কুসুমের ভালবাসা যদি মহৎ ভালবাসাই হয় তবে সে কখনো জীবনের এই চলার পথ হইতে নিজেও সরিয়া আসিবে না আর বিজয়কেও সরাইয়া আনিবে না।

কিন্তু তার না সরিলেও তো চলিবে। এই তো তার স্বামী প্রদ্যুম্ন, তারা যে পথের পথিক সেই পথেরই কথা বলিতেছে। কাজেই কুসুমকে তো পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে হইবে না। সে এ পথে চলিতে পারিবে। কারণ তার স্বামীর পথ আর তার পথ একই পথ হইবে। কিন্তু বিজয়ের পথ? বিজয়ের পথও অবিশ্যি সেই পথই থাকিবে কিন্তু সেদিন কুসুম আর তার সাথী নয়, সে একা!

অথচ প্রদ্যুম্ন এইমাত্র বলিল, জগতের একদিক থেকে আরেক দিকে যেখানেই যাব, যার হাতে দেখব রয়েছে লালঝাণ্ডা সেই হবে আমার বন্ধু, সেই হবে আমার ভাই। বিজয় কি একবারও সেকথা ভাবিতে পারিবে না? তা যদি সে ভাবিতে পারে তবে কুসুম তার নিকট হইতে দূরে রহিল কোথায়?

প্রদ্যুম্নের উপস্থিতি একদিকে বিজয়কে পীড়া দিতেছিল, আরেকদিকে তার কথাগুলা তাকে উৎসাহিত করিতেছিল—এই দুই অবস্থার দ্বন্দ্বে তার মন একটা পথ খুঁজিতেছিল। সে পথ হইতেছে এই পথ, যাই ঘটুক না কেন তারা

এক পথেই আছে। কাজেই তাদের ভালবাসার একদিকটা অন্ততঃ মুছিবে না। কিন্তু তবু প্রশ্ন থাকিয়া যায় মনে, বিশেষ করিয়া কুসুম যেখানে একটি মানুষ এবং সেই মানুষ যখন আবার একজন স্ত্রীলোক—সেই স্ত্রীলোক কুসুমের কাছে তার স্থান কোথায়? সে দায়িত্ব সে শুধু কুসুমের উপর চাপাইয়া দিয়া বসিয়া থাকিতে পারিবে না? এ সম্বন্ধে তাকে কিছু করিতেই হইবে।

তবু বিজয়ের মাথাটা যেন কেমন ঘুলাইয়া উঠিল। সেই অবস্থায় সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া শুধু প্রদ্যুম্নের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। প্রদ্যুম্নের মুখে চোখে কেমন একটা দেশান্তরের ছায়া। ভাল লাগে দেখিতে।

প্রদ্যুম্ন নিজের সহযাত্রী মানুষের সন্ধান পাইয়াছে। তার মনের সমস্ত দরজা যেন খুলিয়া গিয়াছে। সে বলিয়া চলিল, অদ্ভুত এই লালঝাণ্ডা। মানুষ ক'রে দিয়েছে আমাদের। থাকৃতুম চা-বাগানে—দশ বছর ধ'রে গাছের পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে বোঝা ভর্ত্তি করিছি, দশ বছর ধ'রে কাজের তদ্বির তদারক করিছি। আর সেই ধাওড়ার পর ধাওড়া, তার মধ্যে মাথা গুঁজে থেকিছি। মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে হল্লা। কুৎসিত, জঘন্য অবস্থায় দিন কাটাতুম। লাল ঝাণ্ডা এল তারপর একদিন—জীবনটাকে একেবারে দিলে ঘুরিয়ে।

হ্যাঁ লাল ঝাণ্ডা বিজয়েরও জীবনকে দিয়াছে ঘুরাইয়া। গ্রামের একজন সাধারণ কৃষক যুবক সে। দেশের কথা, দশের কথা, মানুষের জীবনের কথা সে হয় তো কোনদিনই ভাবিতে শিখিত না—অত্যাচার ও অবিচার সহিয়া ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাইয়া কুৎসিৎ হইতে কুৎসিততর জীবনযাত্রার মধ্যে পড়িয়া হয় তো কোনরকমে দিন গুজরাণ করিয়া যাইত।

প্রদ্যুম্ন বলিয়া চলিল, যেদিন থেকে জীবনটা পাক খেলে সেদিন থেকে যেন বুঝতে পারলুম, হ্যাঁ মানুষের জীবনেরও একটা অর্থ আছে। মনে পড়ল আমার—আমারও ঘর আছে, সংসার আছে, আমারও কর্ত্তব্য আছে তাদের ওপর। সেদিন থেকে মনটা কেবলই হাহাকার করেছে। আজকে পড়ে আছে সে জীবন আমার অতীতে, আমি নতুন মানুষ। আজ পথে পেয়েছি

অনেক ভাই বন্ধু, অনেক নতুন যুগের পথিক। সেখানে আমার ইউনিয়ন আছে, চা-বাগানের কুলী ভাই তারা। কুলী হোক্ তারা তবু তাদের চোখে-মুখে নতুন দিনের আলোমাখা পথে চল্‌বার কি কঠিন প্রতিজ্ঞা! কথাগুলা ভাবের আবেগে বলিয়া প্রদ্যুম্ন কেমন যেন নিজেকে একটু সামলাইয়া নিল। তারপর কহিল, যাক্ এখন এখানে সব আপনাদের কাজকর্ম্ম কি রকম হচ্ছে?

ভালই, বিজয় কহিল, এই তো বন্যা গেল, বন্যায় রিলিফ, রিলিফের পর আবাদ, আবাদের পর গণ-সমবায় করা হয়েছে, এখন তো খাজনা আদায়ের জুলুমের বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছি।

—কি রকম সাড়া পাচ্ছেন চারিদিকে?

—মানুষের দুঃখ কাণায় কাণায় ভরে উঠেছে কাজেই সাড়াও সেই অনু-পাতেই পাওয়া যাচ্ছে।

—বিরুদ্ধ দল নেই?

—তা আর থাকবে না? সে ঠিকই আছে। তবে তারা পেরে ওঠে না এই যা!

প্রদ্যুম্ন সপ্রশংস ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিল, তা হ'লে তো একটা কাজের মত কাজ করেছেন বন্ধু—

বিজয় হাসিল।

কুসুম এবার শ্রীপতির দিকে তাকাইয়া কহিল, সবাই কথা বল্‌ছে কিন্তু ঠাকুরদা যে বড় চুপ ক'রে রয়েছ?

আমি শুন্‌ছি নাত-জামায়ের কথা, শ্রীপতি বলিয়া উঠিল। বিজয় এই ফাঁকে পরমেশের দিকে তাকাইয়া কহিল, ওরে পরমেশ বেলা পড়ে আস্‌ছে। যা তাড়াতাড়ি গণ-সমবায় খুল্‌গে। লোকে চাল ডাল নিতে এসে তা না হ'লে ফিরে যাবে।

পরমেশ আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিল—সন্ধ্যার ছায়া পড়িয়াছে

প্রকৃতির প্রাঙ্গণে। প্রতিদিন এই সময়ে তাকে গণ-সমবায় খুলিতে হয়। ইহার দরুণ মাসিক দশ টাকা করিয়া সে পারিশ্রমিক পায়। জমি জায়গা তার কিছু নাই—এই দশ টাকায় তাকে দিন গুজরাণ করিতে হয়। সে বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ, এই যে যাই—

প্রদ্যুম্ন বিজয়ের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, গণ-সমবায় সমিতি কি ?

—সস্তা চাল ডালের দোকান।

—বটে ! এটা তো খুব একটা মস্ত বড় কাজ করেছেন দেখছি।

—এই আকালের দিনে এ ছাড়া আর উপায় কি বলুন না !

আর কিছু না হোক, প্রদ্যুম্ন বলিতে লাগিল, শুধু এই জন্যেই আপনারা এখানে চিরকাল অজেয় হয়ে থাকবেন। আপনারা আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন বন্ধু—

বিজয় উৎসাহ সহকারে বলিয়া উঠিল, আপনার কথাবার্ত্তা শুনে মনে হচ্ছে আপনিও কম যান না। আপনিও আমাদের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন বন্ধু—

প্রদ্যুম্ন মজুর শ্রেণীর লোক। সে আদব-কায়দায় কৃষকদের অপেক্ষা অনেকখানি কেতাদুরস্ত। সে হাত বাড়াইয়া দিল বিজয়ের দিকে। বিজয় একটু ইতঃস্তত করিল কিন্তু পরক্ষণেই হাত বাড়াইয়া দিয়া করমর্দ্দন করিল।

কুসুম নিতান্ত সচেতন ভাবেই বলিয়া উঠিল, আজ এইখানেই কথাবার্ত্তা থামানো হোক। তা না হ'লে শেষ পর্য্যন্ত সব ফুরিয়ে যাবে।

হ্যাঁ ফুরিয়ে যাবে, বিজয় বলিয়া উঠিল, বন্ধুর আমাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করো। আমরা এখন আসি—

আচ্ছা, প্রদ্যুম্ন কহিল, আমি কিন্তু কাল আপনাদের সঙ্গে আপনাদের অফিসে যাব।

বেশ ত, বিজয় উঠিয়া পড়িল।

বনমালা ঘরের ভিতর হইতে সৌরভের দিকে তাকাইল। সৌরভ বুঝিল

যে বিজয় বাড়ী ফিরিতেছে অথচ বনমালা এখানে—এই কথাটাই বিজয়কে জানাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সৌরভই বা জানায় কি করিয়া? সে তাকাইল কুসুমের দিকে। কুসুমই কথাটা বলিল।

বিজয় ঘাড় নাড়িয়া বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিল। পরমেশ আগেই চলিয়া গিয়াছিল। বিজয়কে চলিয়া যাইতে দেখিয়া শ্রীপতি জীবন প্রভৃতিও বাহির হইয়া পড়িল। পথে যাইতে যাইতে শ্রীপতি কহিল, লোকটা বেশ ওস্তাদ লোক হে।

জীবন বলিল, এত সুন্দর কথাবার্ত্তা বলে।

বিজয় কহিল, হুঁ।

২২

বাড়ী পৌছাইতেই বিজয় দেখিল দাওয়ায় বসিয়া আছে মা। মা বলিল, হ্যাঁরে বউমা গেল কোথায় বলদিকি ?

—কেন সে তো কুসুমের ওখানে।

তা ব'লে যায় তো মানুষ. মা বলিল, আমি পুকুরে গেস্লুম—এসে দেখি ঘর দোর সব হাট ক'রে খোলা।

সময় পায়নি সম্ভবতঃ, বিজয় কহিল, শুনেছে আর ছুটেছে—

সবিস্ময়ে মা প্রশ্ন করিল, কি শুনেছে ?

শোননি তুমি, বিজয় কহিল, কুসুমের বর ফিরেছে।

—তাই নাকি !

—হ্যাঁ গো।

তবে যাই যাই, মা বলিল। আমি একবার দেখে আসি। আহা-আ মেয়েটা বড় দুঃখী। তারপর বিজয়ের দিকে তাকাইয়া বুড়ী কহিল, তুই এখন থাকবি তো ?

—হ্যাঁ।

—তা হ'লে আমি আসি।

—আসবার সময় ওকে ডেকে নিয়ে এসো।

আচ্ছা, বলিয়া বুড়ী বাড়ীর বাহিরে পা বাড়াইল।

মা বুড়ী চলিয়া যাইতে বিজয় দাওয়ায় একটা চেটাই বিছাইয়া চুপ করিয়া বসিল। দুই হাত দিয়া মাথাটা বার কয়েক যেন ঝাঁকানি দিয়া নিল। মাথাটা তার কেমন যেন ঘুলাইয়া গিয়াছিল। হ্যাঁ, ঘুলাইয়া যাইবারই তো কথা।

জীবনে কখন এমনতরো সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইবে, ইহা সে

কোন দিনই ভাবে নাই। একদিকে কুসুম আরেকদিকে কুসুমের স্বামী—কাকে ফেলিয়া সে কাকে গ্রহণ করিবে? প্রদ্যুম্ন তো লোক মন্দ নয়। যেমনি দীর্ঘ ঋজু চেহারা, তেমনি মানুষের মত মানুষ। কি সুন্দর কথা বলে। আসামের চা-বাগানে লোকটা জীবনপাত করিয়া, একদা লালঝাণ্ডার নীচে আসিয়া জীবনের অর্থ খুঁজিয়া পাইয়াছে, ইউনিয়ন গঠন করিয়াছে, কুলী-ভায়েদের চোখে মুখে ফুটাইয়া তুলিয়াছে নূতন দিনের আলো দেখিবার কঠিন প্রতিজ্ঞা। এ মানুষকে তো উপেক্ষা করা যায় না। অত্যন্ত আপনার ভাবিয়া গলা জড়াইয়া ধরিতে হয়। এমন মানুষের কাছ হইতে তো কুসুমকে ছিনাইয়া লওয়া বিজয়ের উচিত নয়।

কুসুমের কথা মনে পড়িতেই বিজয় যেন আবার সব কিছু ঘুলাইয়া ফেলিল। মনে মনে যুক্তি রচনা করিতে লাগিল—কুসুমকে সে ছিনাইয়া নিতেছে কোথায়? বরং প্রদ্যুম্ন আসিয়া তার কাছ হইতে কুসুমকে কাড়িয়া নিবার অবস্থাই সৃষ্টি করিয়াছে যেন। কিন্তু কেন এই কাড়াকাড়ি?

এ প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। নরনারীর ভালবাসার মধ্যে তৃতীয় মানুষের কোন স্থান নাই। বার বার তার শুধু এই একটি কথাই মনে হইতে লাগিল।

কিন্তু বিজয় একি করিতেছে? সে কেবল নিজের কথাটাই বেশি করিয়া ভাবিতেছে যেন। ভালবাসা বলিতে কি বোঝে সে? কুসুমই কি তার সর্ব্বস্ব? হাঁা হয় তো কুসুম তার কাছে তাই। কিন্তু তার চারিপাশে রহিয়াছে আরও অনেক মানুষ—বনমালা, মা আর এই প্রদ্যুম্ন। কুসুমের কথা উঠিলে ইহাদেরও সে, বাদ দিতে পারে না। পারা তার পক্ষে সম্ভবও নয়। কোথা হইতে যেন ইহারা আসিয়া পড়ে। তা ছাড়া আরও একটা মস্তবড় কথা তার ভাবা উচিত—তা হইতেছে কুসুমের নিজের কথা। কুসুমকে ঘিরিয়া সে নিজেই আবোল-তাবোল ভাবিয়া চলিয়াছে কিন্তু একবারও কি সে ভাবিয়াছে, কুসুমের নিজেরও একটা সত্তা আছে। ভালবাসা তার কিছু একলাকার সম্পত্তি নয়। সে যেমন এই সব সাতপাঁচ ভাবিতেছে কুসুমও তো ভাবিতে পারে!

তাদের ভালবাসার মাঝখানে তৃতীয় মানুষ আসিয়াছে তাকে ঘিরিয়া নয়—কুসুমকে ঘিরিয়াই। কাজেই আসল পরীক্ষা কুসুমের, বিজয়ের নয়।

এই প্রসঙ্গে তার মনে পড়িয়া যায় বনমালা ও তার কথা। বনমালা ও সে—স্বামী আর স্ত্রী। তাদের স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে কুসুম তৃতীয় মানুষ। সেই তৃতীয় মানুষ আসিয়াছিল বিজয়কে ঘিরিয়া, বনমালাকে ঘিরিয়া নয়। কাজেই বনমালা ও তার মধ্যে আসল পরীক্ষাটা ছিল বিজয়ের, বনমালাকে সে সম্বন্ধে কিছু ভাবিতে হইলেও কিছু করিতে হয় নাই।

কাজেই যা তা সব ভাবিয়া কেন সে এত উতলা হইতেছে? দেখাই যাক্ না শেষ পর্য্যন্ত কুসুম কি করে।

কিন্তু আশ্চর্য্য মেয়ে ঐ কুসুম। বিজয় যেন আজ সর্ব্বপ্রথম প্রত্যক্ষ করিল কুসুম কি রকম বুদ্ধিমতী মেয়ে। যে মূহূর্ত্তে সে উপলব্ধি করিল স্বামীর সম্মুখে নিজের অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য নিয়া ফুটিয়া উঠা দরকার, সেই মুহূর্ত্তেই সে অকারণ লজ্জা সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া সকলের সামনে স্বামীর কাছে বিজয়কে এক বিশেষরূপে ফুটাইয়া তুলিল। কিন্তু কেন সে এমন একটা দুঃসাহসিক চেষ্টা করিল? ইহার পিছনে তার কিসের প্রেরণা আছে? হয়ত সে চায় তাকে তার স্বামী যেন শুধু বিবাহিত স্ত্রী-ই না ভাবে। তার কাছে শুধু যেন তার স্বামী স্বামিত্বের দাবী না নিয়াই আসে। তবে কি নিয়া তার স্বামী তার কাছে আসিবে? কুসুম কি বলিতে চায় স্বামীকে?

কুসুম মানুষ; তার মন আছে, হৃদয় আছে। পারিলে তার বলা উচিত স্বামীকে—তুমি মানুষের যথাযোগ্য মূল্য দিও। বিজয়ের মনে হয়—কুসুম যদি একথা প্রদ্যুম্নকে বলিতে পারে তবে নিশ্চয়ই প্রদ্যুম্ন তা উপেক্ষা করিবে না? উপেক্ষা করিবার মত মানুষ সে নয়। সেও যে তাদেরই মত নব-জীবনের পথে যাত্রী।

কিন্তু কুসুম যদি স্বামীকে সে কথা না বলে, তাতে কি আসে যায়? বিজয় সরিয়া আসিতে পারে না?

কিন্তু সরিয়া সে যাইবে কোথায়? পথ তো তার সামনে এবং সেপথে প্রদ্যুম্ন থাকিবে, কুসুমও থাকিবে এবং থাকিবে আরও অনেকে।

হঠাৎ তার মনে পড়িয়া গেল। জীবনের এই চলার পথ হইতে সে যদি ফিরিয়া দাঁড়ায়। তা হইলে কেমন হয়? তা হইলে প্রদ্যুম্ন ও কুসুম তাকে বাদ দিয়াই যাত্রাপথে আগাইয়া যাইবে এবং সেই যাওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই বিজয়ের যেন মনে হয় ভালবাসাটা দুটা বিপরীত মুখী আদর্শের মধ্যে সম্ভবতঃ জন্মলাভ করে না। হয় তো তাই—তা না হইলে স্বামী ও স্ত্রীর জীবন-ধারা বা মতামতে মিল খায় না বলিয়া কত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ভালবাসার নামগন্ধ নাই তা সে বহু ঘরে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা নির্ভর করে বোধ হয় তাদের মতামতের ঐক্যের উপরে, আদর্শের উপরে। মানুষ জগতে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে সম্ভবতঃ তার মতামত ও আদর্শকে। সেই মতামত ও আদর্শের সঙ্গে যে ছেলেমেয়ের বা দম্পতির মিল থাকে তারাই পৃথিবীতে সত্যকারের ভালবাসা কি তার আস্বাদ পায়। তা ভিন্ন আর সবাই মনকে হয় চোখ ঠারে নয় তো কোন রকমে জোড়াতালি দিয়া জীবনযাত্রা বজায় রাখিয়া যায়।

হ্যাঁ বিজয় যেন পাইয়াছে—সে যা খুঁজিতেছিল তা সে পাইয়াছে। বিজয়ের জীবনের পথে কুসুম যদি চলিতে থাকে, যদি তার আদর্শের সঙ্গে মিল থাকে কুসুমের, তবে সেই তো তার প্রতি সবচেয়ে ভালবাসা রহিল তার! শুধু দেহের পাওয়াটাই কি বড় ভালবাসা? না তাই নিয়া মানুষ সুখী হয়?

বিজয়ের কপালে বুঝি বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটিয়া উঠিয়াছিল। দুইহাতে কপাল ও মুখমণ্ডলটা মুছিয়া নিয়া সে যেন কি ভাবিল। যেন সে অত্যন্ত ক্লান্ত, হইয়া গিয়াছে! তাই সে তামাক ধরাইবার উদ্দেশ্যে উঠিয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে মা ও বনমালা আসিয়া পড়িল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

মা বুড়ী বলিয়া উঠিল, বেশ ছেলেটি কিন্তু।

বনমালা কহিল, আমি কিন্তু ভারী খুশি হয়িছি।

তামাকে অগ্নিসংযোগ করিতে করিতে বিজয় একবার বনমালার দিকে তাকাইয়া নিল। বনমালা কোনকিছু মনে করিয়া কথাটা বলে নাই—একটা মেয়ে দীর্ঘকাল পরে তার স্বামীকে ফিরিয়া পাইয়াছে এই দরদেই সে আনন্দ-প্রকাশ করিতেছিল মাত্র। তার হাসি হাসি মুখখানাতে তারই প্রকাশ দেখিয়া বিজয় মুখ ফিরাইয়া নিয়া হুঁকায় টান দিতে সুরু করিল।

জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম কুসুম স্বামীকে রাঁধিয়া খাওয়াইল।

পশ্চাতে কুসুমের পড়িয়া আছে দীর্ঘ একটানা দুঃখের ইতিহাস। সে ইতিহাস ভুলিবার নহে, মুছিয়া ফেলিবারও নহে। ছেলেবেলায় খেলাঘরের মধুময় দিনগুলিতে যাকে সে স্বামীরূপে কল্পনা করিয়াছিল তাকে সে স্বামীরূপে পায় নাই। তারপর তার বিবাহ হইয়াছিল এই প্রদ্যুম্নের সঙ্গে, ইহাকেও সে বিবাহের পরই হারাইল, আর ফিরিয়া আসিল না। বাপের ভিটায় থাকিতে থাকিতে প্রথমে গেল মা, তারপর বাপ কেষ্ট মাইতি। বাপের সামান্য জমি-জায়গা পর্য্যন্তও ছিল না—তাই পরের বাড়ীতে ধান ভানিয়া মুড়ি ভাজিয়া, কখনও শোণ টানিয়া, দড়ি পাকাইয়া সে জীবনধারণ করিয়াছে। ইহারই ফাঁকে ফাঁকে আসিয়াছে হরিনামের দল—তারা আসিয়া তারই ঘরে আড্ডা বসাইয়াছে। তার জন্য উত্তরপাড়ার লোকেরা যোগেশবাবু, ভট্চায প্রভৃতি তার ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে, দারোগার কাছে মিথ্যা বদনাম দিয়াছে। এসব দিনগুলি বড় বেদনাদায়ক কুসুমের কাছে। সেই বেদনাময় দিনগুলিতে শুধু একটিমাত্র মানুষই তার পাশে ছিল—বিজয়।

তাই কুসুমের পক্ষে তার সমস্ত অতীত ইতিহাস মুছিয়া ফেলিয়া আজ সুমুখ পথে আগাইয়া যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আজ এতদিন পরে নিরুদ্দিষ্ট স্বামী যখন ফিরিয়াছে তখন তাকেও তো চট্ করিয়া অস্বীকার করা যায় না।

সমাজ আছে, লোকাচার আছে—তাকে ডিঙাইয়া সহজে যে কিছু করা যাইবে এমন পথও তার স্বমুখে নাই।

স্বামীকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া শুইবার জন্য সে তার বিছানা করিয়া দিল। নিজে আর সেদিন কিছু খাইল না। খাইবার মত তার মন ছিল না।

কাজকর্ম্ম সারিয়া তারপর কুসুম রাত্রির অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাইয়া চুপচাপ দাওয়ায় বসিয়া রহিল। তার মনে কত দ্বন্দ্ব। মানুষ এমন সমস্যায়ও পড়ে—হায় ভগবান। এখনই হয় তো লোকটা তাকে ডাকিবে, কাছে শুইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিবে। সেই সঙ্গে কত প্রশ্ন, কত কথা বলিবে। কিন্তু সে কেমন করিয়া তার কাছে গিয়া শুইবে, কেমন করিয়া সকল কথার জবাব দিবে? একদিন সে যে মানুষের অঙ্কশায়িনী হইয়াছে, সে মানুষ তো এ নয়। একদিন যাকে সে তার সর্ব্বস্ব দিয়াছে এ তো সেই লোক নয়। কুসুমের দুই চোখ ভরিয়া উঠিল জলে।

রাত্রির অন্ধকারময় আকাশ যেন সহস্র দুঃখ-বেদনায় অফুরন্ত আশ্বাস দিবার জন্য বিস্তৃত হইয়া আছে। দুঃখের রাত্রিতে আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিতে মানুষের বড়ই ভাল লাগে। কুসুমও তাই আকাশের দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মানুষ হিসাবে প্রদ্যুম্ন এক অদ্ভুত মানুষ। সে শুইয়া পড়িয়া ঘুমায় নাই, চুপচাপ বিছানায় পড়িয়া ছিল। তাকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া, তার শোয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া স্ত্রী তার কাছে আসিল না কেন, সেকথা সে রীতিমত গুরুত্বের সহিত ভাবিতে লাগিল। সেই বাল্যকালে তাদের বিবাহ হইয়াছিল, তারপর হইতেই সে নিরুদ্দেশ। আজ দীর্ঘকাল পরে সে ফিরিয়াছে। ইতি-মধ্যে তার বালিকা স্ত্রী, কৈশোরে পড়িয়াছে, কৈশোর হইতে পৌঁছাইয়াছে যৌবনে। জীবনের কূলে কূলে তার কত বান ডাকিয়া গিয়াছে। বসন্তের বনের মত পুষ্পসমারোহে জীবন হইয়া উঠিয়াছে ভারাক্রান্ত। কত পূর্ণিমায়, কত জ্যোৎস্নাভরা মদির রাত্রে হয় তো সে দ্বারপথে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিয়াছে

কোন একটি কামনা নিয়া, ভাণ করিয়া পদশব্দ শুনিয়াছে মানুষের, নিজেকেই নিজে ছলনা করিয়া ছুটিয়া গিয়াছে বাহির পথে। কিন্তু ব্যর্থতায়, হতাশায়, অব্যক্ত জ্বালায় অভিশাপ দিতে দিতে ফিরিয়া আসিয়াছে আবার ঘরে। তখন বিষ লাগিয়াছে দক্ষিণা-সমীরণ, বিষ লাগিয়াছে চাঁদের হাসি, হয় তো সেদিন কোকিল ডাকিয়াছে, ঘর হইতে ভ্যাঙ্‌চাইয়া উপহাস করিয়াছে কোকিলটাকে। এই তো কুসুমের জীবন! তারপর দীর্ঘ দিন, মাস, বৎসর পার হইয়া গিয়াছে, তার মনের মন্দিরে এমনিতরো অবস্থায় যদি সে কাকেও স্থান দিয়া থাকে, তা কি খুব অস্বাভাবিক হইবে? আদৌ নয়। এবং তা যদি হইয়া থাকে তা হইলে তার তো না আসিবারই কথা প্রদ্যুম্নের বিছানায়! প্রদ্যুম্ন আর শুইয়া রহিল না—উঠিয়া পড়িল।

প্রথমে ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে তাকাইয়া সে দেখিল। কিছুই বুঝিতে পারিল না। তারপর সে ধীর পদক্ষেপে ঘর হইতে দাওয়ার দিকে যাইতে লাগিল।

কুসুমের ভাল লাগিয়াছে প্রদ্যুম্নকে—অন্যকিছুর জন্য নয়—লোকটা বেশ সহজ, সরল আর দরদী বলিয়া। এবং সেই জন্য যেন একটা আশার আলোও সে দেখিতে পাইতেছে। মানুষটাকে সবকিছু খুলিয়া বলিলে কেমন হয়? নিশ্চয়ই সাড়া পাওয়া যাইবে। কুসুমের মন বলিতেছে, নিশ্চয়ই সাড়া পাওয়া যাইবে।

সহসা একেবারে পিছনে আসিয়া লোকটা কুসুমকে ডাক দিল, শোবে চলো।

কুসুম চমকাইয়া উঠিল। সে ভয়ে ভয়ে খানিকটা সরিয়া বসিল। প্রদ্যুম্ন তার এই অবস্থা উপলব্ধি করিয়া বলিয়া উঠিল, ভয় নেই তোমার।

কেমন যেন একটা অভয়-বাণী লোকটার কণ্ঠস্বরে। কুসুম ভাবিল সে উঠিবে কি না উঠিবে। প্রদ্যুম্ন ধীর স্থির ভাবে কহিল, আমি বুঝি মানুষের দুঃখ। তুমি উঠে এস।

কুসুম তবুও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

প্রত্যুম্ন আবার বলিল, আমি তোমার উপর কোন কর্ত্তব্যই করিনি। আমি সে কথা বুঝি। তাই আজ সহসা যে তোমার ওপর আমি স্বামিত্বের অধিকার সাব্যস্ত করব, সেকথা ভেব না। একদিন ছিল যখন আমি ফিরলে হয় তো তোমার ওপর অত্যাচারই করতুম—আজ কিন্তু আমি নতুন মানুষ। বাইরের অধিকারের চেয়ে মানুষের হৃদয়ের মূল্য আমার কাছে অনেক বেশি।

লোকটা কি বলিতেছে? কুসুম উঠিয়া পড়িল। রাতের অন্ধকার আকাশে কোথায় যেন এক ঝলক আশার আলো।

প্রত্যুম্ন বলিল, এতদিন পরেও আমি যে কেন ফিরেছি, সে কথা হয় তো লোকে বুঝবে না। কিন্তু তুমি বুঝো। তোমার প্রতি আমি কোন কর্ত্তব্যই করিনি। সেইজন্যই ফিরে এসিছিলুম। যাক্ সেসব কথা। রাত হয়েছে এখন শোবে চল। আস্তে আস্তে সব কথাই হবে। আর তোমারও যদি কিছু বলার থাকে তা হ'লে আমাকে খুলে বোলো।

আর কুসুমের ভয় নাই।

বিজয় যদিও মনটাকে গড়িয়া পিটিয়া নিয়াছিল কিন্তু তা হইলেও একেবারে এত প্রত্যক্ষ ব্যাপারটা যে, সে কিছুতেই মন হইতে মুছিতে পারিতেছিল না।

রাতে শুইয়া শুইয়া বনমালার অজস্র প্রশ্ন আর কথা, তার উপর কুসুমের সহিত এই দীর্ঘ দিনগুলির নানারকম ছোট বড় ঘটনা মনে পড়ায়—ঘুম যেন তার কোথায় উবিয়া গিয়াছিল। বনমালা যতই দরদ দিয়া কুসুমের স্বামী আসিয়াছে বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করুক—সে আনন্দের পিছনে একটা হাঁপছাড়া ভাব তার আছেই। যেন ভাবটা তার এইরূপ—যাক্ বাঁচা গেল বিজয় ও কুসুম সম্পর্কে তাকে আর ভাবিতে হইবে না।

বনমালার প্রতিটি কথাবার্ত্তায় যেন এই ভাবটা ফুটিয়া উঠিতেছিল। বনমালা বলিল, কুসুমের জন্য আমার একটা ভাবনা ছিল!

বিজয় প্রশ্ন করিল, কিসের ভাবনা?

না তেমন কিছু নয়, বনমালা কথাটা চাপিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, হাজার হোক্ সে তো মেয়েমানুষ।

কথাটা বনমালা চাপিতে চেষ্টা করিলেও কিন্তু চাপা রহিল না—তার নিজের কথাতেই প্রকাশ হইয়া পড়িল। বিজয় বলিল, সে তো মেয়ে মানুষ নিশ্চয়ই কিন্তু তাতে হয়েছে কি ?

হবে আবার কি, বনমালা বলিল, সেই কথাই বলছিলুম আর কি।

বিজয় বলিল, কই এ্যাদ্দিন তো কথাটা বলিস নি !

আজ তার বর এসেছে বলেই বল্‌ছি, বনমালা কহিল, তা না হ'লে কি আর বল্‌তুম !

বিজয় বলিল, আর কোন ভাবনা নেই নয় ?

বনমালা খুশির হাসি হাসিয়া উঠিয়া বলিল, আচ্ছা লোক তো ! তারপর কি ভাবিয়া—সম্ভবতঃ এই সব কথা উঠিলে বিজয়ের ঘুমটুম সব নষ্ট হইয়া যাইবে—তাই দরদ দিয়া বলিল, যাক্ এসব কথা—তুমি ঘুমোও।

একে বিজয়ের মনটা কেমন হইয়াছিল তার উপর বনমালার এই প্রচ্ছন্ন খোঁচা—ইহাতে তার অবস্থা যেন আরও কাহিল হইয়া পড়িল।

সে ও বনমালা, স্বামী ও স্ত্রী—এই নিশীথরাত্রে তারা দুজনে পাশাপাশি বিছানায় শুইয়াছে। প্রদ্যুম্ন ও কুসুম, তারাও স্বামী আর স্ত্রী—তারাও নিশ্চয়ই এমনি করিয়া একই শয্যায় পাশাপাশি শয়ন করিয়াছে। উঃ ভাবিতেও যেন কেমন লাগে। মনে পড়ে তার, সেই সীতার কঙ্কালটা পুড়াইয়া আসিবার পর সেই রাত্রিটার কথা। তারপর যেদিন সেই শহরে যায় সেদিনকারও রাত্রির কাহিনী। মনে পড়ে সেই কুসুমের সাজিয়া গুজিয়া থাকা। সেই দামী সায়ার উপর তাঁতের একখানি দামী শাড়ী পরিয়াছিল কুসুম। আঁটসাঁট ব্লাউজ পরিয়াছিল জীবনকে যেন বাঁধিয়া বাঁধিয়া, গলায় দিয়াছিল চন্দ্রহার ও কানে পরিয়াছিল শহরের মেয়েদের মত পাশা, আধুনিক মেয়েদের অনুকরণে বাঁ-হাতে একগাদা সোনার চুড়ি, ডানহাতের অনামিকায় বুঝি জল্ জল্ করিতেছিল

একটা পাথর বসানো আংটি। শুধু এইসবই অবশ্য কুসুম পরে নাই—মানুষের মনের শিল্পী মানুষকে নিয়া আয়নার সুমুখে বসিয়া সে নিজের মুখমণ্ডলে চন্দনের কৃষ্ণচূড়া আঁকিয়াছিল, কুঙ্কুমের টিপ পরিয়াছিল ভ্রূ-যুগলের মাঝখানে, খোঁপায় বেড় দিয়াছিল সদ্য ফোটা বক-শিউলির মালা। সেদিন বিজয় যাইবে তাই সে আগে হইতেই ফুলের মালা গাঁথিয়া রাখিয়াছিল। এমনিতরো সাজিয়া-গুজিয়া ফুলের মালা হাতে বিজয়কে অভ্যর্থনা করিল। হাত ধরিয়া কুসুম বিজয়কে ঘরে নিয়া গেল। ঘরে দাঁড় করাইয়া গলায় তার মালা পরাইয়া দিয়া প্রণাম করিল। তারপর ডানহাতের অনামিকার সেই আংটিটি খুলিয়া বিজয়ের বাঁ-হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে পরাইয়া দিয়া কহিল, এই আমার চিহ্ন। মনে পড়ে সেদিন তার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল।

আজ সেই কুসুম হয়ত সব ভুলিয়া যাইবে, সব কিছু পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া সে স্বামীর দিকে আগাইয়া যাইবে—যে বিছানায় একদিন তারা পাশাপাশি শুইয়া রাত কাটাইয়া ছিল, সেই বিছানায় সে ও তার স্বামী পাশাপাশি শুইয়া রাত কাটাইবে। ওঃ! কুসুম আর তার কেউ নয়।

কিন্তু কেন সে এসব ভাবিতেছে? মনকে তো সে ঠিকই করিয়া নিয়াছিল—তাদের জীবনে যদি মত ও পথের মিল থাকে তা হইলে কুসুম তো তারই আছে। কিন্তু মন শুনিবে কেন? ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় এদিক দিয়া তো মানুষ চাওয়া-পাওয়ার হিসাব করে না—অত্যন্ত কুৎসিতভাবে মানুষ দেহের পাওয়াটাকেই বড় পাওয়া বলিয়া মনে করে এবং ঠিক সেই সামাজিক আবেষ্টনীর মধ্যে বাস করিয়া বিজয় তা হইতে কখনই মুক্ত হইতে পারে না। হিসাব করিলে সে ঠিকভাবে ভাবিতে পারে কিন্তু অসতর্ক হইলে অজানিতভাবে সে এই সামাজিক আবেষ্টনীর বাহিরে যাইতে পারে না—ইহারই গণ্ডীর মধ্যে তাকে পাক খাইতে হয়।

পাশে শুইয়া আছে বনমালা। হাত দিয়া সে বনমালাকে অনুভব করিল। বনমালাকে সে বিবাহ করিয়াছে, তাকেও সে ভালবাসে। কিন্তু মেয়েটা যেন

কেমন প্রতিহিংসা-পরায়ণা। কুসুমের স্বামী ফিরিয়াছে দেখিয়া সে ই যেন সবচেয়ে খুশি হইয়াছে। কিন্তু কেন সে এই ভাবে খুশি হইয়াছে? তার কি কুসুমের স্বামী ফিরিয়া আসায় বিজয়ের যেমন লাগিয়াছে, কুসুমের প্রতি তার আকর্ষণে বনমালারও কি অমনিতরোই লাগিয়াছিল? হ্যাঁ হয় তো তাই হইবে। আজ যেমন সে কুসুমকে পাইতেছে না, বনমালাও তো তাকে এমনিভাবে সে সময় পায় নাই? কাজেই সে না পাওয়ার দুঃখ ও ব্যথা ভুলিবে কি করিয়া? সে জন্য সে যদি কিছুটা ফুঁসিয়া ওঠে তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু তাকে বুঝাইতে হইবে তো? তাই যদি সে তাকে বুঝাইতে চায় তবে কি বলিয়া তাকে সে বুঝাইবে? বনমালাকে বুঝাইতে হইলে তাকে এই কথাই বলিতে হইবে, 'মানুষকে দৈহিকভাবে পাওয়াটাই বড় নয়—মত ও পথে মানুষকে পাওয়াই হইতেছে আসল পাওয়া। তুমি যদি আজ সম্পূর্ণরূপে আমাকে পাইতে চাও তো এসো, আমার সঙ্গে পথে চলিয়া এসো।' অথচ বনমালার বেলা সে তাকে যেকথা বলিবে, তার নিজের বেলায় সে নিজেকে সেকথা বলিতে পারিবে না—ইহা তো কোন যুক্তি নয়। বলিতেই হইবে, বুঝাইতেই হইবে—এই কথা বলিয়াই তাকে নিজেকে বুঝাইতে হইবে।

কিন্তু ইহা সেই পুরাণো সমাজ—যে সমাজের প্রভাব তার রক্তের মধ্যেও রহিয়াছে। অসতর্ক হইলেই সে প্রভাব নূতন দিনের জাগ্রত মানুষকে পাইয়া বসে।

পাশে বনমালা শুইয়া আছে। সম্ভবতঃ সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অন্ধকার ঘরে কিছুই দেখা যায় না। বিজয় বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। বনমালার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাইতেছে। চুপ করিয়া বসিয়া সে বনমালা ঠিক ঘুমাইতেছে কিনা তা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিল। তারপর নিশ্চিন্ত হইয়া সোজাসুজি উঠিয়া পড়িল। ঘরের দেয়ালে বাঁশের আলনায় তার জামাটা ছিল—আলনাটার কাছে গিয়া সে জামার পকেটে হাত দিল। একটা

কাগজের মোড়ক পকেট হইতে বাহির করিয়া নিয়া সেটা টিপিয়া কি যেন অনুভব করিল। তারপর অত্যন্ত সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দরজাটা খুলিয়া ফেলিল। দরজা খুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে দরজাটা ঠেসাইয়া দিয়া সে বাড়ীর বাহিরে আসিল।

বাড়ীর বাহিরে আসিয়াই সে সেই কাগজের মোড়কটা খুলিয়া ফেলিল। কুসুমের দেওয়া সেই আংটিটা নক্ষত্রলোকের স্তিমিত আলোকে ঝিক্‌মিক্‌ করিয়া উঠিল। একদিন ভালবাসিয়া আংটিটা কুসুম বিজয়ের হাতে পরাইয়া দিয়াছিল। সেদিন ইহার মূল্য ছিল অনেক। কিন্তু—আজ আজ? ইহার কোন মূল্যই নাই। বিজয় আংটিটা ডানহাতের মুঠায় শক্ত করিয়া ধরিল।

মাথার উপরে নক্ষত্রখচিত আকাশ। বিস্তীর্ণ পৃথিবী জুড়িয়া আসিয়াছে যেন মহাকালরূপী অন্ধকার। রাতের বাতাস হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে—প্রেত-যামিনীর কামনা নিয়া।

বিজয় যেন আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। পথের উপর দিয়া সে যেন পাগলের মত কুসুমের বাড়ীর দিকে ছুটিতে লাগিল। এক দৌড়ে কুসুমের বাড়ীতে আসিয়া সে ধীরে ধীরে আংটিটা তার দাওয়ায় বসাইয়া রাখিয়া, যেমন করিয়া গিয়াছিল তেমনি করিয়াই ফিরিয়া আসিল।

বনমালা তেমনি ভাবেই ঘুমাইতেছে। বিজয় তার পাশে শুইয়া পড়িল। সকালে উঠিয়া কুসুম নিশ্চয়ই আংটিটা দেখিবে! বিজয় আপন মনেই হাসিয়া উঠিল।

২৩

পরদিন সকালে সবই কিন্তু সহজ হইয়া গেল। প্রত্যুম্নের কথামত বিজয় সকাল বেলাতেই কুসুমের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রত্যুম্ন তখন হাতমুখ ধুইতে যাইতেছে মাত্র। হাতে তার জলের ঘটি। বিজয়কে দেখিতে পাইয়াই সে বলিয়া উঠিল, এসো বন্ধু—আমি তোমার কথাই ভাবছিলুম।

কুসুম বিজয়কে বসিতে জায়গা দিল। মাথায় তার কাপড়। বেশভূষাও অতি সাধারণ। তবু তাকে দেখিলেই যেন এই কথাটাই মনে হয় যে কুসুম বদলাইয়া গিয়াছে। প্রত্যুম্ন ঘটি হাতে বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল। কুসুম সেই ফাঁকে বিজয়কে বলিয়া উঠিল, অমন ক'রে আমাকে ঘা দেবার কি দরকার ছিল?

বিজয় বুঝিল কুসুম সেই আংটির কথাই বলিতেছে। তাই সে কোন উত্তর না দিয়া যেন ব্যাপারটা আদৌ বুঝিতে পারে নাই এমনভাবে তার দিকে তাকাইয়া রহিল। কুসুম কহিল, তুমি কি ভাবো যে, সোয়ামী ঘরে এসেছে ব'লে যাকে আমি সর্ব্বস্ব দিয়েছি তাকে ভুলে যাব? না, কুসুম সে মেয়ে নয়। সে সব কথা খুলে বলবে সোয়ামীকে। ত্যাখো আমি বলছি, তোমার কোন ভয় নেই। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।

শেষ দিকের কথাগুলায় কেমন যেন একটা ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠিল কুসুমের। বিজয় বেশ ভাল ভাবেই তা উপলব্ধি করিল কিন্তু তার উত্তরে কিছুই বলিতে পারিল না। কুসুম আবার বলিল, একটা কথা শুধু তুমি মনে রেখ যে সত্যিকারের ভালবাসা থাকলে মানুষ মানুষকে ফাঁকি দিতে পারে না। কিন্তু আর নয়—ও আসছে। এত শীগ্‌গির আমি ওকে জানাতে চাইনা—ঠিক তাল বুঝে জানাবো। কিন্তু তুমি ভেবনা।

ঝড়ের রাত্রি, দুর্যোগের রাত্রির পর প্রভাতে অরুণোদয়ে মানুষ যেমন তৃপ্তি অনুভব করে, কুসুমের কথাগুলিতে বিজয় তেমনি তৃপ্তি অনুভব করিল।

প্রদ্যুম্ন মুখ ধুইয়া আসিয়া পড়িল। কুসুম সরিয়া গিয়াছিল। সে তাদের সুমুখে আসিয়া বলিল, বাইরে বেরুবে কিন্তু দেরী হয় না যেন। তোমরা এলে তারপর আমি বেরুব। কালকের আলোচনায় সব কি হ'ল শুনে তারপর আমার কাজ ঠিক ক'রে নিতে হবে।

বিজয় কহিল, কিন্তু শুনেছ কাল কি ঠিক হয়েছে?

না, কুসুম কহিল, সেই কথাই তো জানতে চাইছি।

কাল ঠিক হয়েছে খাজনা আদায়ের জুলুমের বিরুদ্ধে একটা সমাবেশ করা হবে, বিজয় বলিতে লাগিল, সেজন্যে জ্যাঠা আজ ভোরেই শহরে গেছে—মণিবাবু তাঁর বোন আর আরও সব নেতাদের নেমতন্ন জানাতে। ইতিমধ্যে আমাদের গাঁয়ে গাঁয়ে বৈঠক ক'রে, ঢ্যাঁড়া দিয়ে লোকজনকে সব জানাতে হবে। তোমাকে মেয়েদের ভার নিতে হবে।

বেশ, কুসুম কহিল, লোকজন কি সব দল বেঁধে আসবে?

নিশ্চয়ই, বিজয় বলিয়া উঠিল।

মেয়েদেরও অমনি ক'রে আন্‌ব তো, কুসুম জিজ্ঞাসা করিল।

বিজয় বলিল, হ্যাঁ।

তা'লে ঠিক আছে, কুসুম বলিল, কিন্তু তোমরা দেরী কোর না বাপু।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার কথা বলিল প্রদ্যুম্ন, নতুন এসেছি, সারা গ্রাম ঘুরতে যদি একটু দেরীই হয়।

তা হোক না, কুসুম বলিল, কিন্তু সে রকম দেরী যেন না হয় তা হ'লে কাজের বড় ক্ষতি হবে।

প্রদ্যুম্ন বলিল, ভারী কাজের লোক হয়েছ দেখছি।

না হবে না, কুসুম একট ঘূর্ণা দিয়া ঘরে চলিয়া গেল। প্রদ্যুম্ন বিজয়ের উদ্দেশ্যে বলিল, চলো বন্ধু।

বিজয় উঠিয়া পড়িল।

প্রদ্যুম্ন কুসুমের উদ্দেশ্যে কহিল, বাঃরে বেশ লোক তো! আমার টুপি আর জামাটা দাও। ওসব ছেড়ে যে আমি কোথাও যাই না।

বিজয় অবাক হইয়া প্রশ্ন করিল, সব সময় পরে থাকো নাকি বন্ধু!

নিশ্চয়ই, প্রদ্যুম্ন উচ্ছ্বসিতভাবে বলিয়া উঠিল, লাল টুপি, লাল পতাকা, আর লাল ব্যাজ আমার সর্ব্বক্ষণের সাথী। আমার কেবল মনে হয় ওগুলো আমার কাছে থাকলে লালঝাণ্ডার স্বপ্ন আমি কখনও ভুলব না। তা ছাড়া ওগুলো কাছে থাকলে আমি যেন কেমন জোর পাই।

কুসুম ঘর হইতে জামা ও টুপিটা আনিয়া দিল। প্রদ্যুম্ন হাত বাড়াইয়া নিয়া প্রথমে জামাটা গায়ে দিল, তারপর টুপিটা দিল মাথায়। বিজয় বিস্ময়ে ও পুলকে প্রদ্যুম্নের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাকাইয়া তাকাইয়া হয়ত সে ভাবিতেছিল, দরকার—এমনিতরো শক্ত লোকই দরকার লালঝাণ্ডার দলে।

জামা ও টুপিটা পরা হইয়া গেলে প্রদ্যুম্ন বলিল, চলো বন্ধু—

হ্যাঁ, বিজয় পা বাড়াইল।

কুসুম অভয় পাইয়াছে স্বামীর কাছে।

প্রদ্যুম্ন ও বিজয় বাহিরে যাইতেই বনমালা সৌরভ প্রভৃতি কুসুমের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বহুদিন পরে তার স্বামী আসিয়াছে—বহুদিন পরেই বা বলি কেন, একেবারে নূতনই আসিয়াছে, কাজেই তার সহিত কুসুমের জমিল কেমন তা জানিবার জন্য মেয়েদের উৎসুক মন কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না। কাজেই তারা প্রথম সুযোগেই তা জানিবার জন্য কুসুমের কাছে আসিয়াছিল।

প্রথমে আসিয়াছিল সৌরভ। সে আসিয়াই প্রথম বাসর-রাত্রির ভাষায় কুসুমকে প্রশ্ন করিয়া বসিল, কিরে কেমন লাগল?

কুসুম কহিল, পোড়ারমুখির আর কোন ভাবনা-চিন্তে নেই।

—কাছে শুয়েছিলি ?

—আলাদা শোবার জায়গা আছে নাকি আমার ?

—তা হ'লে শুয়েছিলি তো ?

কুসুম মুখ টিপিয়া কহিল, তুমি যা ভাবছ সে-গুড়ে বালি—

—কেন ?

—কেন আবার কি। আলাপ নেই, পরিচয় নেই।

—কিন্তু বর ছেড়ে দিলে যে বড় ?

—দূর পোড়ারমুখি !

কথাটা বলিতে না বলিতেই বাড়ীতে পা দিল বনমালা। বনমালা হাসিতে হাসিতে আসিয়া একেবারে কুসুমকে জড়াইয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত ভাবে বলিয়া উঠিল, পোড়ারমুখিরে !

বনমালার বাহুলতায় আবদ্ধ কুসুম কোন কথা বলিল না। কি যেন এক তৃপ্তিতে তার বুকে বুক দিয়া রহিল। ইহারা তার সম্বন্ধে কত কি ভাবিয়াছে এবং ভাবিতেছে কিন্তু......বনমালার বুকটায় যেন কি এক অপূর্ব্ব সান্ত্বনা ! কুসুম বিহ্বল-আবেশে চোখ বুজিয়া ফেলিল। বনমালার মনে কুসুমের স্বামী ফিরিয়া পাওয়ার আনন্দ এবং সেই আনন্দের মাদকতায় মনও তার ভরপুর. আর তারই আবেগে সে কুসুমকে অমন করিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছে। কিন্তু কয়েকটা মুহূর্ত্তেই যখন সে আবেগ স্তিমিত হইয়া আসিল তখন সে সেই ভাবে কুসুমকে জড়ানো অবস্থাতেই, তার মুখের দিকে তাকাইল। তাকাইয়া দেখিল, কুসুম চোখ বুজিয়া তার বুকে আরও জোরে চাপ দিতেছে। বনমালার সারা শরীরে কি যেন এক শিহরণ বহিয়া গেল।

বনমালার শরীরে শিহরণ বহিয়া যায় যাক্—তাতে কুসুমের কিছু যায় আসে না। কুসুম যেন খুঁজিয়া পাইয়াছে তার বুকের মধ্যে অননুভবনীয় এক সুখানুভূতি। কুসুমের স্বামী ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু স্বামীকে সে ইতিপূর্ব্বে কখনো স্বামীরূপে পায় নাই। যাকে সে পাইয়াছে তার হাজারো

স্পর্শ আছে যে বনমালার এই বুকখানার মধ্যে। কুসুম যেন শুষিয়া নিতে চায় বনমালার বুকখানা।

বনমালা নিজেকে সামলাইয়া নিয়া বলিয়া উঠিল, ভাল হয়ে দাঁড়া পোড়ারমুখি—ভাল হয়ে দাঁড়া।

সৌরভ বলিয়া উঠিল, মেয়েমানুষের সঙ্গে কি আর ওরকম সোহাগ করে লো।

কুসুম অবশ হাসি হাসিয়া বনমালার বাহুলতার আবেষ্টনী হইতে খাড়া হইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল।

বনমালা তাকে ছাড়িয়া দিয়া কহিল, পোড়ারমুখি এরি মধ্যে যেন গোগ্রাসে গিলো না, রেখে ঢেকে খেও—

কুসুম নীরবে শুধু বনমালার দিকে তাকাইয়া রহিল।

সৌরভ বলিয়া উঠিল, এখন ওসব ন্যাক্‌রা রেখে দিয়ে বল্ কেমন জমল বরের সঙ্গে?

বনমালাও সৌরভের কথার সায় দিতে যাইতেছিল কিন্তু তার চোখের দিকে তাকাইয়া সে থামিয়া গেল। মেয়েমানুষের আনন্দভরা চাহনি সে জানে কিন্তু কুসুমের চোখে যেন কোন ভয়ার্ত্ত গৃহপালিত জন্তুর সকাতর দৃষ্টি আজ। বনমালা সৌরভ নয়। সে ভালবাসে কুসুমকে। কুসুমের প্রতি ভালবাসার আবেগে সে কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া গেল।

কিন্তু বনমালার এই চুপ করিয়া যাওয়াটাও আবার যেন কেমন লাগিল। তাই কুসুম বেশ সহজ ভাবেই বলিয়া উঠিল, তোরা বড় তাড়াতাড়ি সবকিছু মনে করিস্। আগে আলাপ পরিচয় হ'তে দে।

ব্যস্ ব্যস্ এই লাখ কথার এক কথা, সৌরভ বলিল, আর আমি এখন কিছু শুন্‌তে চাই না। এখন আমি চললুম—ঘাস মারতে হবে ক্ষেতে। মনের মানুষ আবার দাঁড়িয়ে আছে পথে।

তাই যা—তাই যা, বলিয়া কুসুম বনমালার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সৌরভ-সম্পর্কে তাচ্ছিল্যভরা হাসি হাসিল।

সৌরভ চলিয়া গেল।

কুসুম বলিল, ভারী জ্বালাতন করে ভাই। আর মুখে সবসময়ে যত সব অরুচির কথা।

বনমালা কহিল, কি ক'রবে বল্‌?

কুসুম কহিল, কিন্তু তুই এখুনি যাস্‌নি। তোর কাছে আমি একটা জিনিস চাইব। দিবি তো?

—দেবার হ'লে নিশ্চয় দোব—কথাটা কি?

—বল্‌ছি। বোস্‌ না।

বিজয় প্রদ্যুম্নকে প্রথমেই আশু ডাক্তারের বাড়ীতে নিয়া আসিয়া উঠিয়াছিল। আশু ডিস্পেন্সারী ঘরে ছিল। বিজয়ের সঙ্গে প্রদ্যুম্নকে দেখিয়া সে বুঝিল যে এই লোকটাই বোধহয় কুসুমের স্বামী। তাই ডিস্পেন্সারী ঘরে তাদের ডাকিয়া নিয়া গেল। বিজয় প্রথমেই গতকাল সন্ধ্যায় আসিতে পারে নাই কেন তা বলিয়া তারপর প্রদ্যুম্নকে আশু ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিয়া কহিল, এতদিন আসামের চা-বাগানে ছিল। সেখানেই লালঝাণ্ডার কাজ করে।

পরিচয় শুনিয়া আশু খুশি হইল। লোকটা সত্যিই লালঝাণ্ডার একনিষ্ঠ ভক্ত—তা না হইলে অমন করিয়া টুপি পরিবে কেন? বুকেই বা ব্যাজ আঁটিবে কেন?

প্রদ্যুম্নও খুশি হইল আশু ডাক্তারের পরিচয় পাইয়া। সেও ভাবিল লালঝাণ্ডার সমর্থনে এসব লোকও আগাইয়া আসিতেছে তা হইলে!

ডিস্পেন্সারী ঘরের একদিকে রোগীদের বসিবার বেঞ্চে আশু তাদের বসাইয়া বলিল, তা ওদিকে সব যুদ্ধু-টুদ্ধুর খবর কি বলুন?

ওদিকে, প্রদ্যুম্ন বলিল, দিনরাত আকাশে উড়োজাহাজ ঘুরছে আর দিন নেই রাত নেই বোমা পড়ছে যখন তখন।

এমন, আশু কহিল, লোকে আছে কি করে?

প্রদ্যুম্ন কহিল, কি ক'রবে রুজি-রোজকার তো আর লোকে ছেড়ে যেতে পারে না। তাই নির্ব্বিকারভাবে তারা জাপানী বোমা হজম ক'রছে।

—জায়গাটা একেবারে তছ্‌নছ্‌ হয়ে যাচ্ছে কি বলেন ?

—সেকথা আর বলতে।

হঠাৎ আশুর খেয়াল হইল সে এতক্ষণ কথাই বলিতেছে, লোকটাকে আপ্যায়নের কোন ব্যবস্থাই করে নাই—তাই সে কহিল, আচ্ছা একটু চায়ের ব্যবস্থা করব ?

হ্যাঁ, প্রদ্যুম্ন প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিল, তা'লে তো বেঁচে যাই। এদের এখানে চা-টায়ের তো কোন কারবার দেখিনি। তাই কাল থেকে আমার চা খাওয়াই হয়নি।

বটে! আচ্ছা আমি আসছি, বলিয়া আশু বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। আশু ভিতরে যাইতেই প্রদ্যুম্ন বিজয়কে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ইনি পুরোপুরোই কাজে নেমে পড়েছেন তো ?

হ্যাঁ,, বিজয় কহিল, শুধু কি তাই। এই কাজের জন্যে উনি ওঁর যথাসর্ব্বস্ব দান করে দিয়েছেন পর্য্যন্ত।

তাই নাকি, সবিস্ময়ে প্রদ্যুম্ন কহিল,।

পরক্ষণেই আশু একেবারে দুইটা কাচের গ্লাসে ভর্ত্তি করিয়া চা নিয়া আসিল।

প্রদ্যুম্ন বলিল, বাঃ আপনি গেলেন আর চা নিয়ে এলেন তো!

চা বাড়ীতে তৈরী হয়েই গিয়েছিল, আশু কহিল, আমি যে রোজ এই সময়েই চা খাই।

বিজয় কহিল, কিন্তু আপনি দু'গেলাস চা নিয়ে এলেন কেন ?

—তুই খাবি না ?

—আমি চা খাই কোনদিন ?

ও তা বটে, আশু কহিল, আমার মনেই ছিলনা। আচ্ছা বেশ তুই না খাস, আমিই খাচ্ছি।

—হ্যাঁ তাই খান।

প্রদ্যুম্ন হাত বাড়াইয়া আশুর হাত হইতে একগ্লাস চা নিয়া কহিল, এইযুগে চা খায়না এমন লোক দেখলুম বন্ধু শুধু তোমাকে।

তা যদি বললেন প্রদ্যুম্ন ভাই, আশু কহিল, আমারও খাওয়া অভ্যেস ছিল না। অভ্যেস হয়েছে এইমাত্র কয়েকমাস।

তার আগে কিচ্ছু খেতেন না, প্রদ্যুম্ন প্রশ্ন করিল, ।

অতি সহজভাবেই প্রদ্যুম্ন প্রশ্নটা করিয়াছিল কিন্তু তবু যেন কথাটা আশুর মনের ভিতর কোথায় যেন একটা ধাক্কা দিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল, খেতাম অনেক কিছুই—কিন্তু সেসব আমি ত্যাগ করেছি।

প্রদ্যুম্ন কথাটা সম্ভবতঃ বুঝিতে পারে নাই। তাই আশুর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। আশু তা বুঝিতে পারিয়া কহিল, খেতাম আমি মদ—ভয়ানকভাবে খেতাম কিন্তু একদিন একটা ঘটনায় আমি আর ও জিনিস কখনো ছোঁবনা বলে প্রতিজ্ঞা করলাম। ব্যস সেইদিন থেকে আর নয়—

দুঃখ ও বেদনাই মানুষকে মানুষ করে। কোন এক দুঃখপূর্ণ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়াই আশু ডাক্তার হয়ত মদ ছাড়িয়াছে—এই কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রদ্যুম্ন চায়ে চুমুক দিতে লাগিল।

চা খাওয়া শেষ হইলে আশু কহিল, আমি কিন্তু প্রদ্যুম্ন ভাইয়ের কথা শোনবার জন্যে বড় উদগ্রীব। চা-বাগানের সম্বন্ধে অনেক কিছুই আজকাল আমরা পড়ি কিন্তু আসলে সেখানে মানুষের কেমন ক'রে দিন কাটে তা আমরা কেউ জানি না। আমার বড় ভাল লাগে ঐসব গল্প শুনতে। এখন সময় থাকলে এখুনিই শুনতাম কিন্তু এক্ষুনি আমাকে একবার বেরুতে হবে ডাকে। আকাল শেষ হতে না হতে মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে একেবারে ভয়ঙ্কর ভাবে। তাই যেতে হবে রোগী দেখতে।

আচ্ছা তাতে আর কি হয়েছে, প্রদ্যুম্ন কহিল, শুনবেনখন সময় মত। এখন তো আমি আছি।

সেই ভাল, আশু স্টেথিসকোপটা পাকাইয়া নিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিল।

বিজয় প্রদ্যুম্নের দিকে তাকাইয়া কহিল, বন্ধু এবার চলো আমরা আমাদের গণ-সমবায় সমিতির দিকে যাই—

কিন্তু সমিতির অফিস দেখা হ'ল না তো, প্রদ্যুম্ন প্রশ্ন করিল।

আশু কহিল, এই তো পাশের ঘরেই। বিজয় দেখা না প্রদ্যুম্ন ভাইকে!

হঁ্যা দেখাচ্ছি, বলিয়া বিজয় প্রদ্যুম্নকে তার সঙ্গে আসিতে ইসারা করিল। আশু কহিল, আমি কিন্তু আর দেরী করব না—বেরিয়ে পড়ি।

হঁ্যা হঁ্যা আপনি যান, বলিয়া প্রদ্যুম্ন বিজয়ের সহিত পাশের ঘরে গেল।

পাশের ঘরেই কৃষক-সমিতির অফিস। মেঝেটায় খেজুর পাতার চ্যাটাই পাতা। একদিকে একটা ছোট পায়াওয়ালা সেকেলে ডেস্ক। সেটার মধ্যেই কাগজপত্র সব থাকে। দেয়ালের গায়ে মন্বন্তরের কয়েকটা ছবি আঁটা। খানকয়েক পোস্টারও আছে। ঘরের জানালাগুলার তাকগুলিতে খবরের কাগজ সাজানো।

বিজয় কহিল, এইখান থেকেই আমরা প্রথম কাজ শুরু করি।

ও, প্রদ্যুম্ন কহিল, এখানে কৃষক-সমিতির কত মেম্বার?

—তা প্রায় হাজার তিনেক।

—বাঃ বেশ ভাল মেম্বারই তো হয়েছে দেখছি।

—হঁ্যা রিলিফের কাজে আমরা এগিয়ে যাওয়ার ফলেই লোকে এতটা তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পেরেছে। তা ছাড়া কৃষকদের বাঁচতে গেলে যে সমিতির প্রয়োজন সেটাও তারা বুঝতে পেরেছে।

—সেই বোঝাটাই তো দরকার।

কৃষক-সমিতির অফিস দেখা হইয়া গেলে প্রত্যুম্ন কহিল, এবার আমরা কোনদিকে যাব ?

—গণ-সমবায় সমিতির দিকে।

বেশ, উৎসাহভরে প্রত্যুম্ন বলিল, চলো।

প্রত্যুম্ন এক নূতন দেশে আসিয়া পড়িয়াছে যেন। তার আসা হইতে এখন পর্য্যন্ত মাত্র একটি রাত্রির ব্যবধান। কিন্তু তবু এই সময়টুকুর মধ্যেই তার জায়গাটাকে ভাল লাগিয়া গিয়াছে। কৃষক-সমিতির কার্য্যালয় হইতে গণ-সমবায় সমিতিতে যাইবার পথে দুপাশে দিগন্তবিস্তৃত ধানক্ষেত। চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে বড় ভাল লাগে। আসামের জঙ্গলের দৃশ্য তার দেখা আছে আর জঙ্গলের রঙ্‌ও সবুজ—কিন্তু বাংলাদেশের মাঠের এই সবুজ ধানচারার কাছে যেন সে লাগেই না। এ যেন প্রকৃতির অকৃপণ উচ্ছ্বাস !

দুই পাশে তাকাইতে তাকাইতে প্রত্যুম্ন বিজয়কে অনুসরণ করিতে লাগিল।

বনমালা তখনও কুসুমের ওখানেই ছিল।

কুসুমেরও চোখে জল, বনমালারও চোখে জল। বনমালার সম্মুখে আজ এক অজানা জগতের দুয়ার খুলিয়া গিয়াছে। কুসুমকে সে ভালবাসে সত্য কিন্তু সে এতখানি দাবী করিবে, ইহা সে বিশ্বাস করিতে পারে নাই।

বনমালা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, কুসুম তোর মনে এই ছিল !

আকুল ক্রন্দনে ফাটিয়া পড়িয়া কুসুম বলিল, লোভীর মত আমার এই দাবী তুই মানিস্‌নি—তুই আমাকে দূরে সরিয়ে দিস্‌, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ক'রে তাড়িয়ে দিস্‌। আমি তোর কোন ক্ষতি ক'রব না।

বনমালা বলিল, আর বাকী কি রেখিছিস্‌ ভাই। ক্ষতি যা করবার তা তো করেই দিয়িছিস্‌। আমিও দেখিছিরে, আমিও দেখিছি—ও লোকটাও তোর জন্যে পাগল। বেশ আমি মরে—মরে গিয়ে তোদের বাসনা মিটিয়ে যাব।

কুসুম যেন দৃঢ়স্বরে বলিল, বনমালা!

না না, বনমালা বলিল, আজ আর অন্য কথা নয়। কথাগুলা বলিয়া যেন ঝড়ের মত বনমালা কুসুমের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

কুসুম হাঁকিল, বনমালা!

বনমালা কোন উত্তর দিল না। কুসুম ছুটিয়া উঠান পার হইয়া রাস্তায় গিয়া ডাকিল, বনমালা—বনমালা একটুখানি তুই একটুখানি দাঁড়া!

বনমালার ভ্রূক্ষেপও নাই।

কুসুম ফিরিয়া আসিল। একি করিল সে? কুসুম কি বলিতে গিয়া বনমালাকে কি বলিয়া ফেলিল? সে তার বোনের মত তার কাছে থাকিবে এবং সেই সঙ্গে আর কিছু নয় শুধু তার বিজয়কে দেখাশোনার ভার একটুখানি, বেশি নয় একটুখানি। কিন্তু বলিবা মাত্র বনমালা ফুঁসিয়া উঠিল। মনে হইল যেন এতদিনকার সমস্ত চিত্রখানি একসঙ্গে এক মুহূর্ত্তে তার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল।

হায় কুসুম কি করিয়া বসিল!

একটু পরেই বিজয় ও প্রদ্যুম্ন ফিরিয়া আসিল। গণ-সমবায় সমিতি দেখিয়া প্রদ্যুম্নের বড় ভাল লাগিয়াছে। ছোট্ট একটুখানি দোকান কিন্তু সব জিনিস সস্তায় পাওয়া যায়। দোকানের সামনেকার দেওয়ালে সব জিনিসপত্রের দাম লেখা। মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রাত্যহিক জীবন কাটানোর নির্দ্দেশ দেওয়া পোস্টার ইত্যাদি। গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে লোকজন আসিতেছে, জিনিসপত্তর কিনিয়া নিয়া যাইতেছে। জীবনযাত্রা যেন অনেক সহজ এখানে।

পরমেশ গণ-সমবায়ের দোকান চালায়, অতি দক্ষভাবেই চালায়। বেশ মিষ্টি ব্যবহারটি তার। বাড়ী ফিরিয়া প্রদ্যুম্ন বিজয়কে বলিল, এমন গাঁয়ে এসেছি বন্ধু যে আর কোনদিন ফিরে যেতে মন সরবে না।

—কিন্তু ফিরে যাবার কথাটাই এত ক'রে ধরছ কেন বন্ধু?

—ধরিনি এত ক'রে। তবে যেতে আমাকে হবেই। সেখানে আমার অনেক কাজ।

উঠানে আসিয়া তারা দাঁড়াইয়াছিল। কুসুম বোধ করি তখনও ঘরের মধ্যে কাঁদিতেছিল। তাকে না দেখিতে পাইয়া বিজয় কহিল, কুসুমটা গেল কোথায়?

প্রত্যুম্ন কহিল, কি জানি—

পরমূহূর্ত্তেই কুসুম ঘরের বাহিরে আসিয়া কহিল, কি হয়েছে কি—এই তো আমি রয়িছি।

বিজয় কহিল, হ্যাঁ—আমরা বেশি দেরী করিনি কিন্তু—

তাই দেখছি, বলিয়া কুসুম গৃহকর্ম্মের উদ্দেশ্যে ঘরের ভিতর গেল। বিজয় কহিল, আমি কিন্তু এগোই—

—কিন্তু তোমার বাড়ী নিয়ে গেলে না তো বন্ধু?

—ওবেলা যেও;

বেশ—বেশ, প্রত্যুম্ন জামা খুলিতে খুলিতে দাওয়ার দিকে আগাইয়া গেল। বিজয় বাড়ীর উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল।

বাড়ী গিয়া সে বনমালার যে মূর্ত্তি দেখিল তাতে সে ভয় পাইয়া গেল। তবু প্রত্যুম্নকে আসিতে বলিয়াছে, কথাটা তাকে ডাকিয়া বলিতেই হইল। বনমালা নীরবে দাঁড়াইয়া সব কিছু শুনিল এবং ওবেলা কিছু খাবার-দাবার করিবারও কথায় সায় দিল।

বৈকালে প্রত্যুম্ন আসিলে বনমালা যত্ন-আতিথেয়তার কোন ত্রুটি করিল না কিন্তু সব কিছুই করিল কেমন যেন গরম হইয়া। বিজয় ব্যাপারটা কিছুই বুঝিল না।

প্রত্যুম্নকে খাওয়াইতে-দাওয়াইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। হঠাৎ বাহিরে শোনা গেল আশু ডাক্তারের হাঁক, বিজয় আছিস্ নাকি?

আছি, বলিয়া বিজয় বাহিরে গেল। ডাক্তার কহিল তোর জ্যাঠা বুড়ো ফিরে এসেছে শহর থেকে—মিটিঙের সব ঠিক্‌ঠাক। আস্‌ছে রবিবার হবে। শহর থেকে সবাই আস্‌বে। অমলবাবু আর অমরবাবু পরশু আস্‌বেন হাণ্ডবিল নিয়ে।

তা হ'লে তো এবার উঠে পড়ে লাগতে হয়, বিজয় সোৎসাহে বলিয়া উঠিল।

আশু কহিল, আয় না সমিতির আপিসে—আলোচনা করা যাবে।

চলুন, তারপর বিজয় প্রদ্যুম্নর উদ্দেশ্যে কহিল, বন্ধু—

—হ্যাঁ।

সকলে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু কেহ জানিল না বনমালার কি হইয়াছে।

২৪

পূর্বোদ্যমে কয়েকটা দিন গ্রামে গ্রামে বৈঠক হইল। হ্যাণ্ডবিল ছড়ানো হইল, ঢোল পিটাইয়া সমাবেশের কথা প্রচার করা হইল। কুসুম, এমন কি সৌরভ পর্য্যন্তও গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরিল। সমাবেশের দিন মেয়েদের আনিবার ব্যবস্থা করিল।

মানুষের মন দুঃখে-শোকে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যেকটি মানুষ চায় মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে। তা ছাড়া শুধু যে অফিসিয়াল রিসিভারের অধীনস্থ জমিদারীগুলিতেই খাজনা আদায়ের হিড়িক উঠিয়াছিল তা নয়—দেখাদেখি অন্যান্য জমিদাররাও খাজনা আদায়ের হুকুম দিয়াছিল। কাজে-কাজেই আশপাশের গ্রামগুলিতে যেখানেই যাওয়া যাক্ না, ঐ এক সমস্যাই চারদিকে। সেজন্য এই খাজনা প্রভৃতি মুকুবের দাবীতে কৃষক-সমাবেশ কৃষকদের মনে বেশ আশার সঞ্চার করিল।

দেখিয়া শুনিয়া বেশ বোঝা গেল সমাবেশ রীতিমতো বড় রকমেরই হইবে। সেই অমল ও অমর হ্যাণ্ডবিল নিয়া আসিয়াছিল। তাতে সব কৃষকদের দাবীর কথা লিখা—'লাঙল যার জমি তার', 'ভাঙা বাংলার পুনর্গঠন চাই', 'বাকী বকেয়া মুকুব চাই', 'গ্রামে গ্রামে সস্তায় রেশন', 'চাষের জলের ব্যবস্থা চাই', 'বিনা মূল্যে বীজ সরবরাহ চাই', 'হাজা-শুকো-বন্যার প্রতিকার চাই', 'জনসাধারণের কমিটির হাতে খাদ্য ব্যবস্থা দিতে হইবে', 'মন্বন্তরে হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ চাই', 'গ্রামে গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয়', 'গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা', 'বেকারদের জন্য মাসিক চল্লিশ টাকা করিয়া সাহায্য চাই', 'দরিদ্রদের বিনামূল্যে রেশন চাই'—এই সঙ্গে আরও কত দাবীর কথা: 'কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই', 'রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি চাই', 'কংগ্রেস লীগ এক হও', 'দেশরক্ষার জন্য সব দল এক হও', 'জাতীয় সরকার কায়েম

কর', 'ফ্যাসিজম নিপাত যাক' ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব দাবীগুলি ইতিমধ্যেই চারিদিকে লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে সুরু করিয়াছে।

অমল সেদিন সমিতির অফিসে খবরের কাগজ পড়িয়া সকলকে শুনাইতে-ছিল—ভারতের বিভিন্ন স্থানের দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দ উচ্ছ্বসিতভাবে তাদের কার্য্যের কি রকম প্রশংসা করিয়াছেন। যে কাজ বিজয়রা এখানে সুরু করিরাছিল, সেকাজ জাতীয় নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। দেশনেতারা বলিয়াছেন—'দেশের প্রত্যেকটি মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক। তাদের বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করা প্রত্যেক দেশ-প্রেমিকেরই কর্ত্তব্য।'

এই সব বরেণ্য নেতাদের নাম জানে না ভারতবর্ষে এমন কে আছে। তাঁদের দেশপ্রেমিক মন এই মহান কাজে সাড়া দিয়া উঠিয়াছে। নেহাৎ যাঁরা যোগেশবাবু, ভট্‌চায, অধর কুণ্ডু প্রভৃতির মত মানুষ তাঁরাই তাদের এই কাজে ভাল কিছু দেখিতে পাইবেন না। বিজয়, ঘনশ্যাম, আশু ডাক্তার সকলের বুকখানা, এই দেশবরেণ্য নেতাদের সমর্থনে আনন্দে দুলিয়া উঠিল।

আরও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞভাবে কাজে অগ্রসর হইবার যেন তারা প্রেরণা পাইল।

দেখিতে দেখিতে একদিন রবিবার আসিয়া পড়িল।

পশ্চিমপাড়া গ্রামের মধ্যবর্ত্তী একটি ফাঁকা মাঠে বাঁশের মঞ্চ তৈরী করা হইয়াছে। মাঠের মাঝখানটিতে বিরাট লম্বা একটা বাঁশে কাস্তে-হাতুড়ী চিহ্নিত রক্ত-পতাকা টাঙানো হইয়াছে। ছোট ছোট খুঁটি পুঁতিয়া দড়ির টানা দিয়া এক একদিকে এক-এক শ্রেণীর শ্রোতা ও দর্শকদের বসিবার জায়গা করা হইয়াছে।

আগের দিন সারারাত আশুডাক্তার, বিজয়, পরমেশ প্রভৃতির কারও ঘুম হয় নাই। কি যেন এক উত্তেজনা। ঘনশ্যাম, দীনু, শ্রীপতি, শশী ভোরেই পতাকা হাতে দলবল সহ তারকেশ্বর অভিমুখে শহরাগত নেতৃবৃন্দকে আনিতে

গিয়াছিল। যেমন করিয়া হউক, প্রায় পাঁচশতাধিক লোক তাদের সঙ্গে ছিল।

বিজয়, আশুডাক্তার, অমল, অমর, কুসুম প্রভৃতি গ্রামে থাকিয়া সকলের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা, সমাবেশে লোকজনের জলের ব্যবস্থা এবং কি কি সব আলোচনা হইবে, তারও ব্যবস্থা করিতেছিল।

গ্রামের চারিদিকে, গ্রামের বাহিরে গ্রাম-গ্রামান্তরে যেন একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। চারিদিকে নূতন জীবন-স্পন্দন। গ্রামের সেই গাছ-পালা, বনজঙ্গল, মাঠঘাট, আকাশ আর দিগন্তের সীমান্ত, সব যেন আজ এক অপরূপ মায়ায় ভরিয়া উঠিয়াছে। গাছে গাছে সেই পরিচিত পাখ-পাখালির ডাক, অলস মধ্যাহ্ন-বাতাসের বনে বনে মাতামাতি, কোথায় কোন দূরে বাঁশের রাজ্য-প্রান্তে রহিয়া রহিয়া কথা বলার মত দোদুল দোলা, কোথায় যেন পলাতকা কোকিলা-বধূর মাত্রাহীন ডাকিয়া মরা—সব যেন আজ রক্তে রক্তে শিরায় শিরায় দোলা লাগায়, শুধুই দোলা লাগায়—কোন অজানার, অনাগতের, নবজীবনের স্পন্দনের।

আশুর বাড়ীতে সমিতির কার্য্যালয়ে আসিয়া শহরাগত নেতারা উঠিবে। কাজেই সেদিক দিয়া আর কিছুর ভাবনা নাই।

কিন্তু আশ্চর্য্য আজিকার এতবড় চাঞ্চল্যপূর্ণ আবহাওয়ায় তিনটি মানুষ ঠিক এই সময়টিতেই নাই। প্রথম হইতেছে কুসুম, দ্বিতীয় হইতেছে বনমালা এবং তৃতীয় হইতেছে বন্ধু প্রদ্যুম্ন। কুসুম হয়ত শেষ পর্য্যন্ত আসিবে। কাজকে ফাঁকি দেওয়া তার স্বভাব নয়। কিন্তু বনমালার কথা? বনমালা যেন কি হইয়া গিয়াছে। আবার তাকে যেন সেই বন্যার দিনগুলির মত ভূতে পাইয়াছে। কথা বলিলে শুনিয়া যায়, আদেশ করিলে আদেশ পালন করে কিন্তু ব্যস ঐ পর্য্যন্তই। কোন কিছুর উত্তর তার কাছে প্রত্যাশা করা যাইবে না। কে জানে কোথায় যে ইহাদের মনের তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যায়! বনমালা সেই যে বাঁধিয়া বাড়িয়া

তাকে ও মাকে খাওয়াইয়া এবং নিজে খাইয়া নিয়া ঘরে যায়, আর বাহির হয় না। সারাদিন ধরিয়া কেউ মাথা খুঁড়িলেও আর কেউ তাকে বাহির করিতে পারিবে না। কিন্তু এ না হয় বনমালার কথা—কিন্তু প্রদ্যুম্নর কথা—প্রদ্যুম্নর কি হইল যে সে আজ এ তল্লাটে নাই? লালঝাণ্ডার অত বড় ভক্ত, সে আসিল না কেন? বিজয় মনে মনে ভাবিল, দেখিতে হয় ব্যাপারটা।

বাড়ী গিয়া স্নান সারিতে সারিতেই অপরাহ্ণ হইয়া গেল। ইতিমধ্যে মণিবাবু, লীলা, হরিহর প্রভৃতিকে শোভাযাত্রা-সহকারে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়া ধ্বনি দিতে দিতে গ্রামে আনা হইল।

তার আওয়াজ পাওয়া মাত্রই বিজয় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

খাইতে বসিয়া বিজয়ের খাওয়া হইল না। উঠিয়া পড়িল। বনমালার যেন কোন চাঞ্চল্যই নাই। স্বামীর খাওয়া হইল না দেখিয়া সে তাকে বসাইয়া খাওয়াইতে চেষ্টা করিল না। তা ছাড়া গ্রামে আজ এতবড় একটা ব্যাপার হইতেছে, সে সম্বন্ধেও তার কোন ঔৎসুক্য নাই। সে যেন অচল, অনড়, জড় পদার্থের মত।

বিজয় খাওয়া ফেলিয়া রাখিয়া এক দৌড়ে সমিতির কার্য্যালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। জায়গাটা ভিড়ে ভিড় হইয়া গিয়াছে। ভিড় ঠেলিয়া যাইতেই তাকে দেখিয়া মণি, লীলা, হরিহর সকলেই উচ্ছ্বসিত ভাবে বলিয়া উঠিল, আরে!

বিজয় নমস্কার করিয়া বলিল, ভাল আছেন?

মণি কহিল, হ্যাঁ—তুমি?

বিজয় কহিল, হ্যাঁ।

হরিহর বলিল, গাঁয়ে আসি না ব'লে বিজয়ের বড় নালিশ।

সে তো থাকতেই পারে নালিশ, বিজয় কহিল, আমরা গাঁয়ে বাস করি। আমাদের গ্রামকে ভাল লাগবে না?

ঘনশ্যাম একদিকে দাঁড়াইয়া ছিল। আজ সব চেয়ে আনন্দ যেন তারই।

নিজের জীবনে সে বহু চেষ্টা করিয়াছে গ্রামের উন্নতির জন্য কিন্তু তখনকার দিনে কখনো সে এত মানুষকে একসঙ্গে পথ চলিতে দেখে নাই। তা ছাড়া আরও একটা আনন্দানুভূতি তার আছে—তার ছেলে হরিহর, সেও আজ পাঁচজন দেশনেতার মত বক্তৃতা দিবে! নিজে যে কাজ করিতে পারে নাই, তার ছেলে সেই কাজ করিবে। পিতৃগর্ব্বে তার বুকখানা ভরিয়া উঠিল।

সকলের ভিতর হইতে লীলাকেই সর্ব্বাগ্রে নজরে পড়ে। ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোক বলিয়াই যে তার দিকে সর্ব্বাগ্রে তাকাইতে হয় তা নয়—আসলে সন্ন্যাসিনীর মত তার মূর্ত্তিখানা, সকলকে কেমন যেন শ্রদ্ধান্বিত করিয়া তার দিকে টানিয়া আনে।

আশু লীলার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিজয়ের উদ্দেশ্যে কহিল, কুসুম গেল কোথায় বল দিকি? এনার ব্যবস্থা তো ক'রতে হয়!

কি জানি, বিজয় কহিল, কি ক'রতে হবে আমায় বলুন না?

এঁদের জলটল খাওয়ার তো ব্যবস্থা ক'রতে হয়, আশু কহিল, তা ছাড়া মাইক-টাইক সব এসেছে ওঁদের সঙ্গে, সেগুলোর কি কর্‌নে ক'রতে হবে—

—তা কুসুম তার কি করবে—আপনি ওঁদের বাড়ীর ভেতরে নিয়ে যান না।

—পরমেশ কোথায় গেল?

—কেন?

—আরে ডাবটাব গুলো তো কেটে দিতে হবে!

দেখছি, বলিয়া বিজয় পরমেশ প্রভৃতিকে খুঁজিতে লাগিল। পরমেশ ডাব-টাবেরই ব্যবস্থা করিতে গিয়াছিল। সে আসিয়া বলিল, ডাক্তারবাবু ওঁনাদের ভেতরে নিয়ে চলুন না?

ইতিমধ্যে ভিড়ের ভিতর হইতে সৌরভ আসিয়া বিজয়কে কহিল, ঠাকুরপো তোমাকে কুসুম একবার ডাক্‌ছে—

বিজয় সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কোথায় সে?

—বাড়ীতে।

—আসেনি কেন সে এখানে?

—এসেছিল তো!

—কখন?

—এইতো খানিক আগে পতাকা নিয়ে একদল মেয়েকে মাঠে বসিয়ে রেখে চলে গেল।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

আচ্ছা আমি যাচ্ছি, বিজয় বলিল, তাকে বলোগে—

এদিকে সভার নির্দ্ধারিত সময়ও প্রায় হইয়া আসিতেছে। সমিতির কার্য্যালয় হইতে দেখা যাইতেছে ইয়াসিন চাচা আসিতেছে হাতে লাল পতাকা নিয়া—পিছনে তার হাজার হাজার জনতা। একটু পরেই আসিতেছে হারাণ কামার, দশরথ জেলে—তাদেরও পিছনে শত শত লোক। এদিক ওদিক হইতে দলে দলে লোক আসিতেছে। সব দলেরই হাতে ছোটবড় লালপতাকা। উর্দ্ধ আকাশ যেন আজ লালে লাল।

এই অবিশ্রান্ত জনস্রোতের যেন বিরাম নাই। আজ ইহারা উদ্বেলিত চঞ্চল। দামোদরের তীরে ইহারা বাস করে—রুদ্র উদ্দাম দামোদরের মতই যেন ইহাদের স্বভাব হইয়া উঠিয়াছে। ইহারাও যেন আজ ক্রুদ্ধ-আক্রোশে গর্জ্জিয়া উঠিতে চায়। ইতিহাসের পাতায় যে সব বিপ্লবের কাহিনী আছে আজ যেন ইহারা সেই সব কাহিনীর স্রষ্টাদেরই উত্তরকালের প্রকৃত বংশধর—এমনি একটা ভাব তাদের মুখেচোখে।

সভা হইতে আর বেশি বিলম্ব নাই। এই বেলাই তাকে কুসুমের ওখানে ঘুরিয়া আসিতে হইবে। দ্রুত সে কুসুমের বাড়ীর উদ্দেশ্যে চলিতে লাগিল।

কুসুমের বাড়ীতে পা দিয়াই সে চমকাইয়া উঠিল। প্রদ্যুম্ন তেমনি করিয়া

মাথায় টুপি পরিয়াছে, তেমনি করিয়া বুকে আঁটিয়াছে কাস্তে-হাতুড়ী চিহ্নিত ব্যাজ। তার কাঁধে একটা পুঁটুলী আর হাতে একটা পুঁটুলী।

সূর্য্য তখন অস্ত গিয়াছে। তারই বিদায়-বেলার রক্ত-আলো আসিয়া পড়িয়াছে প্রদ্যুম্নর মুখে। বিজয় তাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া বলিল, একি বন্ধু!

কুসুম সম্ভবতঃ ঘরে ছিল। বিজয়ের গলায় আওয়াজ পাইয়া বাহিরে আসিল। চোখে তার সম্ভবতঃ জল ছিল একটু আগে। তার দিকে চকিতে একবার তাকাইয়া নিয়া বিজয় আবার প্রদ্যুম্নের দিকে তাকাইল। প্রদ্যুম্ন বলিল, বন্ধু বিদায়—

বিদায়, সবিস্ময়ে বিজয় প্রশ্ন করিল।

—হ্যাঁ।

—সে কি?

প্রদ্যুম্ন কহিল, হ্যাঁ বন্ধু। আমার সেখানে কত কাজ। সেখানে রয়েছে আমার চা-বাগানের কুলী ভায়েরা, সেখানে রয়েছে আমার ইউনিয়ন—বন্ধু তোমাদের এখানকার মতই আমার লাল ঝাণ্ডা ইউনিয়ন।

কাঁধে ও হাতে পুঁটুলী নিয়া প্রদ্যুম্ন কথা বলিতেছিল। বিজয় কহিল, ওগুলো নামাও না বন্ধু।

আর না বন্ধু, প্রদ্যুম্ন কহিল, যাবার আগে শুধু তোমাকে আমি একটি কথা বলে যাই—কুসুমকে তুমি দেখো। ওর কোনদিন অমর্য্যাদা ক'রনা। কথাগুলা বলিতে বলিতে প্রদ্যুম্নের চোখে জল আসিয়া পড়িল।

এসব কি বল্‌ছ বন্ধু, বিজয় সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল।

আমি ঠিকই বল্‌ছি, প্রদ্যুম্ন কহিল, কুসুম তোমারই যে বন্ধু।

সেকি, বিজয় কহিল, সে যে তোমার বিবাহিতা স্ত্রী!

বন্ধু বাইরের অনুষ্ঠানটাই কি বড় হবে, প্রদ্যুম্ন কহিল, মানুষের মনটা কি কিছুই নয়?

—এতো বড় ভয়ঙ্কর কথা!

হ্যাঁ ভয়ঙ্কর কথা। কিন্তু যারা নতুন দিনের মানুষ তাদের কাছে নয়, বলিয়া । আর অপেক্ষা করিল বাড়াইল। বিজয় ছুটিয়া গিয়া তাকে ধরিয়া বলিল, বন্ধু শোনো ?

—আর না বন্ধু।

চোখের সামনে বিজয়ের ভাসিয়া উঠিল নফর ভট্টচাযের মূর্ত্তিখানা। সেও পারুলকে বিবাহ করিয়াছে কিন্তু পারুলের সঙ্গে তার কোন মনের মিল হয় নাই। হইতে পারেও না। পারুল আসলে ডাক্তারের স্ত্রী। কিন্তু সেখানে সে শুধু সুন্দরী বলিয়া ভট্টচায তার মন, হৃদয়, তার সমগ্র নারীত্বকে অস্বীকার করিয়া তাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ভালবাসার এই এক রূপ—আর প্রত্যুম্ন, স্ত্রী অপরকে ভালবাসে বলিয়া তাকে তার হাতে দিয়া চলিয়া যাইতেছে, ইহা আরেকরূপ। সমাজের উচ্চশ্রেণীর ভালবাসার একরূপ আর নিম্নস্তরে আরেকরূপ। কিন্তু কোন ভালবাসা বড়, মহৎ ও মহান? যা' হোক তবু সে বলিয়া উঠিল, কিন্তু আমারও ঘরে যে স্ত্রী আছে।

—তাকে তোমার সঙ্গে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারো চল্‌বে, তা না হ'লে পড়ে থাকবে পিছনে।

বিজয় এবার প্রত্যুম্নর একটা হাত টানিয়া ধরিয়া কহিল, বন্ধু অন্ততঃ আর কটা দিন তুমি থেকে যাও—

না বন্ধু, প্রত্যুম্ন বলিল, তুমি জানো না আমার সেখানে কত কাজ। আসামের আকাশ হ'তে রাত্রিদিন বোমা ঝরে পড়ছে মাটিতে, যুদ্ধ সেখানে আমার স্বদেশের মাটিতে এগিয়ে এসেছে। এইভাবে চললে আমার দেশ যাবে, আমার জাতি যাবে, ধ্বংস হয়ে যাব আমরা। তাই এই সর্ব্বনাশা যুদ্ধ যাতে আর এগুতে না পারে তার জন্মে আমাকে চেষ্টা ক'রতে হবে। আমার মণি-পুরের মুকুটহীন রাজা ইরাবৎ সিং একমাত্র লোক সে, যে আজ রুখতে পারে দেশের মাটি থেকে এই যুদ্ধকে—তাকে ইংরেজেরা ধরবে ব'লে তার নামে ওয়ারেণ্ট বের ক'রে রেখেছে। আমরা সমস্ত শ্রমিক মিলে আজ তাই ইরাবৎকে মুক্ত ক'রে

এনে দেশকে বাঁচাতে চাই। আসামে আমাদের আজ সেই আন্দোলন চলেছে। আমায় যেতেই হবে সেখানে বন্ধু—

বিজয় স্তব্ধ নির্ব্বাক অবস্থায় সেইখানে শুধু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রদ্যুম্ন কঠিন পদবিক্ষেপে মাঠের উপর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

পিছন হইতে কুসুম ডাকিল, শোনো—

বিজয় ফিরিয়া দাঁড়াইল। কুসুম কহিল, আমি তোমাদের বাড়ী যাচ্ছি। বনমালাকে নিয়ে সভায় যাব। তুমি আগে চলে যাও—

বনমালার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

গ্রামে নব-জীবনের সাড়া। আর সে শুধু তিল তিল করিয়া ঘরের মধ্যে মরণের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। বাহিরে শতসহস্র কৃষক-কণ্ঠে ধ্বনি উঠিতেছে। মাইক্রোফোনে অপরিচিত স্বর শোনা যাইতেছে, তবু বনমালার যেন কিছুতেই কিছু আসে যায় না। সে পরম নির্ব্বিকার। কুসুম তাকে একি করিয়া দিল।

সেই দিন-সাতেক আগে যেদিন কুসুমের স্বামী আসিয়াছিল তার পর দিন কুসুম ও বনমালার মধ্যে যে কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছিল, তারপর হইতে কুসুম আর বনমালার সহিত দেখা করে নাই। কেন করে নাই তা সেই জানে।

কিন্তু আজ আসিয়াই সে বনমালাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, পোড়ার-মুখি বাইরে সমস্ত মানুষ নতুন জীবন নিয়ে মেতে উঠেছে আর তুমি ব'সে রয়েছ ঘরের মধ্যে। চ পোড়ার মুখি—চ।

বনমালার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। কুসুম কহিল, দেরী করিস্‌নি পোড়ার মুখি—শিগ্‌গির। পথে আসতে আসতে দেখে এলুম—নকর ভট্‌চাযের ছোটবউ পারুলও আজ পথে বেরিয়ে পড়েছে।

—পারুল বউ?

—হ্যাঁ। আজ আর ঘরে বসে থাকবার দিন নয় যে—ঘরে বসে থাকার দিন নয়।

বনমালা কি ভাবিল কে জানে। কুসুমের সহিত সে পথে বাহির হইয়া পড়িল। সহসা দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া উদ্বেলিত জনসমুদ্রের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, চাষীমজুর কী……জয়!